বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

মোহাম্মদ হাননান

আত্ম মুক্তি পাঠাগার (ব্যক্তিগত)
পশ্চিম বদরীপুর, সোনাপুর, নোয়াখালী
বই নং

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

(তৃতীয় খণ্ড)

প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্ব

ড. মোহাম্মদ হাননান

গ্রন্থলোক
ঢাকা

প্রকাশকাল
২৬ মাঘ ৯৭
০৯ ফেব্রুয়ারী ৯১

প্রকাশক
চৌধুরী গিয়াসউদ্দিন
গ্রন্থলোক
৫১ পুরানা পল্টন
ঢাকা

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৫১ পুরানা পল্টন
ঢাকা

চেতনা
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস
সুবর্ণ মুদ্রায়ণ
৭৮/২ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩

মুদ্রণ
প্রকাশ
৩৪ বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
শেখর দত্ত

মূল্য:
সুলভ: ৮৫ টাকা
শোভন : ১২৫ টাকা

History of The Student Movement in Bangladesh Part III (Pre-Liberation Period) By Dr. Mohammed Hannan, Granthloke, 51 Purana Paltan, Dhaka-1000

আশা মুক্তি পাঠাগার (ব্যক্তিগত)
পশ্চিম বদরীপুর,..সোনাপুর, নোয়াখালী
বই নং...

আমার অগ্রজ
এস এম আবদুল মান্নান

আমার কিশোর জীবনের বন্ধু
যার কাছে আমার অনেক ঋণ

এবং তাঁর বর্তমান জীবন-বন্ধু
বেগম তাহেরা মান্নান বীথি

এই দু'জনের উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস
(১৮৩০-১৯৫২), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ,
গ্রন্থলোক, ঢাকা ১৯৮৬

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস
(১৯৫৩-১৯৬৯), দ্বিতীয় খণ্ড
ওয়ার্সী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৭

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস
(মুক্তিযুদ্ধ পর্ব), চতুর্থ খণ্ড
গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৯১

বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব
গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৯১

কাব্যগ্রন্থ
প্রিয়জনের ছবি
চেতনা, ঢাকা, ১৯৮৮

আশা মুক্তি পাঠাগার (ব্যক্তিগত)
পশ্চিম বদরীপুর, সোনাপুর, নোয়াখালী
বই নং

পূর্বকথা

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের (তৃতীয় খণ্ড), বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের প্রাক ঘটনাবলীর ইতিকথা। ১৯৬৯ সালের মহান গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তানে (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে) নতুন করে সামরিক শাসন জারী করা হয়।

আইয়ুব খান বিদায় নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে দাঁড়িয়ে ঘোষিত এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের যেমন প্রতিবাদমুখর হওয়ার কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত তা হয় নি।

বিস্ময়কর এই ব্যতিক্রম ঘটনার পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। এর মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল গণঅভ্যুত্থানের পর আন্দোলন ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি আর ছাত্রদের হাতে ছিল না, রাজনৈতিক দলগুলো তখন আন্দোলনের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করছিল।

আর এই রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান অংশটি ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত নির্বাচনের 'লাল মূলোর' দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ফলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন আর সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায় নি।

যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে একনায়ক আইয়ুব খান বিদায় নেন, তার সম্ভাব্য পরিণতি ছিল, যতো দ্রুত সম্ভব পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা। ছাত্ররা কোনো প্রকার বড় ধরণের ঘটনা ঘটালে সামরিক কর্তারা বাহানা তুলে এ সুযোগ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করতে পারে, এমন আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। প্রধান প্রধান ছাত্রদলগুলো এই ব্যাপারে সচেতন ছিল।

ফলে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মূল্যায়ন থেকেই আন্দোলন সংগঠিত হয় নি।

আরো যেসব কারণ আন্দোলন না হওয়ার পেছনে ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে এই সময়কার দলাদলি, ভাঙন ও আন্ত:মতাদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতা। প্রায় সবকয়টি ছাত্র সংগঠনই এই সময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

কিন্তু বিস্ময়কর সত্য যে, এই সময়টাতেই আবার পাকিস্তানে, বিশেষকরে, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে, তাদের স্থানীয় ও দৈনন্দিন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। একটার পর একটা একান্ত নিজস্ব শিক্ষা-বিষয় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভবত এমন আন্দোলন আর কখনো হয় নি। এ সময় নূরখান-শিক্ষানীতি এবং 'পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি' নামক বই বাতিলের আন্দোলন জাতীয় রূপ লাভ করে।

এ ছাড়া, জেলায় জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা সমস্যা এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগীয় আন্দোলনও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের এসব আন্দোলন ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং গঠনমূলক। এসব ছাড়া ছাড়া, বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সারাদেশব্যাপী সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে রাখে। আন্দোলিত এই পরিস্থিতিতেই মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি শুরু হয় এবং বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

তৃতীয় খণ্ডের এই প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্বের ছাত্র আন্দোলনের বিষয়গত দিকের কারণেই ইতিহাসের প্রধান উপাদান হয়েছে দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ। এছাড়া, তৎকালীন ছাত্র নেতাদের সাক্ষাৎকার ও সংগঠনসমূহের দলিলপত্রসমূহও ইতিহাসের আকর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত যে, সংবাদপত্রের মধ্যে তৎকালীন একটি প্রধান পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান'কেই এ খণ্ডে মূল সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আজাদ, সংবাদ, ইত্তেফাক, পাকিস্তান অবজারভারও আংশিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর এ কাজটিতে আমাকে প্রধানভাবে সহায়তা করেছেন সুহৃদ ও বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের একজন উৎসাহী পাঠক, ইলিয়াস মল্লিক। এছাড়া হালিম দাদ খান, আলী আকবর টাবী প্রমুখও আমার সাথে সংবাদপত্রের কাজে সহায়তা করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা গবেষণা ও তথ্য ব্যুরো (বেনবেইস)-এর পরিচালক জনাব আনোয়ারুল হক খান মজলিশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দলিল পেতে সাহায্য করেছেন।

অনেক দলিল ও প্রচারপত্র সংরক্ষণ করে দিতে সহায়তা করেছেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা কাজী আকরাম হোসেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মোস্তফা ফারুক ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল অনেক দলিল ও কাগজ-পত্র স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদপ্তরের উর্ধতন আধিকারিক হারুন-উর-রসিদ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে উৎসাহ এবং রসদ যুগিয়েছেন।

প্রাক্তন ছাত্রনেতারা এ গ্রন্থের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ ও তথ্য সরবরাহ করে আমাকে বাধিত করেছেন।

এম, এম আজিজুল হক, একজন পরম উৎসাহদাতা, আমার প্রাসঙ্গিক বিবিধ গ্রন্থের অভাব, তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে মিটিয়েছেন।

গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে সংযোজনী ও সংশোধনীতে সাহায্য করেছেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বিমল সরকার।

সুবর্ণ মুদ্রায়ণের কর্ণধার মুজিবুর রহমান ও আজাদ মোসলেম এবং কর্মী শফিক, কিরণ চক্রবর্তী, সিদ্দিক আহমেদ, মোঃ নাজমুল আলম, অরুণ, রেজাউল হোসেন প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

আমার স্ত্রী আরজুমন্দ আরা রানু নামসূচীটি তৈরী করতে সাহায্য করেছে।

আমার অনুজা আখতার শাহীমা সোমা ও আখতার সালমা আখি এবং অনুজ প্রতিম মাহমুদুল ইসলাম সেলিম, জুহের মাহবুব তুহিন প্রমুখ 'প্রুফ' দেখার কাজে সহায়তা করেছে।

এদের সকলের কাছে আমার অশেষ ঋণ।

ড. *মোহাম্মদ হাননান*
২৪/এম আজিমপুর এস্টেট
২৬ মাঘ ৯৭
০৯ ফেব্রুয়ারী ৯১
ঢাকা-১২০৫

আমি মুক্তি পাঠাগার (ব্যক্তিগত)
পশ্চিম বদরীপুর,সোনাপুর,নোয়াখালী
বই নং...

সূচীপত্র

পূর্বকথা ৫

ইয়াহিয়ার আগমন ও
ভিন্ন কায়দায় শুরু ১৯

সামরিক নেতাদের সাথে
ছাত্রদের যোগাযোগ শুরু ২৪

ছাত্র সংগঠনে ভাঙনের ধ্বস ২৫

ছাত্রলীগে ভাঙন ২৬

ছাত্রলীগে সমাজতন্ত্র ৩৪

এন,এস,এফ-এর সম্মেলন ও ভাঙন ৩৬

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও
মতাদর্শগত বিরোধ ৪০

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) আন্তঃমতাদর্শগত
লড়াই ৫০

ইসলামী ছাত্রসংঘের তৎপরতা ৫৯

বিবিধ ছাত্র সংগঠন ৬০

ছাত্র ঐক্যে ফাটল ৬২

'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নিয়ে জটিলতা ৬৭

আইয়ুবের বিচার ৭০

চাঁদের দেশে মানুষ ঃ ছাত্রনেতাদের
টেলিগ্রাম ৭২

নূরখান শিক্ষা কমিশন ও তার সারমর্ম ৭৩

নূর খান শিক্ষা কমিশন ঃ প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া ৭৭

শিক্ষানীতি প্রশ্নে ডাকসুর মুক্ত আলোচনা ঃ
গোলযোগ ও মৃত্যু ৮২

পুস্তক বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ, প্রত্যাহার ইত্যাদি প্রসঙ্গ ৯০

আল আকসা মসজিদে আগুন ঃ
ছাত্রদের প্রতিবাদ ৯৪

বিহারী-বাঙালী দাঙ্গা ঃ
নতুন চক্রান্ত ৯৫

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মূল্যায়ন ১০০

১১ দফা আন্দোলনের সর্বশেষ শহীদ ১০৮

১১ দফা আন্দোলনের এক বছর পূর্তি ১০৮

সামরিক আইন ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে
মামলা ও ধরপাকড় ১১৩

পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা ঃ
গোলযোগ ও মৃত্যু ১২৫

'পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি' বই
বাতিলের আন্দোলন ১২৯

'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্র ১৩৮

ডাকসু নির্বাচন ঃ ১৯৭০ ১৩৯

ইউকসু নির্বাচন ঃ ১৯৭০ ১৪১

বাকসু নির্বাচন ঃ ১৯৭০ ১৪২

স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ঃ
এলাকা ও বিষয় ভিত্তিক ১৪২

বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলন ১৪৬

মেডিক্যাল, ডেন্টাল ও প্যারা মেডিক্যাল ছাত্রদের ক্ষোভ ১৫১
কারিগরী ছাত্রদের সংগ্রাম ১৫৫
প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন ১৫৮
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের আন্দোলন ১৬৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ১৬৮
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দাবীনামা ১৭১
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রতিষ্ঠাকালীন সংকট ১৭২
সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ ছাত্রদের সংগ্রাম ১৭৪
বাণিজ্য ছাত্রদের দাবী আদায় ১৭৪
মহসিন হল ছাত্রদের দাবী ১৭৬
আইন ছাত্রদের দাবী-দাওয়া ১৭৬
জগন্নাথ কলেজ সরকারীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন ১৭৭
নটরডেম কলেজের ছাত্রদের ক্ষোভ ১৮০
মাদ্রাসা ছাত্রদের বিভক্ত সংগ্রাম ১৮১
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ১৮২
পরিশিষ্ট ১৮৭
নামসূচী ২৫১

দলিলপত্র সূচী

১. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ৫, ৬, ৭ মার্চ এবং ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ মার্চ (১৯৭২)-এর বর্ধিত সভায় গৃহীত নীতি নির্ধারণী প্রস্তাবাবলী

২. শাজাহান সিরাজ, সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী (বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৯৭২)

৩. নূরে আলম সিদ্দিকী, 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আগাইয়া আসুন', বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ২৪ মে ১৯৭২

৪. ইকবাল হোসেন, নীল নকশা, জাতীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন-এর দলিল, ঢাকা, ১৯৭৬

৫. নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ২৮, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০

৬. Proposals for a New Educational Policy, Ministry of Education, Islamabad, July, 1969.

৭. শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৭০

৮. নূর খান শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর যৌথ প্রচারপত্র, ১৯৬৯

৯. গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ (পুস্তিকা), (প্রকাশক, আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, ২৫ জুন, ১৯৬৯, মূল্য: ১০ পয়সা)।

১০. গণঅভ্যুত্থানকে বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে নিতে হবে (পুস্তিকা), (কেন্দ্রীয় সংসদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, আ. ক. ম. জাহাঙ্গীর, প্রচার সম্পাদক, ৩১/১ হোসেনী দালান, ঢাকা-১, ১৭ জানুয়ারী ১৯৭১ মূল্য: পনের পয়সা)

১১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

১২. মালেক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর যৌথ প্রচারপত্র, ১৯৭০

১৩. স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১ দফা কর্মসূচী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-এর পক্ষে মাহবুবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ৭ মার্চ, ১৯৭০

১৪. 'পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)র প্রচারপত্র, ১৯৭০

১৫. 'ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্র সমাজের অভিমত', ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও এন. এস. এফ-এর যৌথ প্রচারপত্র, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩১/১, হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক কামালউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত, বনশ্রী মুদ্রায়ণ, ৩৪, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত, ১৯৬৯

১৬. ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও এন. এস. এফ-এর যৌথ প্রচারপত্র, ১৯৭০

১৭. ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার 'দাবি দিবস'-এ ছাত্রলীগের প্রচারপত্র, ১৯৬৯, প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ৪২, বলাকা ভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

১৮. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে '১১ দফা সপ্তাহ পালন করুন', প্রচার সম্পাদক স্বপন কুমার চৌধুরী, ৪২, বলাকা ভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস, ১৬/১ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত

১৯. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের ২২ এবং ২৩ জুলাই (১৯৭০)-এ অনুষ্ঠিত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী, এম. এ রশীদ ও রেজাউল হক মোস্তাক, দপ্তর এবং সহদপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক প্রেরিত

২০ 'আজকের বটতলার ছাত্র সভার প্রস্তাবাবলী', এম. এ রশীদ, দপ্তর সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০-এ প্রেরিত

২১. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একাদশ সম্মেলনের ডাক (প্রচারপত্র), ১৯৬৯

২২. ইয়াহিয়ার নির্বাচনী আইনগত কাঠামো ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রচারপত্র, ১৩ এপ্রিল, ১৯৬৯

২৩. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনী ইশতেহার, (প্রচারপত্র, ডাকসু নির্বাচন), ১৯৭০

২৪. 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখার জন্য আগাইয়া আসুন', (ছাত্র ইউনিয়নের প্রচারপত্র, ১৯৭০)

২৫. শহীদ দিবস পালন করুন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রচারপত্র, ১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

২৬. ২রা অক্টোবরের গণসমাবেশে উপস্থিত কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার প্রতি পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বান, প্রচারপত্র, ১৯৭০

২৭. জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী ইতিহাসের দুটি কথা, (প্রচার পত্র), প্রকাশক : প্রাক্তন সভাপতি, ডোমার নিলফামারী জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

২৮. 'রক্তাক্ত জানুয়ারী আস্-সালাম', প্রচারপত্র, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন, ১৯৭০

২৯. 'পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখা সম্মেলনকে সফল করে তুলুন, প্রচারপত্র, ইসলামী ছাত্র সংঘ, ঢাকা শহর শাখা, ১৫, পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

৩০. 'শহীদ আবদুল মালেক সপ্তাহ পালন করুন', (প্রচারপত্র), পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ, ঢাকা শহর

৩১. 'এসো সংগ্রামের পথে এসো আন্দোলনে', (প্রচারপত্র), বাংলা ছাত্রলীগ

৩২. 'বাঙলা দিবস পালন করুন', (প্রচারপত্র), পূর্ব বাঙলা ছাত্রশক্তি

পশ্চিম বদরীপুর, নোয়াখালী
বই নং

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সামরিক শাসন এবং তার পরবর্তী অবস্থায় ছাত্র রাজনীতি

আমি মুক্তি পাঠাগার (ব্যক্তিগত)
পশ্চিম বদরীপুর,..মানাপুর,নোয়াখালী
বই নং...

ইয়াহিয়ার আগমন এবং ভিন্ন কায়দায় শুরু

'No political Ambition'[১] –জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, ২৬ মার্চ ১৯৬৯ গণমাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে এ অভিমত দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন।

তিনি তাঁর ভাষণে ২৪ মার্চ, ১৯৬৯ পর্যন্ত তাঁর পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান সম্পর্কে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়াসে আইয়ুব সফল হননি।

জেনারেল বলেন, 'সেনাবাহিনী আশা করেছিল, শুভবুদ্ধির জয় হবে। কিন্তু পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটে যে স্বাভাবিক আইন প্রয়োগ পদ্ধতি বা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী অরাজক অবস্থায় নীরব দর্শক হতে পারে না। তাদের, তাঁদের কর্তব্য করতে হবে এবং দেশকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, আমি তাই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

তিনি আরো বলেন, সশস্ত্র বাহিনী জনগণের জন্যেই। তাদের কোন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নেই। তারা কোন ব্যক্তি বা দলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে না। তিনি নির্দেশ দেন, যিনি যে পদ ও মর্যাদার লোক হন, তাঁকে তার কাজে ফিরে যেতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, নিয়মতান্ত্রিক শাসন কায়েমের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই'।[২]

পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পুনরাবৃত্তিতে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর ক্ষমতা লিপ্সার অনাকাঙ্ক্ষাকে এমন লাজুক ও নম্রভাবে ব্যক্ত করলেও পাকিস্তানে সামরিক শাসনের

---

১ পাকিস্তান অবজারভার, ২৭ মার্চ ১৯৬৯
২ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ মার্চ ১৯৬৯

জনক জেনারেল আইয়ুব কিন্তু ছিলেন এর বিপরীতধর্মী, একেবারে খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাঁর বসার যৌক্তিকতা, অধিকার ও পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন স্মৃতিচারণে:

'বিপ্লবে সুদীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য প্রস্তুতি, বিস্তারিত পরিকল্পনা, গোপন বৈঠক এবং দেশব্যাপী সেনা সমাবেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের বেলায় এ রকম কোনও প্রস্তুতি ছিলোনা। ঠিক সাধারণত: যেমন একটি সামরিক বাহিনীর গতিবিধি হয়ে থাকে তার চাইতে অধিক কিছুই হয় নি। একটি ব্রিগেডকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল মাত্র।...

আমাদের এই কর্মপন্থা যেভাবে কৃতকার্য হতে পারে সেভাবে আমরা সব ঠিক করেছিলাম। প্রশ্ন হলো যে এক্ষেত্রে কতদূর যাওয়া যায়। আমি বুঝেছিলাম যে, যদি কোন বাধা আসে তা হলে সেটা নামমাত্র হবে এবং আমরা দ্রুত তাঁর মোকাবেলা করতে পারবো। অস্ত্র ব্যবহারের অবকাশ যে হবে তা মনে করিনি।...

বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলে যেমন হয় সামরিক আইন ঠিক তেমনি ভাবে এসেছিল'।[৩]

কিন্তু পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক আইন জারীর ঘটনার প্রতিবাদে সারাদেশব্যাপী বড় ধরণের কোনো বিক্ষোভ বা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল না। বিশেষ করে উনসত্তরের উত্তাল গণজোয়ারের পর ইয়াহিয়ার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে না পারার ঘটনার মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলন, তৎসঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠে। কারণ প্রথম সামরিক শাসনের সঙ্গে এ দ্বিতীয় সামরিক শাসনের, সময়ের ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের মৌলিক পার্থক্য ছিল।

আইয়ুব খান প্রবর্তিত প্রথম সামরিক আইন জারী, পাকিস্তানের অস্থির, কাণ্ড-জ্ঞানহীন রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে হতাশ দেশবাসী একটি মুক্তির আস্বাদই পেয়েছিল— এ একটি কঠিন সত্যই বটে'।[৪] কিন্তু ইয়াহিয়া প্রবর্তিত দ্বিতীয় সামরিক আইন জারীর সময়টা ছিল রাজনীতিকদের পক্ষে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ ও রাজনৈতিক মহল কিছুই করতে পারলো না।

---

৩ মুহম্মদ আইয়ুব খান, *প্রভু নয় বন্ধু* করাচী-ঢাকা-লাহোর, (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮) পৃষ্ঠা ৯২-৯৩
৪ পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা, ওয়ার্ণী প্রকাশনী ১৯৮৭)

রাজনৈতিক নেতাদের সমসাময়িক আচরণ ও কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁরা পূর্ব থেকেই দেশে সামরিক আইন জারীর কথা জানতেন। বিশেষ করে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা সামরিক আইনের ঘোষণাকে মৌন সমর্থনই জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও তদ্রুপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা ভাসানী এসময় পশ্চিম পাকিস্তানে সফরে ছিলেন এবং সামরিক আইন জারীর মাত্র পূর্বদিন তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। সামরিক আইন জারী হতে পারে- এ সংবাদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাওলানা ভাসানীই পূর্ব পাকিস্তানে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে সামরিক বাহিনীর সেনাপতিদের সাথে তার বৈঠক হওয়ার সত্যতা প্রশ্নাতীত ছিল না। তাঁর অনুসারী ছাত্রনেতাদের কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, নতুন করে 'মার্শাল ল' আসলে তারা কি করবে, কিন্তু তিনি নিজে কোনো নির্দেশ দেন নি। বরং তার পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার নির্ধারিত কর্মসূচী রেখে রাতের বেলাই রহস্যময়ভবে ঢাকা ছেড়ে তিনি সন্তোষ চলে যান'।[৫]

অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের অপর নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ইকবাল হল থেকে টেলিফোন করে সামরিক শাসন ঘোষণার প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরামর্শ চেয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিমুখ হন। বঙ্গবন্ধু তাদের অপেক্ষা করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দান করলে সংগঠিতভাবে আর কিছুই করা সম্ভব হয়ে উঠে নি'।[৫ক]

পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসনের পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কিভাবে কাজ করেছে তার বিবরণ দিয়েছেন এ সময়ে আন্দোলন পরিচালনাকারী একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বলেন,

'পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারীর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর প্রচার বিভাগ সাধ্যমতো প্রচার কাজ চালায়। চীনপন্থী ও মাওলানা ভাসানীর কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার কাজের সুবিধা করে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাপী প্রচার করে যে, পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব বাংলায় চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোনো অসামরিক সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি আয়ত্বে রাখা সম্ভব নয়। প্রমাণ হিসাবে তারা মাওলানা ভাসানীর ছবিসহ মাওলানা

৫ মাহবুবউল্লাহ, *ষাটের দশকের 'ছাত্ররাজনীতি'*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭
৫ক এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, (দ্বিতীয় খণ্ড)

ভাসানীর বক্তৃতা সমূহ প্রকাশ করতে থাকে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে সামরিক শাসন জারীর প্রয়োজনীয়তা বোধ করলে তার কারণ হিসেবে উগ্র বামপন্থীদের সুকৌশলে ব্যবহার করে।

কাজেই একথা মনে করা ঠিক নয় যে, এবার সামরিক শাসন জারীর পেছনে, সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। তবে এটা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদীরা এবার সুকৌশলে কাজ করেছে এবং নিজেরা পেছন থেকে অদৃশ্য কলকাঠি চালনা করেছে'।[৬]

তবু সামরিক আইন ঘোষণার বিরুদ্ধে তড়িৎ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ও আশপাশ এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করে। এ মিছিলে যোগদান করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুপার্শ্বে গড়ে উঠা প্রচুর সংখ্যক বস্তীতে বসবাসকারী মানুষজন। এ বস্তীবাসীরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অত্যন্ত বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের সামনের কাতারে সামিল হয়ে বস্তীবাসীরা মিছিল করে এবং অনেকে আত্মাহুতি দেয়'।[৭]

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংকুচিতভাবে হলেও অনুষ্ঠিত হয়। তবে এসব মিছিলে শুধু ছাত্ররাই নয়, ব্যাপক হারে শ্রমিকরাও যোগদান করে। সামরিক আদালতে এজন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে ৩১ জনকে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য গ্রেফতার কর হয় তাদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক অঞ্চল থেকে গ্রেফতারকৃত'।[৮]

রাওয়ালপিন্ডির সামরিক আদালত সামরিক আইন লংঘনের দায়ে ৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে তাৎক্ষণিক বিচারে এক বছর করে কারাদন্ডে দণ্ডিত করে'।[৯]

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে না ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত মোহাম্মদ ফরহাদের একটি গ্রন্থে:
'সামরিক শাসন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশে কোন স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দেয় নি, যদিও চট্টগ্রাম, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ছাত্র-যুবকরা

৬ মোহাম্মদ ফরহাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান* (ঢাকা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯) পৃষ্ঠা ১১৬
৭ সাক্ষাৎকার, ইয়াফেস ওসমান, আবুল কাসেম, সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ, ১৯৭০-৭১
৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ মার্চ ১৯৬৯
৯ ঐ ৯ এপ্রিল ১৯৬৯

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু সারা পূর্ব বাংলায় এ ধরণের ব্যাপক স্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হলো ক. ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন আহ্বান ছিল না। খ. পূর্ব বাংলার গণ-আন্দোলনে যে ছাত্র সমাজ অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে কার্যত বন্ধ থাকায় ছাত্ররা জমায়েত ছিল না, শ্রমিকরা নিজস্ব দাবী-দাওয়া নিয়ে ঘেরাও আন্দোলনে এত বেশী লিপ্ত ছিল যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি ঘটে যাচ্ছে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না গ. গোলটেবিল বৈঠকের পরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জনসাধারণের একটা অংশের মধ্যে 'মার্শাল ল হওয়া অস্বাভাবিক নয়' —এই মতো মনোভাব দেখা দিয়েছিল। জনগণের এই মনোভাব কাটিয়ে তাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জমায়েত রাখার জন্য সুস্পষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে কোন দলই কাজ করে নি। আমাদের পক্ষ থেকে (কমিউনিস্ট পার্টির—লেখক) এই বিপদের হুসিয়ারী দেয়া হলেও 'কি করিতে হইবে'— জনগণকে সেভাবে প্রস্তুত রাখা হয়নি ঘ. সামরিক শাসন ঘোষণার আকস্মিকতায় ব্যাপক মানুষ হতচকিত হয়ে পড়ে'।[১০]

দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতায় ধীরে ধীরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকে। ২৭ মার্চ (১৯৬৯) দৈনিক পত্রিকাসমূহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিসারের বরাত দিয়ে এ খবর পরিবেশন করা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্মঘট ছেড়ে পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার তাঁর ছাত্রদের ক্লাশে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে এদিন পত্রিকায় বিবৃতি দেন। সম্ভবতঃ এরপরেও ছাত্ররা ক্লাশে ফিরে আসে নি। কারণ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাশে যোগ দেওয়ার পুনঃ পুনঃ বিবৃতি এ সময় অব্যাহত ছিল।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরু হওয়ার কথা প্রচার করা হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ মার্চ খুলবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়'।[১১]

এদিকে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের মধ্যেও ছাত্রদের সম্বন্ধে অধিক মনোযোগ লক্ষ করা যায়। ২৮ মার্চ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, 'ছাত্ররা আগের মতোই যানবাহনে বিশেষ ছাড় (কনসেশন) পাবে'। ৩০ মার্চ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এ ঘোষণার পূনরাবৃত্তি করে বলা হয়, বাস, রেল ও বিমানে যাতায়াতে ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা

১০ মোহাম্মদ ফরহাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯
১১ বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক পাকিস্তান, ২৭, ২৮, ২৯ মার্চ ১৯৬৯

অব্যাহত থাকবে। শুধু তাই নয়, সামরিক কর্তৃপক্ষ ৩০ মার্চ এক ঘোষণাবলে ধর্মঘট, গোলযোগে ক্লাশ না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের এক মাসের বেতন মাফ করে দেওয়ার কথা প্রচার করে। ৩১ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের জন্যও অনুরূপ 'উৎকোচের' ব্যবস্থা করে ছাত্রদের খুশী করার চেষ্টা করা হয়'।[১২]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অন্তবর্তীকালীন সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যাদের বেতন ১০০ টাকা, তারা ২০% এবং যাদের বেতন ১০১—২০০ টাকা তারা ১৫% ভাতা পাবেন'।[১৩]

পয়লা এপ্রিলের দৈনিক সংবাদপত্রে ইয়াহিয়া খানের, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হিসেবেও রূপান্তরিত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়। ঢাকা জেলা জনসংযোগ অফিস এক বিজ্ঞপ্তিতে শহর থেকে অবিলম্বে সকল প্রকার পোস্টার, লিফলেট, চিকা তুলে ফেলার নির্দেশ দেয়। অস্ত্র জমা দেওয়ার সময় আরো ২৪ ঘন্টা বাড়ানো হয়। ঢাকা জেলা প্রশাসক অচিরেই এসব ব্যাপারে তদন্তে বের হবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সামরিক শাসনের কাজে নিয়োজিতদের মধ্যে লালকার্ড বিতরণ করা হয়'।[১৪]

সামরিক নেতাদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ শুরু

বিমানবাহিনী প্রধান ও সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার মার্শাল নূর খান ১১ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।[১৫] বৈঠকের কোনো বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়নি। কে কে এ বৈঠকে যোগদান করেন তারও কোনো তথ্য, সরকারী তথ্য বিবরণীতে উল্লিখিত হয় নি।

এর কয়েকদিন পরই ঢাকার অদূরে ডেমরায় এবং কুমিল্লায় পয়লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) ভয়াবহ টর্নেডোতে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটে। টর্নেডোতে সমগ্র এলাকা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

---

১২ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯, ৩০ মার্চ ও পয়লা এপ্রিল ১৯৬৯
১৩ ঐ, ২৯ মার্চ ১৯৬৯
১৪ ঐ, ২৮ মার্চ ও পয়লা এপ্রিল ১৯৬৯
১৫ ঐ, ১২ এপ্রিল ১৯৬৯

দশজন ছাত্র নেতা এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি জরুরী তার বার্তা প্রেরণ করেন। তারবার্তায় এ এলাকাকে 'দুর্গত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার দাবী জানানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দীনের মাধ্যমে এ বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

এতে স্বাক্ষর করেন ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমদ ও নাজিম কামরান চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাইফউদ্দিন মানিক ও সামসুদ্দোহা, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহ, এন. এস. এফ-এর মাহবুবউল হক দুলন ও ফখরুল ইসলাম'।[১৬]

ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ডাকসুর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয় এবং দূর্গত ছাত্রদের বই-পত্র কেনার জন্য ডাকসু তার বার্ষিক অনুষ্ঠান বাতিল করে সাহায্য তহবিলে তার টাকা দান করে। সংস্কৃতি সংসদ (মতিয়াপন্থী) কারিগরী মিলনায়তনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে কার্ড বিক্রির আয় থেকে ৩,৬৩৭ টাকা দূর্গতদের সাহায্যের তহবিলে জমা দেয়'।[১৭]

ছাত্র সংগঠনে ভাঙনের ধ্বংস

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর সৃষ্ট ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন একটু শিথিল হতে থাকলে ছাত্র সংগঠনগুলি এক দীর্ঘ ও জঙ্গীতম ছাত্র আন্দোলনের পর যার যার ঘর গোছাতে শুরু করে।

কিন্তু নতুন করে সুসংবদ্ধ হতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনই দ্বিধাবিভক্ত কিংবা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে। সংগঠনগত দিক থেকে একমাত্র ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ইসলামী ছাত্র সংঘে কোনো বিভক্তি আসে নি। তবে এসব সংগঠনেও আন্তমতাদর্শগত সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।

---

১৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৯
১৭ ঐ, ২০, ২৭, ৩০ এপ্রিল ১৯৬৯

ছাত্রলীগে ভাঙন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছিল মূলত বৃটিশ আমলের নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগেরই উত্তরসূরি। 'নিখিল বঙ্গে'র স্থলে এ সংগঠন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান' বসিয়ে ৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর পাকিস্তানে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে এ 'নিখিল' ছাত্রলীগ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলে বিদ্রোহী অংশ শামসুল হুদা চোধুরী ও শাহ আজিজুর রহমানকে বাদ দিয়ে রাজশাহীর নইমুদ্দিন আহমদকে আহবায়ক করে নতুন করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করে (শুধুমাত্র 'নিখিল' শব্দটি বাদ দিয়ে)। সে থেকে (১৯৪৮ সাল থেকে) ছাত্রলীগ শাহ আজীজ গ্রুপ ও নইমুদ্দীন গ্রুপ নামে প্রথম ভাঙন দেখা দেয়। পরে নইমুদ্দীন আহমদও উপদলীয় কোন্দলে ১৯৪৯ সালে বহিস্কৃত হন। ছাত্রলীগের ১৯৪৯-৫০ সালের সম্মেলনে একটি গ্রুপ, সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করে ব্যর্থ হয়ে সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এদের অনেকে পরে ছাত্র ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং যুবলীগ গঠন করেন।

এরপর ছাত্রলীগের প্রায় প্রতিটি সম্মেলনেই কমিটি গঠন প্রশ্নে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগে এ নিয়ে বড় ধরনের বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সিরাজুল আলম খানকে এবং পাল্টা শেখ ফজলুল হক মনি, ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে সভাপতি বানাতে চাইলে কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌছে। এ সম্মেলনে ছাত্রলীগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্রে 'সমাজতন্ত্র' শব্দ ঢোকানোকে নিয়েও গোল বাধায় দ্বন্দ্ব কিছুটা আদর্শিক রূপও পেয়েছিল। কিন্তু এরপরও ছাত্রলীগ শেষ পর্যন্ত ভাঙে নি'।[১৮]

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব কর্তৃক ৬ দফা ঘোষণার পর ছাত্রলীগে ৬ দফাপন্থী ও পি.ডি. এম পন্থী[১৯] আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগে ভাঙন আসে নি।

---

১৮ ১৯৪৮ ও ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগের ভাঙন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দেখুন মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (গ্রন্থলোক, ১৯৮৬) এবং দ্বিতীয় খণ্ড, (ওয়ার্সী, ১৯৮৭)

১৯ পি. ডি. এম. (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) নামক আইয়ুব বিরোধী একটি রাজনৈতিক জোট। জোটে পাকিস্তানের প্রায় সকল বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬ দফা ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগের একটি অংশ ৬ দফা বিরোধিতা করতে থাকে। পরে ৬ দফা পন্থীরা পি. ডি. এম থেকে বের হয়ে আসে। সে থেকে আওয়ামী লীগের দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৭ জুনে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে একদিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন প্রশ্নে ছাত্রলীগ দ্বিতীয়বারের মতো বড় ধরনের ভাঙনের সূত্রপাত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের এ সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা থাকলেও তিনি শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে যান নি।

১৯৪৮ সালের ভাঙনের পর আদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলীই ঐক্যবদ্ধ ছাত্রলীগের শেষ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এ দুই ছাত্রনেতাই তোফায়েল আহমদ ও আ.স.ম. আবদুর রবকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত কমিটির সমর্থক ছিলেন। মূল দল ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের পুরো সমর্থনও এরা পেয়ে যান।[১৯ক]

আলমুজাহিদী ও আবদুল মান্নান খানকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে পাল্টা যে কমিটি গঠিত হয় তার মূল সমর্থক ছিলেন ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী'।[২০]

আল মুজাহিদী ও আবদুল মান্নান তাঁদের ছাত্রলীগের নাম রাখেন পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগ। বস্তুতঃ পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরে থেকে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে এটাই ছিল প্রথম 'বাংলা' নামে নাম। এ যেমন ছিল প্রথম, তেমনি অত্যন্ত সাহসিকও। অবশ্য এ সাহসেও যে দ্বিধা ছিল তার প্রমাণ রয়েছে উদ্যোক্তাদের বিবৃতিতে। পয়লা জুলাই তাঁরা উল্লেখ করেন, এটি একটি প্রস্তাবমাত্র। আরো কয়েক মাস তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নামেই কাজ চালিয়ে যাবেন'।[২১]

আল মুজাহিদী গ্রুপ দাবী করেন তাদের সম্মেলনে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। উপায়ান্তর না দেখে অধিকাংশ কাউন্সিলার নিয়ে তারা প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। তাঁরা দাবী করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কর্মী তাঁদের সাথে ছিলো। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ-এর জেলা কমিটি তাঁদের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করে'।[২২]

অন্যদিকে, তোফায়েল আহমদ ও আ.স.ম. আবদুর রব এক বিবৃতিতে দাবী করেন, কাউন্সিল অধিবেশনে কোনো মতভেদ হয় নি। সর্বসম্মতিক্রমেই তাঁরা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন'।[২৩]

১৯ক সাক্ষাৎকার : তোফায়েল আহমদ
২০ সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৬৭-৬৮
২১ দৈনিক পাকিস্তান, পয়লা জুলাই ১৯৬৯
২২ সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী
২৩ দৈনিক পাকিস্তান, পয়লা জুলাই ১৯৬৯

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন:

সহ সভাপতি	:	শেখ শহীদুল ইসলাম, আবদুল হাই, রাফিয়া আক্তার ডলি
সহসাধারণ সম্পাদক	:	মনিরুল হক চৌধুরী, আলী হাফিজ সেলিম, ইউসুফ সালাউদ্দীন, এনামুল হক, মনিরুল হক, মোজাম্মেল হক
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	শাহজাহান সিরাজ
প্রচার সম্পাদক	:	স্বপন কুমার চৌধুরী
দপ্তর সম্পাদক	:	মোস্তাফিজুর রহমান
পাঠচক্র সম্পাদক	:	নাজিম উদ্দিন মাহমুদ
সাহিত্য সম্পাদক	:	মোস্তাক ইলাহী
প্রমোদ সম্পাদক	:	আহমদ জামিল ইব্রাহিম
ক্রীড়া সম্পাদক	:	মহিউদ্দিন আহমদ
কোষাধ্যক্ষ	:	সৈয়দ রেজাউর রহমান'[২৪]

এ কমিটির সমর্থক বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী বলেন, কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করায় তাঁরা দুঃখিত। তাঁরা বলেন, 'সাবজেক্ট কমিটি'র খসড়াই কাউন্সিলররা চূড়ান্তভাবে পাশ করেছে। সম্মেলন কক্ষে এ নিয়ে কাউকে মারধর করা হয় নি। কিংবা কোন প্রকার ভয় ভীতিও দেখানো হয় নি। কেউ সম্মেলন ত্যাগ করেছে একথাও সত্য নয়'।[২৫]

এদিনই পাল্টা আর এক বিবৃতিতে ৬ জন ছাত্রলীগ নেতা দাবী করেন যে, অগণতান্ত্রিক ও অস্বস্তিকর পরিবেশে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, তোফায়েল আহমেদকে সভাপতি করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তা তাঁরা মানেন না। এতে স্বাক্ষর করেন ইকবাল হল সংসদের সহসভাপতি মুহম্মদ খালেদ হাশিম, জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি কাজী ফিরোজ অর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদ, মহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, ইকবাল হল সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ'।[২৬]

---

২৪ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯জুন ১৯৬৯
২৫ ঐ দোসরা জুলাই ১৯৬৯
২৬ ঐ

দোসরা জুলাই ছাত্রলীগ (আল মুজাহিদী গ্রুপের) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভায় প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা ফেরদৌস আহমদ কোরেশীও বক্তৃতা করেন। তিনি এ উপদলের প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে'।২৭

ছাত্রলীগের ভাঙনের এ রেশ চলতেই থাকে। বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি এমনকি সংঘর্ষও ঘটতে থাকে। এ সময়ে ঢাকা শহর সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উভয় উপদল নতুন করে দ্বন্দ্বে মেতে উঠে। ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান ছাত্রলীগ নেতারা, বিশেষ করে ঢাকা শহর সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র জগন্নাথ কলেজ শাখা ছিল পুরোটাই আল মুজাহিদী গ্রুপের পক্ষে। এদের সমর্থক কাজী ফিরোজ অর রশীদ এ সময় ছাত্র সংসদেরও সহসভাপতি ছিলেন। ঢাকা শহর শাখা সম্মেলন এ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কয়েকবার পেছানো হয়। তোফায়েল গ্রুপ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের ২২ জুন, ১৯৬৯-এর সভায় মাহাবুব আলী মিলনায়তনে ২৫জুন ঢাকা শহর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু গোলযেগের আশঙ্কায় হঠাৎ করেই সম্মেলনের স্থান ফজলুল হক হলে স্থানান্তরিত করা হয়। মাহাবুব আলী মিলনায়তনেও প্রতিনিধিরা আসতে থাকে। কিন্তু পরে সকলেই ফজলুল হক হলে গমন করে। নির্ধারিত সময়ের ৩ ঘন্টা পর সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন শেষে নতুন কমিটি ঘোষণায় দেরী হতে থাকলে আল মুজাহিদী গ্রুপের কাজী ফিরোজ অর রশীদ, এম. এ. রেজাকে সভাপতি ও মো: ইসহাককে সাধারণ সম্পাদক করে একটি প্যানেল ঘোষণা করেন। তিনি যখন প্যানেল ঘোষণা করছিলেন তখন প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি আবদুর রউফ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন।

আল মুজাহিদীপন্থীরা দাবী করেন, প্যানেলটি সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়েছে। গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় তোফায়েল আহমদপন্থীরা ফজলুল হক হল ছেড়ে ইকবাল হলে গিয়ে নতুন করে আবার সম্মেলন শুরু করে এবং মফিজুর রহমানকে সভাপতি ও রেজাউল মোস্তফাকে সাধারণ সম্পাদক করে পাল্টা আরেকটি কমিটির ঘোষণা দেন'।২৮

৭ জুলাই জগন্নাথ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতা তোফায়েল আহমদ ও আল মুজাহিদী--এ উভয়ের নেতৃত্বের প্রতিই অনাস্থা ব্যক্ত করে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগকে বিভক্ত করার অধিকার

২৭ দৈনিক পাকিস্তান, ৫ জুলাই ১৯৬৯
২৮ ঐ ৭ জুলাই ১৯৬৯

কারোরই নেই। তিনি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সশস্ত্র গুণ্ডা দিয়ে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির জন্য তোফায়েল গ্রুপকে দায়ী করেন। আগামী এক মাসের মধ্যে তিনি নতুন করে কাউন্সিল অধিবেশন ডাকারও আহ্বান জানান'।[২৯]

দুই উপদলের এমন এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ৮ জুলাই (১৯৬৯) ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ১৫/ক পুরানা পল্টন থেকে ৪২, বলাকা ভবনে স্থানান্তর করা হয়। নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। শেখ মুজিব কর্তৃক ছাত্রলীগ কার্যালয় এমন পরিস্থিতিতে ঘটা করে উদ্বোধনের অর্থ ছিল তোফায়েল আহমদ ও আ. স. ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন কমিটির প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন পুরোপুরি আছে এটা দেখানো। বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনকালে তাঁর ভাষণে ছাত্রলীগের ঐতিহাসিক অবদান ও গুরুত্বের তাৎপর্যকে ইঙ্গিত করে বলেন, যে সময়ে কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না, এমনকি আওয়ামী লীগও ছিল না, সে সময় ছাত্রলীগই বাংলা ভাষার ওপর হামলাকে প্রতিহত করেছে'।[৩০]

ছাত্রলীগের ভাঙন ও ঐক্য আলোচনায় বিতর্ক ও তাগিদ এরপরও বহুদূর বিস্তৃত হতে থাকে। সারা দেশেই এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে তদবীর, আলোচনা এবং কমিটি ভাঙনের মধ্য দিয়ে এগুতে থাকে। এমতাবস্থায় ছাত্রলীগ পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রিকুইজিশন কাউন্সিল করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা বলে, বিগত সম্মেলনে গঠনতন্ত্র বিরোধিতা করে এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রয়োজনে তারা ঢাকা থেকে রাজশাহী এসে কাউন্সিল করার জন্যও উভয় উপদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের আহ্বান জানান'।[৩১]

ভাঙনের পর ছাত্রলীগের পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ২০ মার্চ শুক্রবার। তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। প্রদেশের ১৭টি জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি এতে যোগদান করে। ইকবাল হলের মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন স্থানের সম্মুখভাগে 'জয়বাংলা' শ্লোগান সংবলিত মনোরম তোরণ নির্মাণ করা হয়।

সম্মেলনে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বৃটিশ যুগের ছাত্রনেতা কামরুদ্দিন আহমদ। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে অর্থনৈতিক

---

২৯ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জুলাই ১৯৬৯
৩০ ঐ ৯ জুলাই ১৯৬৯
৩১ ঐ ২৮ জুলাই ১৯৬৯

পুনর্গঠন কাজে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলা হয়। ছাত্রলীগের কোন দলিলে সরাসরি 'সমাজতন্ত্র' শব্দ এই প্রথম ব্যবহৃত হলো।

নতুন কার্যকরী পরিষদে সভাপতি হিসাবে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ ফারুক আহ্‌মেদ প্রমুখ নির্বাচিত হন'।[৩২]

অন্যদিকে বিভক্ত ছাত্রলীগের অপর অংশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২১ মার্চ (১৯৭০) লালকুঠি মিলনায়তনে। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক বিচাপতি জনাব মাহবুব মোর্শেদ এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দু'দিনব্যাপী বাংলা ছাত্রলীগের এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এ গ্রুপের সভাপতি আল মুজাহিদী।[৩৩]

কিন্তু জুন (১৯৭০) মাসে এ গ্রুপ (বাংলা ছাত্রলীগ) আবারও আরেক ধাপ ভাঙনের সম্মুখীন হয়। ৮ জুন এ সংগঠনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একটি রিকুইজিশন সভা আহবান করে পাল্টা আরেকটি ছাত্রলীগের কমিটি করার প্রক্রিয়া শুরু করে।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগও যা তোফায়েল গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ছিল তাও আবার এক ধাপ ভাঙনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দলে দু'টি ধারণা প্রবলভাবে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছিল।

১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় স্বপন কুমার চৌধুরী 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রস্তাব উত্থাপন করলে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ইতিহাসবিদ মেজবাহ কামাল জানিয়েছেন, এ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ৫৫-৭ ভোটে গৃহীত হয়েছিল।[৩৪]

কিন্তু বর্তমান লেখক বিষয়টি ছাত্রলীগ নেতা আবদুল কুদ্দুস মাখনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, 'ছাত্রলীগে এ ধরনের আলাপ-আলোচনা প্রায়ই হতো। যেমন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যাওয়া উচিৎ কি উচিৎ নয় এসব ব্যাপারও অনেক আলাপ হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে। একদল (আ. স. ম. আবদুর রবরা) চাইতেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না যাক। কিন্তু আমরা চাইতাম নির্বাচনে

৩২ দৈনিক পাকিস্তা ২১, ২৩, ২৭, ২৯ মার্চ ১৯৭০
৩৩ ঐ ২১ মার্চ ১৯৭০
৩৪ মেসবাহ কামাল, *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, (ঢাকা, বিবর্তন, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ১০৫

যাওয়াটাই সঙ্গত হবে, এতে আন্দোলন আরো বেগবান হবে। পাকিস্তানীরা আমাদের দাবী নির্বাচনের রায় না মেনে নিলেও আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের যাত্রা আরো বেগবান হবে। ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে, নির্বাচনে আওয়ামীলীগ গিয়ে ভালই করেছিল। বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার বৈধ ও একমাত্র লাইসেন্স পেয়েছিলেন, আর তা-ই আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বড় ধরনের ম্যাণ্ডেট হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত দলের নেতা না হলে বিশ্ববাসীও তাঁর দাবী নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তো। স্বপন চৌধুরী উত্থাপিত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাবের মতো অনেক কথা, বিতর্ক ছাত্রলীগে সব সময়ই অব্যাহত ছিল। আগস্ট মাসেও এ রকম একটি প্রস্তাব উঠে। আলাপ-আলোচনা হয়েছিল এর উপর। কিন্তু ভোট হয় নি। পাশ হওয়ার তাই প্রশ্নই উঠে না।[৩৫]

কিন্তু ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটগুলোর সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের এই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দুটো আলাদা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ঢাকা শহরে ছাত্রলীগের প্রধান ঘাঁটি জগন্নাথ কলেজের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আবার বড় ধরনের মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এখানে আয়োজিত ২৬ সেপ্টেম্বর একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডাকসুর সহসভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব এবং বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ ও সহ সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম মাহবুবুল হক। কার্যকরী সভাপতি নূরু মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে নতুন সভাপতির দায়িত্ব নেন কাজী জাহাঙ্গীর ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান সাইদুর রহমান।

অন্যদিকে, একই দিন জগন্নাথ কলেজ শাখার সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আরো একটি সম্মেলন। এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শেখ শহীদুল ইসলাম। সম্মেলনে আবুল হাসনাতকে সভাপতি ও আবদুর রউফকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৩৬]

৩১ জানুয়ারী ছাত্রলীগের একটি বিবদমান গ্রুপ টাঙ্গাইল জেলা সম্মেলনের আহ্বান করলে কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ একটি যৌথ বিবৃতি দিতে সমর্থ হন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, কতিপয়

৩৫ সাক্ষাৎকার, আবদুল কুদ্দুস মাখন, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), ১৯৭০-৭১
৩৬ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

ছাত্রলীগ কর্মী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নাম ভাঙিয়ে টাঙ্গাইলে যে সম্মেলনের ডাক দিয়েছে তার সাথে ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এ মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং স্বাধীনতার অল্প কয়েক দিন পরেই তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

পরে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ-এর ঐক্যমতে টাঙ্গাইল জেলা কমিটি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব নিতে সক্ষম হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় :

'অদ্যকার এই সভা টাঙ্গাইল জেলায় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাজে অচলাবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টাঙ্গাইল ছাত্রলীগের তথাকথিত কাদের সিদ্দিকী ও তার কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক ভুয়া প্যানেলকে অবৈধ বিবেচনা করে টাঙ্গাইল জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল বাতেন ও আলমগীর খান প্যানেলের নেতৃত্বে কাজ করে যাওয়ার জন্য টাঙ্গাইলের ছাত্রলীগ কর্মীদের নির্দেশ প্রদান করছে এবং উক্ত দুষ্কৃতকারীরা অস্ত্রের হুমকি দেখিয়ে ছাত্রলীগের নামে যে সকল শাখা গঠন করেছে তা বাতিল বলে ঘোষণা করছে।[৩৭]

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজের রিপোর্টেও উপরিউক্ত মতাদর্শগত বিরোধের বিষয়গুলো স্থান পায়। রিপোর্টে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 'স্বাধীনতা প্রস্তাব' উত্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল কি না তা বলা হয় নি। তবে বলা হয়েছে প্রস্তাব উত্থাপনের পর 'গুটি কয়েক সদস্য তীব্রভাবে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে'।[৩৮]

এ থেকে বোঝা যায়, প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী সদস্যরা তার বিরোধিতা করায় শেষ পর্যন্ত তা আর পাশ হয় নি। শাহজাহান সিরাজের রিপোর্টে এ বিরোধিতাকারীদের বলা হয়েছে, 'স্বাধীনতা বিরোধী'।

এই সময়কার ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের আর একটি চিত্র পাওয়া যায়, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর নামে প্রচারিত একটি পুস্তিকায়:

---

৩৭ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ৫,৬,৭ মার্চ এবং ১৯,২০,২১২২,২৩ মার্চের বর্ধিত সভায় গৃহীত নীতি নির্ধারণী প্রস্তাবাবলী, পৃষ্ঠা, ৩ (গ্রন্থের লেখকের কাছে এক কপি সংরক্ষিত আছে)

৩৮ শাহজাহান সিরাজ, সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী (বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৯৭২)

'বিগত ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের বর্ধিত সভায় নির্বাচন বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য এরা (রব-সিরাজরা—লেখক) সচেস্ট হয়েছিল এবং নির্বাচনের পূর্বেই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তাব এনেছিল। আমরা (সিদ্দিকী-মাখনরা—লেখক) বলেছিলাম,... নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় গ্রহণ করেই বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে ...সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবো'।[৩৯]

ছাত্রলীগের সমাজতন্ত্র

উনসত্তর পরবর্তী ছাত্রলীগ কর্মধারায় বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রায় নিয়মিত সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হতো। একটি প্রধান ছাত্র সংগঠনের এ ধরনের সাহিত্য সভা অনুষ্ঠান ব্যতিক্রমী ঘটনা।

এছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাসিক-পাক্ষিক আলোচনা সভাও এ সময় ছাত্রলীগ কার্যালয়ের একটি নিয়মিত ঘটনা। কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক লেখাপড়া ঘটানোর প্রয়াস থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২৯ জুলাই (১৯৬৯) অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ নেতা শেখ শহিদুল ইসলাম। বস্তুত 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি ছিল ছাত্রলীগে তখন নতুন। তাই ঘন ঘন ছাত্রলীগে এর উপর আলোচনা, বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো।[৪০]

ষাটের দশকে এমনি করে আওয়ামী লীগেরও সমাজতন্ত্র বিষয়ে ঘরোয়া বৈঠক হতো। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুস সালাম খানের পল্টনস্থ বাসায় এ ধরনের ঘরোয়া সমাবেশে সমাজতন্ত্রের উপর মত বিনিময়ের জন্য প্রায়ই একত্রিত হতেন, শেখ মুজিব, রেহমান সোবহান, ডঃ আলিম আল রাজী, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ।[৪১]

৬ অক্টোবর (১৯৬৯) মধুর রেস্তোরায় ঢাকা শহর ছাত্রলীগের এক কর্মীসভায় ছাত্র লীগ নেতা আ. স. ম. আবদুর রব 'বিদেশী ইজমের ব্যাপারে ছাত্রলীগ কর্মীদের সতর্ক থাকার আহবান জানান'।[৪২]

---

৩৯ নূরে আলম সিদ্দিকী, 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপাইয়া আসুন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ২৪ মে ১৯৭২
৪০ সাক্ষাৎকার, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং দৈনিক পাকিস্তান, ২৬,৩০ জুলাই ১৯৬৯
৪১ খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *মুজিববাদ* (সাম্য প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ৫৬৩
৪২ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ অক্টোবর ১৯৬৯

প্রকৃতপক্ষে এখানে 'বিদেশী ইজম' বলতে তিনি 'সমাজতন্ত্র'কেই ইঙ্গিত করেন। ফলে ছাত্রলীগ একটা স্ববিরোধিতাপূর্ণ অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। একথা সত্য যে, ছাত্রইউনিয়নের সমাজতন্ত্র শ্লোগানকে মোকাবেলার জন্যই ছাত্রলীগকে তাদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যাকে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী (১৯৭০) অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সভায়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়, ছাত্রলীগ যে সমাজতন্ত্র চায় তা হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'।[৪৩]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের একজন প্রাক্তন সম্পাদক তাঁর রচিত একটি পুস্তিকায় এ সম্পর্কিত একটি বিবরণ দিয়েছেন,

'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তত্ত্বগত আদর্শ হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে গ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মানসে শেখ ফজলুল হক মনি কর্তৃক সিরাজুল আলম খান এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তাবিদ এম আনিসুজ্জামান সাহেবকে দিয়ে ছাত্রলীগ অফিসে (বলাকা বিল্ডিং) শিক্ষাপর্ব চালু করান হয়।

'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' পর্যায়ে শীর্ষক আলোচনার প্রথম সভা বসে ৬ জুলাই ১৯৬৯, দ্বিতীয় সভা ২০ জুলাই, তৃতীয় সভা ২৭জুলাই ১৯৬৯ সালে। এমনি ধারাবাহিকভাবে প্রতি রবিবারে স্বাধীনতার লড়াইর প্রায় পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উপর শিক্ষাপর্ব।...

১০ অক্টোবর (১৯৬৯) সালে নিলফামারীতে তথ্য মজলিস কেন্দ্রে জেলা সম্মেলনে (ছাত্রলীগ) প্রস্তাব নেওয়া হলো চীন বা রাশিয়া থেকে ধার করা সমাজতন্ত্র হইবে না, উহা হইবে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'।[৪৪]

৪৩ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ জানুয়ারী ১৯৭০
৪৪ ইকবাল হোসেন, *নীল নকশা* (ঢাকা, জাতীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা ১৫

ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন) ছিল মূলত সরকারী ছাত্র সংগঠন। আইয়ুব খানের বিশ্বস্ত সহচর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্র রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য 'মাশলম্যান' ভিত্তিক একটি পেশাদার বাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্যে এ সংগঠনকে পুনর্গঠন করেছিলেন। কিন্তু আইয়ুব ও মোনায়েম খানের পতনের পূর্বে এন. এস. এফ বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একটি উপদল ডাকসুতে আংশিকভাবে ক্ষমতায় ছিল। ডাকসু সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী ছিলেন এন. এস. এফ নেতা। নাজিম কামরান ও মাহবুবুল হক দুলনের নেতৃত্বে একটি উপদল আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ছাত্র সংগাম পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অংশ নেয়।

সরকারী ছাত্র সংগঠন হয়েও সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পেছনে তাঁদের অন্য কারণ ছিল।

১৯৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিনে ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এন. এস. এফ) জন্ম লাভ করে। পাকিস্তান ছাত্রশক্তিতে কাজ করতো এমন একটি গ্রুপই এন. এস. এফ-এর জন্ম দেয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক নেতা জেনারেল ওমরাও খানকে পাকিস্তান ছাত্রশক্তি তাদের এক অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলে সংগঠনে মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন ছাত্রশক্তির মূল নেতা ছিলেন ফরমানউল্লা খান, মওদুদ আহমেদ। যাঁরা জেনারেলের আগমনের বিরুদ্ধে সংগঠনে প্রতিবাদী হলেন তাঁদের মধ্যে এ. আর ইউসুফ, এ. টি. এম তাহা, আসফউদ্দোলা, আনোয়ারুল হক কচি প্রমুখ ছিলেন প্রধান। এ সময় ছাত্রশক্তির এক সম্মেলনে হয়। এখানে কমিটি গঠন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে একটি গ্রুপ ছাত্রশক্তি থেকে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এন. এস. এফ গঠন করে।

আইয়ুব--মোনায়েমের দশ বছরের শাসনকালে এন. এস. এফ প্রধানভাবে আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত থাকলেও মূলত এর নেতৃত্বের মধ্যে নানা মত, নানা পথ ও ব্যক্তির যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এন. এস. এফ-এর সাধারণ সম্মাদক মাহবুবুল হক দুলন আইয়ুব খানের পরিবর্তে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। বস্তুতঃ ষাটের দশকের শেষ দিকে এন. এম. এফ-এর প্রধান নেতা দুলন ছিলেন বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি প্রথমে

আইয়ুব মন্ত্রিসভার সদস্য জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমর্থক ছিলেন। ভুট্টো মন্ত্রিসভা ত্যাগের পর তারই আমন্ত্রণে প্রথম ঢাকা সফর করেন। ভুট্টোকে সংবর্ধনা দেওয়ার কারণে দুলন এন. এস. এফ থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এন. এস. এফ-এ এতোই শক্তিশালী ছিলেন যে এ বহিস্কার আদেশের প্রতিবাদে ১৫ দিনের মধ্যে পুরো কেন্দ্রীয় কমিটিই তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন এবং নতুন আহবায়ক কমিটি গঠন করেছিলেন।[৪৫]

এন. এস. এফ ভাঙনের পশ্চাতে কনভেনশন মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও কাজ করেছে। এ দলের সভাপতি ছিলেন আইয়ুব স্বয়ং, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের খান. এ সবুর। কিন্তু পুর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের সাথে সবুর খানের কোনো বনিবনা ছিল না। উনসত্তরের গণঅভ্যুথানে এন. এস. এফ-এর যাঁরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রংণ করে তাঁরা ছিল মূলত সবুর খানের সমর্থক, মোনায়েম খানের পতন কামনাই ছিল তাদের কাছে মুখ্য, আইয়ুব খানের পতন নয়।[৪৬]

সুতরাং এন. এস. এফ-এর মাহবুবুল হক দুলন, নাজিম কামরান চৌধুরী যখন ১১ দফা সমর্থন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে যুক্ত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, তখন জমির আলী গ্রুপ (তাঁরা মোনায়েম খানের সমর্থক ছিলেন, সবুর খানের বিরোধী) পাল্টা ২২ দফা দেয়। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও ৬৯ সালেই মূলত এন. এস. এফ বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মাহবুবুল হক দুলন, অন্যদিকে জমির আলী।

এমতাবস্থায়, ৬৯-এর গণআন্দোলনের পর এন. এস. এফ-এর সম্মেলন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৩ জুলাই (১৯৬৯) কারিগরী মিলনায়তনে মাহবুবুল হক দুলনের সভাপতিত্বে বার্ষিক কাউন্সিল সভা শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন এন. এস, এফ-এর প্রাক্তন নেতা ব্যারিস্টার এ. আর ইউসুফ। বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় জীবনে ইসলামী তমুদ্দুন প্রতিষ্ঠার জন্যই জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের জন্ম হয়েছে।

৪৫ সাক্ষাৎকার, মাহবুবুল হক দুলন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন. এস. এফ), ১৯৬৪-৬৫
৪৬ সাক্ষাৎকার, জমির আলী, সাধারণ সম্পাদক, এন. এস. এফ, ১৯৬৬-৬৯

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জমীর আলী এতে তাঁর বক্তৃতায় নতুন করে বিতর্কিত বিষয়ের সূচনা করেন। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা করে একে বর্জনের আহবান জানান। জমীর আলী, দেশে সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বইয়ের প্রচার বন্ধ করারও আহবান জানান।[৪৭]

সম্মেলন শেষে কমিটি গঠন প্রশ্নে এন. এস. এফ নেতৃবৃন্দ তীব্র মতবিরোধে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। ইব্রাহিম খলিলকে সভাপতি ও ফখরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। এর প্রতিবাদে আবু সুফিয়ানকে সভাপতি ও আবুল কাইয়ুম খন্দকারকে সাধারণ সম্পাদক করে পাল্টা আরেকটি কমিটি গঠিত হয়।

এন. এস. এফ সম্মেলনের এ মতবিরোধ পাল্টাপাল্টি এ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়েই শেষ হল না। সম্মেলনের কয়েকদিন পর এন. এস. এফ নেতা মাহবুবুল হক দুলনকে, বিরোধী গ্রুপ বাসা থেকে ডেকে এনে মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে গুরুতরভাবে জখম করে ফেলে রেখে যায়।[৪৮]

মাহবুবুল হক দুলন আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এন. এস. এফ-এর নেতৃত্ব দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি এন. এস. এফ সম্মেলনে দ্বিধাবিভক্ত ইব্রাহিম খলিল– ফখরুল ইসলাম কমিটির সমর্থক ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) দুলনের উপর হামলার প্রতিবাদে এক ছাত্রসভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন নাজিম কামরান চৌধুরী। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর নেতা মাহবুবউল্লাহ, ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র নেতা নূরুল ইসলাম,এন. এস. এফ নেতা তাজুল ইসলাম হাশমী ও ফখরুল ইসলাম, ছাত্রলীগ (আলমুজাহিদী) নেতা আঃ মান্নান খান এতে বক্তৃতা করেন।

সভায় বিশেষ মহলের সমর্থন পুষ্ট গুণ্ডাবাহিনীর সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের আহবান জানিয়ে উপাচার্য বরাবরে একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।[৪৯]

---

৪৭ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জুলাই ১৯৬৯
৪৮ ঐ, ১৯ জুলাই ১৯৬৯
৪৯ ঐ ২০ জুলাই ১৯৬৯

এন. এস. এফ-এর পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ আগস্ট ঢাকায় কাজী কাদেরের নির্মিতব্য নিজস্ব হোটেল ইলিসিয়ামে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাইউমপন্থী মুসলিম লীগের প্রধান খান আবদুল কাইউম খান। সম্মেলন মঞ্চে কাজী কাদের, ওয়াহিদুজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই এই সম্মেলন নিয়ে উত্তেজনা চলছিল। এমনকি, গোলযোগের আশঙ্কায় কোন এন. এস. এফ কর্মী নয়, অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন মুসলিমলীগ নেতা কাজী কাদের স্বয়ং।

কাইউম খান এতে বক্তৃতা করেন। এবং তাঁর বক্তৃতার সময়ই একদল ১১ দফা সমর্থক এন. এস. এফ কর্মী, ১১ দফা সম্পর্কে কাইউম খানের মন্তব্য কি তা চিৎকার করে জানতে চায়। এরই মধ্যে কাইউম খানের বক্তৃতা শেষ হয়ে যায়।

এবং মঞ্চে উঠেন এন. এস. এফ-এর 'কিং মেকার' ও ১১ দফা আন্দোলনের নেতা মাহবুবুল হক দুলন। তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করতেই একদল বাধা দেয়। ফলে দুলন সমর্থক ও বিরোধীরা এক বড় ধরণের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগান এবং চেয়ার ছোড়াছুড়ির মধ্য দিয়ে সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়।

পরে এন. এস. এফ সভাপতি ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, দলের সিদ্ধান্ত ছাড়াই কাজী কাদের গোষ্ঠী কাইউম খানকে প্রধান অতিথি করে। তাঁরা কাইউম খানের ১১ দফার বিরোধিতার ও শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে উকালতি করারও নিন্দা করেন।

সারা দেশের এন. এস. এফ-এর জেলা কমিটিগুলিও এ ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেয়। তারা বলে, ১১ দফার প্রতি মুসলিম লীগের সমর্থন আছে কিনা জানতে চাইলে কাজী কাদেরের গুণ্ডারা তাদের সম্মেলন থেকে বের করে দেয়।[৫০]

এন. এস. এফ-এর একটি অংশ মুসলিম লীগের সমর্থক, এমনকি আইয়ুব খানের সমর্থক হয়েও ১১ দফা সমর্থক ছিল। এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই। কারণ ১১ দফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬ দফাও। এ সম্পর্কে মাহবুবুল হক দুলন বলেন, 'আমি প্রকৃত পাকিস্তানী ছিলাম বলেই ৬ দফা, ১১ দফা সমর্থন করতাম। কারণ পাকিস্তানের দুই অংশের সম্মানজনকভাবে এক সাথে অবস্থানের

৫০ দৈনিক পাকিস্তান ৩১ আগস্ট ১৯৭০

প্রধান উপাদানই ছিল ৬ দফা। পাকিস্তান চিরজীবনের মতো ভেঙে যাওয়ার থেকে ৬ দফা শুধু ঐক্যের উপাদানই নয়, জনগণের জন্যও ছিল মঙ্গলজনক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ তা বুঝতে পারেন নি'।৫১

এন. এস. এফ-এর এটি ছিল শেষ সম্মেলনও। এর কিছুদিন পর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার থেকে সৃষ্ট জটিলতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এন. এস. এফ-এর প্রতিবাদী ছাত্র যুবকদের পক্ষেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ ধারাকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এ ধারার জন্য ভিন্ন নামে রাজনীতি শুরু করার জন্য তাদের ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

এন. এস. এফ-এর এই শেষ সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত দুটি কমিটি গঠিত হয়। একটি দুলন-ইব্রাহিম খলিল সমর্থিত আবু আলী চৌধুরী ও মাহারুল হান্নানকে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক করে, অন্যটি কাইউমপন্থী মুসলিম লীগ ও জমির আলী সমর্থিত মুসা হোসেন ও মাহাবুব সিদ্দিকীকে সভাপতি—সাধারণ সম্পাদক করে দুটি পৃথক কমিটি গঠিত হয়ে শেষ যাত্রা শুরু করে।৫২

১৯৭০ সালের একেবারে শেষ পর্যায়ে এন. এস. এফ আবার কাগজের শিরোনাম হয়ে আসে। এ সময় সমস্ত পূর্ব বাংলা ছিল আনন্দ--উদ্বেলিত আওয়ামী লীগের অসাধারণ বিজয় উল্লাসে। এসময় (২০ ডিসেম্বর)এন. এস. এফ নেতা ত্রাস সৃষ্টিকারী মাহাবুবুর রহমান খোকা নিহত হন। তাঁর লাশ পাওয়ায় যায় জিমখানা ক্লাব সন্নিকটস্থ রেসকোর্স ময়দানে। লাশে বুলেটের চিহ্ন ছিল। তিনি 'ডিকেডী আমলে' ঢাকা হলের ছাত্র এবং এন. এস. এফ কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রমনা থানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি ও হোটেলে নারী ধর্ষণের ৫টি মামলা ছিল।৫৩

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শগত বিরোধ

১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বের কোন্দল ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে চীনপন্থীর অনুসারী উপদল ছাত্র ইউনিয়ন,

৫১ সাক্ষাৎকার, মাহবুবুল হক দুলন
৫২ দৈনিক পাকিস্তান, পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৭০
৫৩ ঐ ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০

মেনন পন্থী বলে পরিচিতি লাভ করে। চীনের মাও সে তুং তখন সকল তারুণ্যের মীথ। ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ অংশকে মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা প্রবলভাবে নাড়া দেয়। শ্লোগানও তৈরী হয়, 'মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা, বিশ্বকে আজ দিচ্ছে নাড়া', অতিউৎসাহী চীনপন্থী কমিউনিষ্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী দেওয়ালে চিকা সেটে দেয়, 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদেরও চেয়ারম্যান'।

একই সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কতকগুলি প্রশ্নে এই উপদলে আবারও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এ মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের সূচনা করেন মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের মূল দল পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলায় এই সময়ে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে শ্রেণী শত্রু খতমের তীব্র সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে তার পক্ষে-বিপক্ষে দ্বন্দ্ব বেধে উঠে। স্বাভাবিকভাবে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পড়ে চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মেননে)।

মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার অনুসারী কমিউনিস্ট পার্টিতে তখন বিভিন্ন গ্রুপ বা উপদলের সৃষ্টি হয়ে গেছে। পার্টির মূল স্রোতধারার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক। জাতীয় মুক্তির পথ রণনীতি ও রণকৌশলের তাত্ত্বিক বিতর্কে তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করছিলেন এসময় আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহম্মদ ও দেবেন শিকদার। তত্ত্বগত বিরোধের কারণে শেষপর্যন্ত আলাউদিদ্দন আহমেদ ও দেবেন শিকদারকে মূলদল পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়। তাঁরা দু'জন ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্রোহ করে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। আবদুল মতিনের উপদলটি পার্টির মধ্যে আন্ত: মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতেন 'মেঘনা সংঘ' নামে। এদের বিভিন্ন উপদলীয় প্রচার মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নে ছিল।

কিন্তু মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন ছাত্রনেতারাও নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে গিয়ে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি করেন। এভাবে সিরাজ সিকদার, মাহবুবউল্লাহ, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ মিলে একটি ভিন্ন উপদলের জন্ম দেন।

অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন নেতা কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রণো, রাশেদ খান মেনন প্রমুখরাও উপরিউক্তদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আলাদা গ্রুপ করে চলতেন।

এছাড়া ভাসানী ন্যাপে একদল নেতা ছিলেন, যাঁরা নিজেদের চীনপন্থী বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন, কিন্তু চীনপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন না, এদেরও একটি ছাত্র গ্রুপ মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে কাজ করতো।

এসব শতধা গ্রুপ, উপদল, মতাদর্শ, তত্ত্ব ইত্যাদির কারণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস, আপোষকামিতার অভিযোগ, উগ্র-হঠকারী লাইনের হুমকি ইত্যাদি মিলে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এক মহাসংকটাপূর্ণ অবস্থার সন্মুখিন হয়। কজের চেয়ে সংগঠনে তত্ত্বের মারপ্যাচ,আন্দোলন সংগ্রামের চেয়ে সঠিক লাইন কি ভুল লাইন ইত্যাদি বিশ্লেষণে মেনন গ্রুপের অবস্থা নাস্তানাবুদ অবস্থায় বিকশিত হতে থাকে।

এমন অবস্থায় ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেনন গ্রুপের সম্মেলনে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। সম্মেলনে নতুন কমিটি গঠন প্রশ্নে এ মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এ মতদ্বৈধতা ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির যার যার রাজনৈতিক লাইনের উপর ভিত্তি করে। কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেনন তাঁদের রাজনৈতিক লাইনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অচিন্ত্য সেনকে অথবা হায়দার আকবর খান রনোর ভাই হায়দার আনোয়ার খান জুনোকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি পাশ করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা চারু মজুমদারের নকশালবাড়ী লাইনের বিরুদ্ধে ছিলেন বলে এপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের জঙ্গী কর্মীদের মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা ছিলনা।

চীনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের জঙ্গী কর্মীরা বরং এ বিষয়ে মাহবুবউল্লাহকে সমর্থন করেন। মাহবুবউল্লাহ উগ্র লাইনের সমর্থক কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হকের সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কেও একদল ছাত্রকর্মীর প্রশ্ন ছিল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে তিনি আইয়ুব খানের জনৈক মন্ত্রীর সাথে গোপনে নৌবিহারে গিয়েছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

পরবর্তীকালে জনাব মাহবুবউল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগের সত্যতা খানিকটা স্বীকার করেছিলেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, আইয়ুব খানের মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো একজন বামপন্থী ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি নৌবিহারে গিয়েছিলেন।[৫৪]

---

৫৪ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭

মাহবুবউল্লাহর সমর্থকরা কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের বিরুদ্ধে সংগঠনে ব্যক্তিগত আধিপত্যবাদ ও ব্যক্তিপূজাবাদ সৃষ্টির অভিযোগও এনেছিলেন। জাফর-মেনন-রনো উপদল চীনের সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কেও 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ আনা হয়।

অবশেষে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ ফর্মুলা বের করা হয়। জাফর-মেনন সমর্থকদের পক্ষ থেকে মোস্তফা জামাল হায়দার এবং তাদের বিরোধী সকল উপদলের পক্ষ থেকে মাহবুবউল্লাহ যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রাক্তন ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহ লিখেছেন, 'সম্মেলনে বিরোধী পক্ষের চক্রান্তের জালকে ছিন্ন করে আমার সমর্থকরা আমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করতে সমর্থ হন। বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এটাই ছিল কর্মীদের সফল বিদ্রোহ'।[৫৫]

কিন্তু এ আপোষ-ফর্মুলা শুধু কাগজে-কলমে কমিটি গঠন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকলো। মতাদর্শগত বিরোধ শুধু মনে মনেই থাকলো না, বহুদূর পর্যন্ত তা বিস্তৃত হতে থাকলো।

কারণ দেখা গেল, সংগঠনে বিভিন্ন মত ও পক্ষের লোকের সমাহার ঘটেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত সবাই মেনে চলছে না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা না থাকায় সংগঠনে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। শুধুমাত্র রুশ বিরোধিতার রোমান্টিকতায় অনেক সমাজতন্ত্র বিরোধী লোকজনও চীনপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নে ঢুকে পড়ে। এদের নিয়েও সংগঠন ও পার্টিতে আলাদা সমস্যা দেখা দেয়।

একদল দেশে শ্রমিক, কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্যজোট গঠন করার পক্ষে ছিলো। এ উপদলের দৃষ্টিতে তত্ত্বগতভাবে আইয়ুব খানই ছিলেন জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি। সুতরাং আইয়ুব খানকে সমর্থন তাঁরা তত্ত্বগতভাবেই করতে পেরেছিলেন। ফলেই চীনপন্থীদের নেতা মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের গোপন সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। মাওলানা ভাসানী ১৯৬৩ সালেই পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল ছাত্র আন্দোলন ও বিস্ফোরণন্মুখ পরিস্থিতির সময়ে আইয়ুব খানের সরকারী প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে চীন সফর করেন।[৫৬] ফলে ষাটের পুরোটো সময় জুড়ে ৬৯-এর

৫৫ বিচিত্রা, পূর্বোক্ত
৫৬ আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত চীনপন্থী রাজনৈতিক, ছাত্র, যুবকরা 'Don't disturb Ayub, নীতিতে অটল থাকে। কারণ এ সফরকালেই চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং, মাওলানা ভাসানীকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করার নির্দেশ দেন।[৫৭]

ভাসানীপন্থী ন্যাপ ও মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ৬দফা প্রশ্নে বরাবরই আতঙ্ক ও দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিব লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলন বর্জন করে ঢাকা বিমানবন্দরে 'বাঙালীর মুক্তির সনদ' ৬দফা ঘোষণা করলে হঠাৎ করেই মাওলানা ভাসানী ৬দফার বিকল্প বলে ১দফা সমাজতন্ত্রের প্রচার শুরু করেন। পরে ভাসানী ন্যাপ ৬দফার বিকল্প কর্মসূচী ১৪দফা খসড়া করলেও ন্যাপ বা তার সমর্থক মেননগ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন এর ব্যাপক প্রচার করেনি। তাদের সারাক্ষণই এই ভয় ছিল আওয়ামীলীগের পাশাপাশি তাদের আন্দোলনের ফলে যদি আইয়ুব সরকারের পতন হয় তাহলে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় এমন কোনো শক্তি ক্ষমতাসীন হবেন যারা পাকিস্তান-চীন বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করবে না।[৫৮]

ফলে একটা শঙ্কা ও এক প্রকার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ষাটের দশকে চীনপন্থী রাজনীতিকদের প্রভাবে এপন্থার ছাত্রদের দিন কেটেছে। এর সুযোগেই মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মাহবুববউল্লাহ আইয়ুবের মন্ত্রীর সঙ্গে নৌবিহারে যেতে সাহস পেয়েছিলেন। আবার আইয়ুবের এ মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো যখন মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে ঢাকায় এক সফরে আসেন তখন দল ও সংগঠনকে কিছু না জানিয়েই আনোয়ার জাহিদ ও কামরুন্নাহার লাইলীর নেতৃত্বে একদল (মেননপন্থী) ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বিমানবন্দরে ভুট্টোকে মাল্যভূষিত করেন।সংগঠনে এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একদল একে আইয়ুবের প্রতি মোহ বলেই ধরে নেয় এবং সংগঠনে সমালোচনার সূত্রপাত করে।

লণ্ডন প্রবাসী পাকিস্তানী ছাত্রনেতা তারিক আলীকে নিয়েও সংগঠনে মতবিরোধ ঘটে। তারিক আলী পাকিস্তানী রাজনীতিতে ট্রটস্কীপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন তারিক আলীর পাকিস্তানে আগমনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানে একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে থাকে। ১২ মার্চ তারিক আলী পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ছাত্র ইউনিয়ন

---

৫৭ তারিক আলী, *Pakistan: Military Role or Peoples Power* (Delhi,Vikas publication,1970) P. 140
৫৮ মাহবুবউল্লাহ, *'ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি'* পূর্বোক্ত

(মেনন)-এর একটি উপদল তারিক আলীকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে বিমান বন্দরে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু এ প্রশ্নে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-ই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সংগঠনের নির্দেশ অমান্য করে একদল ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) কর্মী বিমান বন্দরে তারিক আলীকে স্বাগত জানায় এবং পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় তাঁকে সংবর্ধনা দেয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কিছু নেতার এ ধরণের শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ড প্রবল সমালোচনার সম্মুখিন হয়। সমালোচিত গ্রুপের নেতা মাহাবুবউল্লাহ এ সভাতেই তাদের সংগঠনের নাম পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) পরিবর্তন করে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সংগঠনে এ নিয়েও তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং মতবিরোধ দেখা দেয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, এ বিষয়ে পরবর্তী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। অনেকে মাহবুবউল্লার প্রস্তাবকে হঠকারী বলে সমালোচনা করে।[৫৯]

মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের পরবর্তী সম্মেলন ঐক্যবদ্ধভাবে আর শেষ হতে পারে নি। কারণ সংগঠনে তখন নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস, হতাশা ক্রমেই বাড়তে থাকে। নেতৃত্বকে অস্বীকার করে, সংগঠনকে এড়িয়ে, ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীমতে যার যেমন ইচ্ছা, তেমন চলতে থাকায় সকল শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে একদল নিজেদের অধিক বিপ্লবী চিন্তার ধারক ও বাহক মনে করতে থাকায় বিভক্তি নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গের সত্যতার স্বীকৃতি মিলে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা মাহবুবউল্লাহর স্মৃতিচারণে। তিনি বলেন, 'এদিকে গণচীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হল। চেয়ারম্যান মাও হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগার আহবান জানালেন। আমরাও মনে করলাম, রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগার প্রয়োজনীয়তা আছে অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে হবে'।[৬০]

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের মধ্যে তত্ত্বগত চিন্তার আরো প্রসার ঘটে। ফলে ৬৯ সালের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক ভাঙনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মধুর কেন্টিনে একটি বিদ্রোহী

৫৯ সাক্ষাৎকার ঃ মাহফুজউল্লাহ
৬০ মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মঞ্জুর মোর্শেদ। ঢাকা শহর ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর এক অংশের এ কর্মী সভায় বক্তৃতা করেন দিলীপ বড়ুয়া, পিনাকী দাস, লীলা সাহা, মজিবুল হক। তাঁরা মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃত্বের বিভেদমূলক কার্যকলাপের নিন্দা করেন। বক্তারা বলেন, নেতৃত্বদানকারী মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহাবুবউল্লাহ উভয়ই প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের মুখোশধারী বুর্জোয়া শ্রেণীর সুচতুর সমর্থক। বিদ্রোহীরা নেতৃত্বকে ট্রটস্কীবাদী ও সুবিধাবাদী, নয়া সংশোধনবাদী বলেও অভিহিত করেন।[৬১]

ভাঙনের মুখোমুখি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সংসদের সভা আহ্বান করা হয়। এটি ছিল একটি জরুরীসভা। সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার দাবী করেন মোট ২৩ জন সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু জামাল হায়দার বিরোধী গ্রুপ থেকে এ সভার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। বৈধতা প্রস্তাবটি তুলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রফিকুল হাসান জিন্নাহ। কিন্তু উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে তা নাকচ হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পিনাকী দাস, মঞ্জুর মোরশেদ, মজিবুল হক সিনহা, একরামুজ্জামান, সৈয়দ লুৎফর রহমান ও রফিকুল হাসান প্রমূখ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

পরে জামাল হায়দার গ্রুপের সদস্যরা এদের বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিরোধী গ্রুপের ৮জন সদস্য এর আগে সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অবমাননা করে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দেয়, জামাল হায়দার গ্রুপ তাকে বিভেদমূলক বলে অভিহিত করেন। বলা হয়, এ বিবৃতি সংগঠনে গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে এবং সংগঠনকে ভাঙনের মুখে ফেলে দিয়েছে। এ বিবৃতি শৃঙ্খলা বিরোধী। নিন্দা প্রস্তাবে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিবৃতি দানকারীদের তাদের বিবৃতি প্রত্যাহার করে ভুল স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আসন্ন কাউন্সিলে বহিস্কারের প্রস্তাব তোলা হবে।[৬২]

সংগঠনে বিভিন্ন মতাদর্শ ও নেতৃত্বের বেড়াজালে, বিশেষকরে চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ভাসানী ন্যাপের বিভিন্ন গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপে কাজ করতে থাকায় এ সংগঠনটি তত্ত্ব-দ্বন্দ্বের তর্ক-বির্তকে ও ষড়যন্ত্রের তৎপরতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল (১৯৭০) এবং

---

৬১ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা মার্চ ১৯৭০
৬২ ঐ

পয়লা মে আলাদা আলাদা দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২৩ ও ২৪ এপ্রিলের সম্মেলন ডাকে মাহাবুবউল্লাহ গ্রুপ এবং পয়লা মে'র সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে মোস্তফা জামাল হায়দার গ্রুপ। মাহাবুবউল্লাহ গ্রুপের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে চীনপন্থী কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা এবং জামাল হায়দার গ্রুপের প্রতি কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রণো। দিলীপ বড়ুয়া নেতৃত্বাধীন ছাত্র অংশটি উপরিউক্ত দুই সম্মেলনেই তাদের কর্মী সমর্থকদের অংশ নিতে বারণ করে দেয়। চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে তাদের সমর্থক ছিল নগেন সরকার, আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের একাদশ প্রাদেশিক সম্মেলন ২৩ ও ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। দেবেন শিকদারের মতো সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দেবেন শিকদার ও মাহাবুবউল্লাহ দু'জনই তখন জেলে ছিলেন। এস.এম. হলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মাহাবুবউল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক নান্নু। মাহবুবউল্লাহ জেলে থাকায় নূর মোহাম্মদ খান কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বপান।

সহসভাপতি: শামসুজ্জোহা মানিক, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক: আব্দুল্লাহ হারুন তায়ফুর।

মোস্তফা জামাল হায়দার ২৮ এপ্রিল এক বিবৃতিতে এ সম্মেলনকে গঠনতন্ত্র বিরোধী বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এর সাথে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, পয়লা মে (১৯৭০) ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সম্মেলন সলিমুল্লাহ হলের শহীদ পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু গোলযোগের আশঙ্কায় পরে সলিমুল্লাহ হল থেকে সম্মেলন স্থান ইকবাল হলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন ভাঙার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাশেদ খান মেনন, তিনি ১৯৭০ সালে এসে আবার তাঁর খণ্ডিত অংশের দ্বিধাবিভক্তিকে সম্পন্ন করতে এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। মোস্তাফা জামাল হায়দার, সংগঠন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও বলেন, এ সম্মেলনের ডাক ঐক্যের ডাক। তিনি বলেন, এদেশের আমলা মুৎসুদ্দী, সামন্তবাদ ও বৃহৎপুঁজি উৎখাত করে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠবেই। ছাত্র ইউনিয়ন একাজে রেডগার্ডের মতোই ভূমিকা পালন করবে।[৬৩]

---

৬৩ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা মে ১৯৭০

সম্মেলনে হায়দার আনোয়ার খান জুনোকে সভাপতি ও আতিকুর রহমান সালুকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সংগঠনের নাম মাহাবুউল্লাহ গ্রুপের মতোই পাল্টিয়ে ফেলা হয়। মাহাবুবউল্লাহ তাদের গ্রুপের নাম রেখেছিলেন পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন। মোস্তফা জামাল হায়দার গ্রুপ তাদের নাম রাখেন পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন। দিলীপ বড়ুয়া গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (বড়ুয়া) নামেই কাজ চালাতে থাকে।

মোস্তফা জামাল হায়দারের সম্মেলনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে দলে প্রবল বির্তক উপস্থাপিত হয়। ইতোমধ্যেই মাহবুবউল্লাহ গ্রুপ নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল। নির্বাচন বয়কট করার মধ্যে চীনপন্থী রাজনীতিকরা তখন 'বিপ্লবীপনা' খুঁজে পেতেন। জাতীয় নির্বাচনেও ভাসানী ন্যাপ ও চীনপন্থী কমিউনিস্টরা র্বজনের হুমকি দিয়েছিলেন। তারা শ্লোগান শুরু করে 'ভোটের আগে ভাত চাই'। তার পরেও জনগণের ঢল নেমেছিল নির্বাচনের দিকে। ফলে সত্তর দশকে ঢাকার দেওয়ালে চিকা উঠেছিল 'জনগণ..., তোরা কর নির্বাচন, আমরা গেলাম সুন্দরবন'।

সুতরাং নেতৃত্বের একটি বড় অংশ নির্বাচনের পক্ষে থাকলেও কর্মীদের 'সেন্টিমেন্ট' ও মাহবুবউল্লাহ গ্রুপের বিপ্লবীপনার সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য এই গ্রুপের সম্মেলনেও নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে ডাকসুর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে চীনপন্থী অনুসরণকারী ছাত্র ইউনিয়ন অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। অথচ এ গ্রুপের জন্মদাতা রাশেদ খান মেনন ষাটদশকে (১৯৬৩-৬৪ সালে) ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়ন নিয়ে ডাকসুর সহসভাপতি হয়েছিলেন।

পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ১০ থেকে ১৬ জুলাই জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করে। ১৬জুলাই সমাপ্তি দিবসে বায়তুল মোকাররমে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।[৬৪]

এরই মধ্যে আবার পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নে আরেকবার ভাঙনের সৃস্টি হয়। উল্লেখ্য, অল্প কয়েকদিন পূর্বে মাত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপ ভেঙে মাহাবুবউল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল।

৬৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ জুলাই ১৯৭০

পয়লা আগস্ট পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা শহর শাখার কার্যকরী সংসদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মহসীন হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও পদার্থ বিজ্ঞানের অনার্স পরীক্ষার্থী মাহফুজউল্লাকে দুর্নীতি ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিস্কার করা হয়। তিনি এই সংগঠনের জন্মদাতা মাহবুবউল্লাহর ছোটভাই ছিলেন।

ঢাকা শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলুহক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তাঁর বহিস্কার আদেশ চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদে সুপারিশপত্র পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, মাহফুজউল্লাহর সাথে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।[৬৫]

উল্লেখ্য, পয়লা আগস্ট থেকেই খুলনায় শুরু হয় পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের প্রাদেশিক কর্মী সম্মেলন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই এই বহিস্কার ও দল ভাঙাভাঙি পুনরায় শুরু হয়।

ছাত্রনেতা মাহফুজউল্লাহ জানান, 'কোন দুর্নীতির অভিযোগ নয়, প্রকৃতপক্ষে সংগঠনে বিভিন্ন মতাদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করেই তাঁকে বহিস্কার করা হয়। এক দল গণসংগঠন না করার পক্ষে রায় দেয়। আমি গণসংগঠন করার পক্ষে ছিলাম'।[৬৫ক]

এই সময় রিয়াজুল করিম নামে একজন রাজনৈতিক ছাত্রকর্মী গ্রেফতার হয়। পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি নূর মোহাম্মদ খানের সভাপতিত্বে ৮ আগস্ট মধুর রেস্তোরায় এক প্রতিবাদ সভায় তাঁকে তাঁদের সংগঠনের কর্মী বলে দাবী করা হয়। সভায় অন্যান্যর মধ্যে রিয়াজুল করিমের মুক্তি দাবীতে বক্তৃতা করেন মিলু হক, শফিকুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল হারুন তাইফুর, মাহাবুব মাওলা ও আকমল হোসেন।[৬৬]

অন্যদিকে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের এক বিজ্ঞপ্তিতে রিয়াজুল করিমকে তাদের সংগঠনের কর্মী দাবী করে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন বটতলায় প্যালেষ্টাইনী মহিলা গেরিলা নেতা লায়লা খালেদসহ সকল কমাণ্ডোর মুক্তির দাবীতে বটতলায় এক ছাত্রসভা করে।[৬৭]

---

৬৫ দৈনিক পাকিস্তান, পয়লা আগস্ট ১৯৭০

৬৫ক সাক্ষাৎকারঃ মাহফুজউল্লাহ

৬৬ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৭০

৬৭ ঐ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া): আন্ত:মতাদর্শগত লড়াই

১৯৬৫ সালে নেতৃত্ব ও আদর্শগত দ্বন্দ্বে ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পিকিং বিরোধী মস্কোর সমর্থক ছাত্র ইউনিয়ন, মতিয়াপন্থী নামেই অভিহিত হতে থাকে। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন জঙ্গীরূপ নেওয়ার আগেই এ সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হায়োছিল ২২ জানুয়ারী, ১৯৬৯। এ সময় সংগঠনের সভাপতি সাইফউদ্দীন মানিক ও মেনন গ্রুপের নেতা মাহবুবউল্লাহর বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সাল থেকেই হুলিয়া জারী থাকায় তাঁরা দু'জনেই পলাতক ছিলেন। দু'জনই তাঁদের সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ জানুয়ারী 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড', অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ দু'জনই গোপন অবস্থায় থাকায় আন্দোলন কর্মসূচীর তারিখ ইত্যাদি নিয়ে সংকট দেখা দিচ্ছিল।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সম্মেলন ২২ জানুয়ারী থাকায় এ দল বৃহত্তর কর্মসূচী দেওয়ার ক্ষেত্রে ২২ তারিখের পরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। অন্য দিকে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত বসে থাকার পক্ষে ছিল না। ফলে এ দু'দলের মধ্যে সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ২০ জানুয়ারী ছাত্রদের এক বড় শোভাযাত্রা সচিবালয় চত্বর অতিক্রম করতে থাকলে অকস্মাৎ পুলিশ গুলি চালালে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হলে আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। ছাত্র জনতা গর্জন করে উঠে সারা দেশময় এবং ২৪ জানুয়ারী ঘটে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান।

এমতাবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সম্মেলন বাতিল করা হয়েছিল এবং নতুন করে পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয় দোসরা জুলাই ১৯৬৯।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরপরই সব কয়টি ছাত্র সংগঠনেরই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবং প্রতেকটি ছাত্র সংগঠনই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক গ্রুপে বিভিন্ন কারণে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)। তবে এ সংগঠনেও আন্ত: মতাদর্শগত বিরোধ ছিল। কিন্তু এতে কখনোই সংগঠন ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় নি।

দোসরা জুলাই কবি সুফিয়া কামাল এ সম্মেলন উদ্বোধন করে বলেন, জন্মের ঐতিহ্য অনুযায়ীই ছাত্র ইউনিয়ন যেন বিশ্বশান্তির সংগ্রামে বিশ্বের সাথেই তাল

মিলিয়ে এগিয়ে যায়। তিনি বলেন, ছাত্র সমাজের সাহসিকতা ও উদারতায় দেশের প্রগতির পথ যেন জ্যোতির্ময় ও ভাস্বর হয়ে উঠে।[৬৮]

সম্মেলনে সামসুদ্দোহাকে সভাপতি ও নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন:

সহসভাপতি	:	ফয়জুল আকবর, কাজী মমতা হেনা, ইমাদুল হক, আজিজুর রহমান, শাহজাহান খান, খোরশেদুল ইসলাম
সহসাধারণ সম্পাদক	:	মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মুকুল চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	শওকত চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ	:	শেখর দত্ত
প্রচার সম্পাদক	:	কামালউদ্দিন আহমেদ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	আসাদুজ্জামান নূর
দপ্তর সম্পাদক	:	রানা চৌধুরী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	জিল্লুর মোর্শেদ মিঠু (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ)।

সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:

১ শিক্ষাবিদ ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা
২ শিক্ষানীতি হবে ১১ দফাকে ভিত্তি করে
৩ পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, চেতনা এ শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হবে
৪ জগন্নাথ কলেজ সহ যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ (সরকারী) করা হয়েছে অবিলম্বে তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।
৫ গত এক দশকে স্কুলে ছাত্র বেতন ১৫০ ভাগ বেড়েছে। কলেজ ছাত্র বেতন ১০ টাকা থেকে ২০ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রাবাসে খাওয়ার খরচ ৩৫ টাকা থেকে ৫০-৬০ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাবে শিক্ষাকে সহজ লভ্য করার জন্য ছাত্র বেতন হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি দূর করার দাবী জানানো হয়
৬ পূর্ব পাকিস্তানে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে

---

৬৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ জুলাই ১৯৬৯

৭ ভিয়েতনামে মার্কিন হামলা ও হত্যাযজ্ঞ বর্বরোচিত এবং এর নিন্দার ভাষা ছাত্র সমাজের নেই

৮ মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য যুব সম্মেলনের সফলতা কামনা, ইত্যাদি।[৬৯]

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের অক্টোবর, বুধবার। এ সম্মেলনও উদ্বোধন করেন কবি সুফিয়া কামাল। দু'দিন ব্যাপী এই প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মহসিন হল মাঠে।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে প্রগতিশীল ছাত্রদের মস্কোপন্থী ও নকসাল পন্থী গ্রুপ করে শক্তির অপচয় না করার আহবান জানান। তিনি বলেন, প্রগতিশীল ছাত্রদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে গ্রামের দিকে।

পরে এক সুবিশাল, সুসজ্জিত র‍্যালী শহরের রাজপথ প্রদক্ষিণ করে, সন্ধ্যায় দেশাত্মবোধক গানের আসর ও নাটক মঞ্চস্থ হয়।

দ্বিতীয় দিবসে কাউন্সিল অধিবেশনে বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলামকে নতুন সভাপতি এবং বিদায়ী সহসাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৭০]

এই কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন:

সহসভাপতি	:	আবুল হাসনাত, আয়শা খানম, মাহবুবল হক
সহসাধারণ সম্পাদক	:	আবুল কাশেম, রীনা খান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	নূহ উল আলম লেনিন
কোষাধ্যক্ষ	:	আব্দুল কাইউম মুকুল
দপ্তর সম্পাদক	:	আইউব আলী
প্রচার সম্পাদক	:	আ. ক. ম. জাহাঙ্গির
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	নাজমুল আহসান মন্টু (তিনি ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পাদক)

৬৯ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জুলাই ১৯৬৯
৭০ ঐ ২৯, ৩০ অক্টোবর ১৯৭০

ডমিনিক ক্যাম্পেট
স্বত্বাধিকারী
আত্ম মুক্তি পাঠাগার
নোয়াখালী।

২৮,২৯ অক্টোবরের সম্মেলনে কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম একটি দীর্ঘ কার্যবিবরণী প্রতিবেদন পেশ করেন। এতে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও ছাত্র অন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া প্রতিবেদনটি ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে অন্যান্যদের মতাদর্শগত সংগ্রামকেও তুলে ধরায় ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকের কৌতূহলের জন্য এ থেকে কতক অংশ উদ্ধৃত করা হোল, কারণ এই সময়ের ছাত্র সংঠনগুলির কোন রাজনৈতিক রিপোর্ট বা অন্য কোন দলিল খুব সূলভ নয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়:

'জনগণের অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে কোনঠাসা করে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন তথা ১১ দফা দাবী আদায়ের সুযোগ এবং কর্তব্য গণতান্ত্রিক মহলের সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক মহলের কোন কোন অংশের দোদুল্যমানতা, আপোষমুখীতা ও বিভেদনীতির ফলে এই কর্তব্য সমাধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না। ছাত্র সংগঠনগুলি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে।

বিগত ১১দফা আন্দোলনের দুর্বলতার একটি যথাযথ মূল্যায়ন করে প্রতিবেদনে বলা হয়:

'এগার দফা কর্মসূচীতে একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও কৃষকদের কয়েকটি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দাবীও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত গণঅভ্যুত্থান মূলত: গড়ে উঠেছে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে।

নূর খান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়:

'প্রতিক্রিয়াশীল জামাতে ইসলামীর লেজুড় ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রথম থেকেই এই প্রতিক্রিয়াশীল রির্পোটের পক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু করে এবং উহা অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবী করতে থাকে। ফলে এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রথমদিকে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।···· আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে 'নূর খানের শিক্ষানীতি ও ছাত্র সমাজের অভিমত' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করে

প্রদেশব্যাপী বিলি করা হয়। সর্বদলীয় ভাবে ১২ আগস্ট ডাকসুর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে ইসলামী ছাত্র সংঘের গুণ্ডারা সশস্ত্র হামলা চালায়।....

এই পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন এবং সামরিক আইনে মামলা, ই. পি. আর মিলিটারী বাহিনী দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় দখল, হল-হোস্টেলে প্রবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এই সময় ইসলামী ছাত্রসংঘের সুপরিকল্পিত প্রচার ও হামলার মুখে ছাত্রলীগ ভীত হয়ে পড়ে এবং তাদের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার শিকারে পরিণত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অসাম্প্রদায়িক করার জন্য ধর্ম-শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখার পূর্বোল্লিখিত দাবী তারা প্রত্যাহার করে নেয়।'

বাঙালী-বিহারী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বরূপ উন্মোচন করে প্রতিবেদনে বলা হয়:

'১৯৬৯-এর নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঢাকা শহরে বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং প্রদেশের দুই একটি স্থানে তা ছড়িয়ে পড়ে।... আমরা অত্যন্ত তৎপরতার সাথে দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে ঝাপিয়ে পড়ি।... অন্যদিকে জনগণ তার মূল শত্রু সম্পর্কে চেতনা হারিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানির আত্মঘাতী পথে অগ্রসর হতে থাকে।... প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মহলের পক্ষ থেকেও দাঙ্গা প্রতিরোধের ব্যাপারে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করা হয়। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে এগিয়ে আসে নাই... তারা কয়েকটি স্থানে আমাদের দাঙ্গা বিরোধী প্রচারে বাধা দান করে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় নিমজ্জিত করার চেষ্টা চালায়।

ইয়াহিয়ার নির্বাচন সম্পর্কিত ঘোষণা পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়:
'ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণে জনগণের কয়েকটি দাবী স্বীকৃতি লাভ করে।... কিন্তু দেশবাসী যে আশা নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি করেছিলেন তা পূরণ হয়নি।... এই মতামতের ভিত্তিতে ছাত্রলীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে আমরা একটি বিবৃতি প্রকাশ করি। ছাত্রলীগের সাথে স্বাক্ষরিত যুক্ত বিবৃতি লিফলেট আকারে ছাপিয়ে আমরা সারা প্রদেশে বিলি করি। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ায় ছাত্রলীগের আপোষমুখী চিন্তাধারা বৃদ্ধি পেতে থাকে।... ছাত্র ঐক্যে ফাটল ধরতে শুরু করে'।

পয়লা জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হওয়া সম্পর্কে প্রতিবেদন উল্লেখ করে:

'পয়লা জানুয়ারী হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সীমিত অধিকার স্বীকৃত হলে দেশব্যাপী রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়।... আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ হতে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, ছাত্র ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, নির্যাতন বন্ধ এবং ১১ দফা ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যের দাবীতে ১লা জানুয়ারী 'দাবী দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১লা জানুয়ারী আমাদের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ও এন. এস. এফ-এর সাথে মিলিতভাবে সভা ও শোভাযাত্রার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।... কিন্তু ১লা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তাদের মত পরিবর্তন করে... ফলে ঐক্য ভেঙ্গে যায়।... তাই ১লা জানুয়ারী দুইটি পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়।...

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সেদিন আসন্ন নির্বাচনে ১১ দফা ভিত্তিতে গণবিরোধী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সমূহের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের প্রশ্নে বিরোধীতা করে। নির্বাচনকে সংগ্রামের অংশ হিসেবে না দেখে শুধু মাত্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখে এবং 'নির্বাচন ঐক্য নয়-সংগ্রামী ঐক্য', 'রাজনৈতিক দলের ঐক্য নয়-জনতার ঐক্য' প্রভৃতি বক্তব্য হাজির করে'।

১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়:

'১১ দফা সপ্তাহ ও গণঅভ্যুত্থান দিবসকে ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের জন্য আমরা প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। কিন্তু ছাত্রলীগ ও স্বতন্ত্র কমিটি (স্বতন্ত্র কমিটি বলতে এখানে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের বিভিন্ন উপদলকে বোঝানো হয়েছে-লেখক) আমাদের সে ডাকে সাড়া না দিয়ে যার যার দলীয় কর্মসূচী ঘোষণা করে। স্বতন্ত্র কমিটি নির্বাচন প্রভৃতি প্রশ্নে, আমাদের সাথে একমত না-এই অজুহাতে এই মহান দিনগুলোকে যৌথভাবে পালনের পথরুদ্ধ করে দেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালনে অবশেষে ঐক্য হয়, কিন্তু:

'শহীদ দিবস পালনের ব্যাপারে ছাত্রলীগের অনমনীয় মনোভাবের দরুণ অন্যান্য সংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়নের উগ্র ও হঠকারী রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ ও নির্বাচন বিরোধী মনেভাবের ফলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শহীদ দিবস পালনে এগিয়ে আসে নাই।' ...

'শহীদ দিবসে আমাদের ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেদিন একটি প্লাটফরম হতে দুটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য

জনগণের সামনে হাজির হয়। ছাত্রলীগ সেদিন ঐক্যের প্রশ্নে তাদের পুরনো বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে।... সামরিক আইন প্রত্যাহর ও রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি প্রশ্নে সংগ্রামী ঐক্য গড়ার জন্য আমরা ছাত্রলীগের প্রতি সরাসরি আহবান জানাই।... এতে ছাত্রলীগ নেতৃত্ব ক্ষিপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে আমাদের সাথে কোন প্রকার ঐক্য নয় এই মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে'।

প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে বলা হয়:
'বন্যার্ত মানবতার হাহাকারের মুখেও ছাত্রলীগ তার বিভেদনীতি অনুসরণ করতে থাকে।... আমরা বাংলা ছাত্রলীগ ও পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্তভাবে ৮ আগষ্ট সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রদেশব্যাপী 'দাবী দিবস' পালন করি'।

স্কুল ছাত্রদের 'পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলনে বিভেদ সম্পর্কে বলা হয়ঃ
'বিগত বছর সরকার নবম ও দশম শ্রেণীর স্কুলের ছাত্রদের উপর 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বই চাপিয়ে দেয়।... অতিরিক্ত পাঠ্য পুস্তক চাপিয়ে দেয়ার ফলে প্রথম থেকেই স্কুলের ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ ছিল এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে... বিচ্ছিন্নভাবে স্বত:স্ফূর্ত সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। এর ফলে এই বইয়ের একটি অংশ সরকার তুলে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্কুলের ছাত্ররা তখনও সম্পূর্ণ বই বাতিলের দাবীতে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাতে থাকে।... ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে স্কুল ছাত্রদের প্রতি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দেন।... এই পরিস্থিতিতে প্রদেশব্যাপী স্কুল ছাত্রদের সংগ্রামকে শক্তিশালী ও সংগঠিত করার জন্য আমরা ঢাকা শহরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েত করি এবং স্কুল ছাত্রদের একটি শক্তিশালী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।... আন্দোলন অগ্রসর হওয়ার মুখে ছাত্রলীগ তার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কিন্তু তারা সুকৌশলে বিভেদের পথ গ্রহণ করে এবং একটি পাল্টা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। স্কুল ছাত্রদের সংগ্রামে ফাটল সৃষ্টি হয়'।

ইয়াহিয়ার নির্বাচন সম্পর্কিত আইনগত কাঠামোর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন কেন দানা বাঁধতে পারেনি—এ সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়:

'বিগত মার্চ মাসের ২৮ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান... একটি আইনগত কাঠামো ঘোষণা করেন।... পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সাধারণভাবে আইনগত কাঠামো আদেশের বিরোধীতা করলেও, ... আন্দোলন করলে ইয়াহিয়া নির্বাচন দিবেনা এই ভয়ে তারা আন্দোলনের পথকে পরিহার করে।

স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন বর্জনের হঠকারী নীতি গ্রহণ করায় ইয়াহিয়ার ঘোষণা তথা আইনগত কাঠামোর আদেশ সম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ইয়াহিয়ার ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে।...

দৈনিক সংবাদ ও ২/১টি সাপ্তাহিক ছাড়া প্রায় সব পত্রিকা আইনগত কাঠামো আদেশকে অভিনন্দন জানায়। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার বলে কথিত 'দৈনিক ইত্তেফাক'ও এই ঘোষণাকে পরোক্ষভাবে অভিনন্দিত করে'।[৭১]

ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলামের সুদীর্ঘ এ প্রতিবেদনে শুধুমাত্র ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা গেলেও এই সময়কার ছাত্র আন্দোলনের আন্তঃসমস্যার কতকগুলি দিক ইতিহাস পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হয়। (যদি অন্যান্য সংগঠনেরেও এ সম্পর্কিত দলিলসমূহ পাওয়া যেত তাহলে হয়তো ইতিহাস পাঠক একটা সঠিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ্য হতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলিল সংরক্ষণের সেই ব্যবস্থা নেই)।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনত কাঠামে আদেশ জারী করলে প্রাক্তন মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন উপদলের 'নির্বাচন বর্জনে'র শ্লোগানের প্রভাব ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) গ্রুপেও পড়ে। সংগঠনের একটি অংশ নির্বাচন বর্জনের পক্ষে কথা তোলার আহ্বান জানাতে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি সংগঠনের এ অংশের সাথে একমত হয় নি। এ সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র ১৯৭০ সালে অক্টোবরের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে বলেন,

'নির্বাচন বয়কটের আওয়াজ তোলা সঠিক বিবেচনা করা যায় সংগ্রামের চরম পর্যায়ে। কিন্তু বর্তমানে আইনগত কাঠামো আদেশ বিরোধী আন্দোলনই যখন দুর্বল তখন বয়কটের শ্লোগান তোলা আমাদের মতে হঠকারী কাজ।... বয়কটের আওয়াজ না তোলার অর্থ আইনগত কাঠামো আদেশকে মেনে নেয়া নয়, বরং ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য দুইমুখী লড়াইয়ে প্রস্তুত হওয়া। দুইমুখী লড়াইয়ের অর্থ পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে যুগপৎভাবে লড়াই করা'।[৭২]

৭১ নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ২৮, ২৯, অক্টোবর ১৯৭০ (লেখকের কাছে এক কপি সংরক্ষিত)

৭২ নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০-৩১

এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একদল নেতৃস্থানীয় জেলা পর্যায়ের কর্মী একটি মত আনে যে, সংগঠনের মূল মূল সিদ্ধান্তগুলো কেন্দ্রীয় কমিটিতে গ্রহণ না করে প্রথমে কর্মীদের মত নেওয়া দরকার এবং কর্মীদের সংখ্যাধিক্যের মতকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা দরকার।

১৯৬৪ সালে অবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন নেতা হায়দার আকবর খান রণো এ ধরনের একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। কিন্তু সেদিনও এ প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিতে নাকচ হয়ে গিয়েছিল।

এবারের দাবী সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় কমিটি অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে তা নাকচ করে দেয়। এ সম্পর্কেও ১৯৭০ সালের অক্টোবর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,

'এভাবে প্রদেশের সকল কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা অবাস্তব ও অসম্ভব কাজ। দ্বিতীয়ত তা যদি সম্ভবও হয়, তবু তা করতে যে সময় ব্যয় হবে তাতে করে হয়তো উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা হলো এই যে, কর্মীদের মাধ্যমেই যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে—তবে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের সার্থকতা কি? অনেক সময়েই অনেক বিষয় আসে যা কর্মীদের ব্যাপক জমায়েতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।... কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিকেই যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না দেওয়া হয় তবে সংগঠন চলবে কি করে? সেক্ষেত্রে সংগঠনে নৈরাজ্যবাদ কায়েম হবে। কাজেই কর্মীদের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী আমরা গ্রহণ করতে পারিনি'।[৭৩]

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মণি সিংহ নেতৃত্বাধীন) মধ্যে একটি ছোট গ্রুপ নাসিম আলী-শুভ রহমানের নেতৃত্বে হাতিয়ার গ্রুপ নামে কাজ করছিল। তাদের সাথে পার্টিতে '৬৯-এর পর থেকে আন্তঃমতাদর্শগত লড়াই চলছিল। এ মতাদর্শগত বিরোধের ছাপ ছাত্র ইউনিয়নেও খানিকটা পড়ে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (আনিসুর রহমান, জগন্নাথ কলেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক) হাতিয়ার গ্রুপের সাথে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে অবস্থিত ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রকাশিত একটি ইশতেহারে স্বাক্ষর করেছিলেন। ইশতেহারের মূল

৭৩ নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬

বক্তব্য ছিল,- ১১ দফাকে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়নসহ সকলেই জলাঞ্জলি দিয়েছে।

'কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত ভিন্নমতাবলম্বী এই সদস্য কে বহিষ্কার করে।

এ সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনে বলা হয়:
কেন্দ্রীয় কমিটি' মনে করে যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কেন— ছাত্র ইউনিয়নের একজন সাধারণ সদস্যেরও উচিত হবে না সংগঠনের মধ্যে থেকে এরকম অসত্য প্রচার করা যে, ছাত্র ইউনিয়ন ১১ দফাকে পরিত্যাগ করেছে। এই বিবেচনা থেকেই এই সভ্যটিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে'।[৭৪]

ইসলামী ছাত্রসংঘ

পাকিস্তানের ছাত্র রাজনীতিতে ইসলামী ছাত্রসংঘ ছিল একমাত্র সংগঠন যার সর্ব পাকিস্তান ব্যাপী অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান, এই উভয় প্রদেশেই সংগঠনের শাখা বিস্তৃত ছিল। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সাথে জড়িত ছিল এই ছাত্র সংগঠনটি।

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১১ দফা দাবীনামা পেশ করলে ছাত্র সংঘ পাল্টা ৮ দফা দাবী নামা প্রচার করে। ফলে এরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে যুক্ত হতে পারে নি। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়টি ছাত্র সংগঠন 'পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি' গ্রন্থ বাতিলের আন্দোলন শুরু করলে ইসলামী ছাত্রসংঘ তার বিরোধিতা করে পাল্টা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে।

এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইসলামী ছাত্রসংঘ এদেশের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিপন্থী এই দুই ধারার বিরুদ্ধেই যুগপৎ আন্দোলন করেছে। ১৯৭১ সালে ছাত্র সংঘ মুক্তিযুদ্ধের শুধু বিরোধিতা করেনি, তারা মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পাল্টা সশস্ত্র বাহিনী (প্রথমে রেজাকার বাহিনী এবং পরে আল বদর বাহিনী) গঠন করে। স্বাধীনতার পর ইসলামী ছাত্রসংঘ, ইসলামী ছাত্র শিবির নাম ধারণ করে।[৭৪ক]

---

৭৪ নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
৭৪ক (ইসলামী ছাত্র সংঘের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন)।

১৯৭০ সালের ২৩ মার্চ ইসলামী ছাত্রসংঘ, ইসলামী শাসনতন্ত্র দিবস পালন করে। এ দিবস পালনে ছাত্রসংঘ গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৬৯ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনে মতিউর রহমান নিজামী সভাপতি এবং আজিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের সম্মেলনে মতিউর রহমান নিজামী পুনরায় সভাপতি ও নূরুল ইসলাম নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০-৭১ সালের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হন আলী আহসান মুজাহিদ।

১৯৭০ সালে নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সম্মেলনে মতিউর রহমান নিজামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ইসলামী ছাত্র সংঘের ইতিহাসে এই প্রথম একজন পূর্ব পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হলেন।[৭৫]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ছাত্রসংঘে এ নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সংগঠনের একটি অংশ পাকিস্তান সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের আপোষের পক্ষে ছিল। কিন্তু অধিকাংশ, বিশেষ করে ছাত্রসংঘের হাইকমাণ্ড (যারা আল বদর বাহিনী গঠন করেছিল এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার নেতৃত্ব দিয়েছিল) তা নাকচ করে দেয়। তারা অস্ত্র দিয়েই মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সমর্থকদের মোকাবেলার যুক্তি তুলে ধরে।

ছাত্র সংঘের এক শ্রেণীর উগ্র নেতৃবৃন্দের এই হঠকারী সিদ্ধান্ত ছাত্রসংঘের রাজনীতির জন্য পরবর্তীকালে বহু দুঃখ ও প্রশ্ন বয়ে আনে।

বিবিধ ছাত্র সংগঠন

তৎকালীন পাকিস্তানের কয়েকটি প্রধান ছাত্র সংগঠন ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু ছাত্র সংগঠনের অনিয়মিত তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এদের তৎকালীন সমাজে রাজনৈতিক ভূমিকা না থাকলেও ইতিহাসের তথ্যগত মূল্য রয়েছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি সংগঠনের নাম ও তাদের তৎপরতার খবর উদ্ধৃত করা হল:

---

৭৫ সাক্ষাৎকার : মতিউর রহমান নিজামী, সভাপতি, পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ, (১৯৭০-৭১)

১১ অক্টোবর (১৯৬৯) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র কাউন্সিল নামে একটি স্বাধীন ছাত্র সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মোহাম্মদ ফজলুল হক এর আহবায়ক মনোনীত হন।[৭৫ক]

করাচীতে ৭ নভেম্বর এন. এস. এফ ও বালুচ ছাত্র সংস্থা যৌথভাবে শিক্ষা দিবস পালন করে। ছাত্ররা এদিন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আলী হায়দার কাজমীর নেতৃত্বে মিছিল করে। করাচীতে একই দিন এন. এস. এফ (রশীদ গ্রুপও) মিছিল করে।[৭৬]

১৮ জানুয়ারী (১৯৭০) ঢাকায় গ্রীন রোডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণের শেষ পর্বের ছাত্র শেখ মোহাম্মদ শাহজাহান-এর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান খাকসার ছাত্র আন্দোলনের অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এ. এস. এম গোলাম কিবরিয়া এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৭৭]

করাচীতে সিন্ধী ছাত্র ফেডারেশন এক সভায় হায়দরাবাদে সুপরিকল্পিত দাঙ্গার নিন্দা করে ২৯ জানুয়ারী এক বিবৃতি দেয়।[৭৮]

২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার ছাত্ররা মো: বাদশাহ হোসেনকে আহবায়ক করে ঢাকা শহর ছাত্র সংসদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।[৭৯]

পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ 'রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে ৩ আগস্ট (১৯৭০)। বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক আবদুস সালাম এতে প্রধান অতিথি এবং আবুল মনসুর আহমদ প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৮০]

পাকিস্তান ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এস. এম. নূরুল আনোয়ারের নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবী দল ঢাকা শহরের বিভিন্ন দুর্গত এলাকা সফর করেন এবং সাহায্য বিতরণ করেন।[৮১]

৭৫ক দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ অক্টোবর ১৯৬৯
৭৬ ঐ ৮ নভেম্বর, ১৯৬৯
৭৭ ঐ ২২ জানুয়ারী ১৯৭০
৭৮ ঐ ৩১ জানুয়ারী ১৯৭০
৭৯ ঐ ৫ মার্চ ১৯৭০
৮০ ঐ ৪ আগস্ট ১৯৭০
৮১ ঐ ১১ আগস্ট ১৯৭০

পূর্ব বাংলা ছাত্রশক্তির সভাপতি জিয়াউদ্দিন খান ১১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালনের আহবান জানায়।[৮২]

১২ সেপ্টেম্বর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের একদল ছাত্রের এক সমাবেশে পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন নামে একটি নতুন ছাত্র সংগঠন করা হয়। মো: ইয়াকুব চৌধুরী এর আহবায়ক ছিলেন। সমাবেশে জামাল আহমদকে সভাপতি ও কাজী এ হান্নানকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।[৮৩]

১০ অক্টোবর, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন ও ছাত্রসংঘের সাথে গ্রাম্য ছাত্রলীগ নামে একটি নতুন ছাত্র সংগঠনও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। নির্বাচনে গ্রাম্য ছাত্রলীগ একটি আসন বাদে সকল আসনে জয়লাভ করে।[৮৪]

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা হোম ইকনমিক্স কলেজে মুসলিম ছাত্রী সংঘ নামে একটি ছাত্র সংগঠনের শাখা গঠিত হয়। নুরজাহান বেগম ও ইফাত আরা সভানেত্রী ও সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।[৮৫]

কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদের নির্বাচনে 'জয় বাংলা পরিষদ' ও 'জয় ১১ দফা পরিষদ' প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। 'জয় বাংলা পরিষদ' ছিল ছাত্রলীগ সমর্থিত এবং 'জয় ১১ দফা পরিষদ' ছিল ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত।[৮৬]

ছাত্র ঐক্যে ফাটল

১৯৬২ সালে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুবের সামরিক শাসনের ভিতে কাঁপন তুলে দেওয়া হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ে প্রথমে ৬৮ সালে এবং পরে ৬৯ সালে সারা পাকিস্তানে 'আইয়ুব-মোনায়েম খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু আইয়ুবের পতনের পর ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে মারাত্মক সংকট দেখা দেয়।

'আইয়ুব যায় যায়' সময় থেকেই ছাত্র আন্দোলনে মারাত্মক বিভেদ শুরু হয়। বিভেদের সূত্রপাত করে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে তখন

৮২ দৈনিক পাকিস্তান, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
৮৩ ঐ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
৮৪ ঐ ১২ অক্টোবর ১৯৭০
৮৫ ঐ ৯ নভেম্বর ১৯৭০
৮৬ ২৭ জানুয়ারী ১৯৭১

চীনপন্থী রাজনীতির বহু উপদল কাজ করতো। এদের অনেকেই ছাত্র লীগ (তোফায়েল) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করাকে সংশোধনবাদী কার্যকলাপ মনে করতো। ফলে একটি উপদলের সব সময়ই প্রচেষ্টা ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে বের করে আনা। এ উদ্দেশ্যে তারা মাঝে মাঝে বিভেদমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত।

এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে ৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯)। এ দিন ছাত্র ইউনিয়ন (মেননপন্থী)-তে বসবাসরত একটি উপদল একটি প্রচারপত্র 'সংগ্রামী ছাত্র সমাজ'-এর নামে ছেপে বিলি করে। এতে উনসত্তরের আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদানকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়। প্রচারপত্রটিতে একমাত্র মাওলানা ভাসানীর নামই নেওয়া হয়। বলা হয়, 'অশিতিপর বৃদ্ধ অগ্নিপুরুষ মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র'। অথবা, 'মাওলানা ভাসানী যে অগ্নিমশাল প্রজ্বলিত করেছেন তাকে কখনও নিভতে দেয়া যাবে না।' প্রচারপত্রটি তাদের ভাষাকে এখানেই শেষ করে নি। প্রবল উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের প্রধান জোট ড্যাক-এর বিরুদ্ধে। তারা বলে, 'পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ আজ ১১ দফা দাবীর স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সরকার বিরোধিতার নামে জন্ম দিয়েছেন 'ড্যাক' নামধারী এক 'জারজ সন্তান'।

এ প্রচারপত্র নিয়ে বিরোধ বাধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের হৃদয়ের মণিকোঠায় তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবস্থান। এ ছাড়া, মাওলানা ভাসানী আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন আইয়ুব সরকারের প্রতি মোহগ্রস্থ ব্যক্তিত্ব। তার উপর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ওয়ালী 'ড্যাক' নামক রাজনৈতিক জোটে থাকায় তাদের 'জারজ সন্তান' বলে গালি দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)র কর্মীগণ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায়ও এ বিষয়টি আলোচিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার দলের কতিপয় কর্মীর এ হঠকারী কার্যকলাপের নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন।[৮৭]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে দ্বিতীয় দফা বিরোধ দেখা দেয় জাতীয় পরিষদ সদস্য ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার সদস্যদের পদত্যাগের সময় সীমা নিয়ে। পূর্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পয়লা মার্চের মধ্যে তাদের পদত্যাগ করার সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন।

---

৮৭ মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত, মাহফুজউল্লাহ, *অভ্যুত্থানের উনসত্তর* (ঢাকা, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৭২ ১১০,১১১

কিন্তু ছাত্রলীগ এ সময় ৩ মে (১৯৬৯) পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করলে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন ও মতিয়া গ্রুপ উভয়েই তার বিরোধিতা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৭ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে আইয়ুবের ৮০ হাজার 'ফেরেশতা' বলে পরিচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে আরেক দফা বিরোধ বেধে উঠলে সংগ্রাম পরিষদ থেকে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) সংগঠনগতভাবে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৮৮]

এরপূর্বে ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে ছাত্রলীগ (তোফায়েল)-এর গুরুতর মতবিরোধ ঘটে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে সংগ্রামী জননেতাদের মধ্য থেকে শেখ মুজিব, মাওলানা ভাসানী, মণি সিংহ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে একযোগে একটি সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ছাত্রলীগ সকলকে এক সাথে সংবর্ধনা দেওয়ার বিরোধিতা করে। তারা শেখ মুজিবকে একা সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য জেদ ধরে এবং মণি সিংহকে কোনো প্রকার সংবর্ধনা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে থাকে। অবশেষে আপোষ ফর্মুলায় রেসকোর্স ও পল্টনে দুটি পৃথক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্রলীগ (তোফায়েল)-এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

এ মতভেদ ও বিরোধের রেশ শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে যায় যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়ে। সংগ্রাম পরিষদের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি না ঘটলেও মার্চ (১৯৬৯) পর থেকেই ছাত্র সংগঠনগুলি আলাদা-আলাদা দলীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। মাঝে মধ্যে কোনো কোনো জরুরী ইস্যুতে এবং মঞ্চে বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা অথবা বিবৃতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কখনোই আর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ঘটে নি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যকার মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব-বিরোধে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সংগঠনগুলি সর্বশেষ যৌথ বিবৃতি দেয় ২৯ অক্টোবর (১৯৬৯)। পূর্ব পাকিস্তানে অব্যাহত খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (দুলন) সর্বশেষ যুক্ত বিবৃতি দেয়।

---

৮৮ মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮

এরপরই ছাত্র সংগঠনগুলির মতানৈক্য বিরোধে পর্যবসিত হয়। আর এ বিরোধের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত পয়লা জানুয়ারী (১৯৭০)। এদিন থেকে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের অধীনে প্রথম রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। ছাত্রলীগ (তোফায়েল) ও ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ ২৮ ডিসেম্বর (১৯৬৯) এক যৌথ বিবৃতিতে পয়লা জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ছাত্র জমায়েত, মিছিল ও সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

এ বিবৃতির কারণে অনেকেই ভেবেছিলেন ছাত্রদলগুলি সম্ভবত আবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু পয়লা জানুয়ারী (১৯৭০) বৃহস্পতিবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও এন. এস. এফ (দুলন)-এর যে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা শেষ পর্যন্ত তো অনুষ্ঠিত হলোই না, বরং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষির মধ্যে পাশাপাশি দুটো উত্তেজনাকর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের পূর্বেই সভার প্রস্তাব নিয়ে বিরোধ বেধে উঠে। সামরিক আইন বলবৎ থাকার প্রশ্ন ও ছয় দফা ভিত্তিক ১১ দফা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর সুরাহা না হওয়ায় ছাত্রলীগ এককভাবে একটি এবং ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ও এন. এস. এফ (দুলন) যৌথভাবে অন্য আরেকটি পৃথক সভার আয়োজন করে। উভয় সভাতেই মাইক ব্যবহৃত হওয়ায় পাল্টাপাল্টি উচ্চ-আওয়াজে কারো বক্তব্যই শোনা যায় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তেজনাকর এ সভা কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদ তাঁদের পৃথক সভা সম্পর্কে বলেন, আমরা নির্বাচনী ঐক্য চাই না — আমরা একমাত্র সংগ্রামী ঐক্যে বিশ্বাসী। যারা ১১ দফা আদায়ের জন্য ওয়াদাবদ্ধ তাদের আমরা নির্বাচনে সমর্থন করবো।

ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) সম্পর্কে তোফায়েল আহমদ বক্তৃতায় বলেন, এপসুকে (East Pakistan Student Union _ E.P.S.U ছাত্রইউনিয়ন-লেখক) আমরা বহুবার আশ্রয় দিয়েছি, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলে দেশবাসীর কাছে জামাতে ইসলাম আমাদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দেয়। তিনি বলেন, যারা ১১ দফার বাইরে, তারা জনগণের শত্রু। তিনি ৬ দফার গুরুত্বকেও ছাত্র সভায় তুলে ধরেন।

সামসুদ্দোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর সভায় এন. এস. এফ নেতা ইব্রাহীম খলিল বলেন, একমাত্র ১১ দফার ভিত্তিতেই ছাত্ররা সংগ্রাম করেছে এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বক্তৃতায় জনাব সামসুদ্দোহা বলেন, ছাত্র সমাজ সেই ১১ দফার ভিত্তিতেই সংগ্রাম করবে, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কোন দফার ভিত্তিতে নয়। সভাশেষে দু'টি পৃথক মিছিল নগরীর রাজপথ বহুদিন পর আবার প্রকম্পিত করে তোলে। দু'টি মিছিলই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাহাদুর শাহ্ পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপ ভিন্ন সাজে এ দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২-০১ মি: মধুর কেন্টিন থেকে কর্মীরা মিছিল করে শহীদ মিনারে যায় এবং শপথ নেয়। পরে গভীর রাতে মশাল মিছিল সহকারে বাহাদুর শাহ্ পার্কে শোভাযাত্রা শেষ করে।[৮৯]

এন. এস. এফ. নেতা মাহবুবুল হক দুলন এ দিনের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ১১ দফা ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের প্রশ্নে ছাত্রলীগ দ্বিমত পোষণ করে। তিনি জানান, বছরের প্রথম দিনে যাতে বীর ছাত্রসমাজ ১১-দফার ভিত্তিতে তাদের ঐতিহ্যবাহী-সংগ্রামী ঐক্য বজায় রাখতে পারেন তার জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের ঐক্য বজায় রাখার জন্য তিনি কয়েকদিন ধরে দৌড় ঝাঁপ করে কূটনৈতিক প্রচেস্টা চালান কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।[৯০]

এদিনের ঘটনা সম্পর্কে ৬ জানুয়ারী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা ও নূরুল ইসলাম বলেন, পয়লা জানুয়ারীর ঐ সভায় সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ১১ দফার সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১১ দফার সমর্থক সকল রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাবকে ছাত্রলীগ (তোফায়েল) আপত্তি উত্থাপন করলে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। তারা বলেন, এ দাবী ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর অন্যতম প্রধান দাবী হওয়ায় আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই আপোষ করা সম্ভব হয় নি।[৯১]

দোসরা জানুয়ারী বিকালে মধুর কেন্টিনে বাংলা ছাত্রলীগের কর্মীসভা আল মুজাহিদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রতি ১১ দফা ভিত্তিক ঐক্যজোট গঠনের দাবী জানানো হয়।[৯২]

---

৮৯ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা জানুয়ারী ১৯৭০
৯০ সাক্ষাৎকার, মাহবুবুল হক দুলন
৯১ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭০
৯২ দৈনিক পাকিস্তান, তেসরা জানুয়ারী ১৯৭০

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা দিবসে বাংলা ছাত্রলীগ আয়োজিত বাংলা একাডেমীর সভায় প্রধান বক্তা অলি আহাদ বলেন, ১১ দফার দুর্বার আন্দোলন স্বৈরাচারী সরকারের ভিত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। এরফলেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও দেশপ্রেমিকদের মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সেই ১১ দফার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অধিকার কারো নেই।[৯৩]

'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নিয়ে জটিলতা'

ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার অনৈক্য ও বিভেদ চূড়ান্ত লাভ করে ১৪জানুয়ারীতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবরকে কেন্দ্র করে। এ দিনের সংবাদপত্রে ছাত্র লীগের সভাপতি ও ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমদ এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, ১২ জানুয়ারী তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এক সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা হচ্ছেন, ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমদ, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম. আবদুর রব, ছাত্রলীগের সহসভানেত্রী রাফিয়া আখতার ডলি, রাকসুর সহসভাপতি আবদুর রহমান, বাকসুর সহসভাপতি ইয়ামী আলী, ইউকসুর নূরন্নবী খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে, তোফায়েল আহমদ, ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ ও এন. এস. এফ-কে বাদ দিয়ে নতুন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করার যুক্তি তুলে ধরে বলেন, ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-জনতার অশেষ ত্যাগ ও অফুরন্ত রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ঐক্যে ভাঙন ধরিয়েছে একদিকে অতি বিপ্লবীরা ও অন্যদিকে প্রগতিবাদের মুখোসধারী প্রতিক্রিয়াশীলরা। তাদের মধ্যে প্রথম দল ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন-লেখক) ভোটের আগে ভাত চান এবং বলেন, 'আমরা এটা করেছি পণ, হতে দেব না নির্বাচন, অপর দল, (ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া-লেখক) প্রগতিশীল কথা বলে আইয়ুব-সবুর চক্রের দোসর এন.এস.এফ. (দুলন গ্রুপ)-এর

---

৯৩ দৈনিক পাকিস্তান, ৫ জানুয়ারী ১৯৭০

হাত মিলিয়ে আগামী নির্বাচনে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ১১ দফাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান। তাই আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কাঠামোতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার।[৯৪]

এরপর ১৭ জানুয়ারী (১৯৭০) ছাত্রলীগের উদ্যোগে ১১ দফা সপ্তাহ পালন করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় তোফায়েল আহমদ আবার ছাত্র ইউনিয়ন মেনন, মতিয়া ও এন. এস. এফ-কে বাদ দিয়ে নতুন করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, ১১ দফা প্রণয়নের সময় অনেকে এটাকে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু ১১ দফা আন্দোলনের সাফল্যে তারা আবার ১১ দফার সমর্থক হয়েছেন। এইসব সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য জনগণের প্রতি তিনি আহবান জানান।

ছাত্রলীগ নেতা বলেন, এপসুর অতি বিপ্লবী দলটি (মেনন গ্রুপ—লেখক) নির্বাচনের বিরোধিতা করায় তাদের সংগ্রাম পরিষদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ১১ দফায় নির্বাচনের দাবী রয়েছে।

এন. এস. এফ (দুলন গ্রুপকে) বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ বলেন, তাদের নেতা সবুর খান এক সময় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং ১১ দফার পক্ষে কোন মতামত রাখেন নি। এ সংবাদ সম্মেলনে এন. এস. এফ-এর দুলন গ্রুপের নেতারাও উপস্থিত ছিল। তাই তাদের সাথে ঐক্য হতে পারে না।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-কে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রলীগ ও মতিয়া গ্রুপ মিলে পয়লা জানুয়ারী দাবী দিবস পালনের আহবান জানানো হয়েছিল। কিন্তু মতিয়া গ্রুপ ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করায় তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা ছাত্রলীগের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি বলেন, ১১ দফার ৩ নম্বর দফাতে ৬ দফা লিখিত আছে। ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করার অর্থ ১১ দফার বিরোধিতা করা। তিনি আরো বলেন, এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯৬৬ সালে এপসু (মতিয়া গ্রুপ) ৬ দফার বিরোধিতা করে কিন্তু ১৯৬৭ সালে ৬দফা সমর্থন করে। এবার আবার তারা ৬ দফার বিরোধিতা করেছে।

---

৯৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ জানুয়ারী ১৯৭০

তোফায়েল আহমেদ বলেন, তাই দেখা যাচ্ছে, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৩টি অঙ্গদলই ১১ দফার বিরোধিতা করছে। ছাত্রলীগ ১১ দফার আন্দোলন চালিয়ে যাবে।[৯৫]

১৯জানুয়ারী (১৯৭০) সংবাদপত্রে ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)র সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান খান, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহীম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম এবং ছাত্রইউনিয়ন (মেনন)-এর সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

তাঁরা বলেন, সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা থেকে অসংখ্য চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এ সংগ্রাম পরিষদ সম্পর্কে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে।

ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর কাছে প্রকৃত ঘটনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর সকলেরই জানা আছে যে, গত বছর ৪টি সংগঠন (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ডাকসুর মিলিত ১১ দফার ঐক্যজোটই ছিল সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। গত বছর এই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ১১ দফার দাবীতে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনতার মরণপণ সংগ্রামের ফলে দেশে গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুবী শাসনের অবসান ঘটে।

বর্তমান সামরিক শাসনের আমলে আসন্ন ২৪ জানুয়ারী গণঅভ্যুত্থান দিবস ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একক সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। শত শত শহীদের রক্তদানও গণঅভ্যুত্থানের ফলে আজ সামরিক সরকার গণদাবীর কয়েকটি ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে সত্য কিন্তু পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতার দাবী তথা ১১ দফা

---

৯৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জানুয়ারী ১৯৭০

যেখানে আজো আদায় হয়নি, ছাত্র ঐক্যের বিভেদ সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বাইরে গিয়েছে। শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। এমতাবস্থায় আমরা ঘোষণা করছি যে, ছাত্রলীগের এককভাবে গঠিত নিজস্ব সংগ্রাম পরিষদের সাথে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজের কোন সম্পর্ক নেই।[৯৬]

আইয়ুবের বিচার

ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা রেখে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাজনীতি থেকেও বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এতোদিনকার বিভিন্ন অপকর্ম সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন তুললো না। শুধু তিনি বিদায় নিয়েছেন এটাই ছিল বড় কথা। কিন্তু নিজ দলের (কনভেনশন মুসলিম লীগের) থেকেই এ সম্পর্কে পরে নানাকথা উঠতে থাকলো।

৩ জুলাই (১৯৬৯) এ মর্মে একটি সংবাদ খবরের কাগজে আসে যে ফরিদপুরের কনভেনশন মুসলিম লীগের জনৈক নেতা আবুল কাসেম ওরফে কাফু মিয়া, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যাতে পাকিস্তান মুসলিম লীগ-এর ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা-পয়সা না তুলতে পারেন তার জন্য একটি উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন।[৯৭]

১৬ জুলাই এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খান প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আইয়ুবের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী করেন। তিনি বলেন, আইয়ুব খান ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে তার বিচার করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে।

আসগর খান রাওয়ালপিণ্ডিতে আইনজীবীদের এক সমাবেশে কথা বলছিলেন। তিনি কনভেনশন মুসলিম লীগের তহবিল সম্পর্কেও অনুরূপ প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, এ তহবিলে প্রায় দু থেকে তিন কোটি টাকা আছে। ক্ষমতায় থেকে তারা এগুলি অসাধু উপায়ে এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের উপর চাপ দিয়ে সংগ্রহ করেছে।[৯৮]

---

৯৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ জানুয়ারী ১৯৭০
৯৭ ঐ ৩ জুলাই ১৯৬৯
৯৮ ঐ ১৭ জুলাই ১৯৬৯

এর মধ্যে চাঞ্চল্যকর যে ঘটনাটি ঘটলো, তাহলো সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আইয়ুব খানের দল খোদ কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাতেই আইয়ুব-মোনায়েমের বিচার দাবী করা হয়। ২৭ জুলাই ঢাকার হোটেল শাহবাগে (বর্তমান পি জি হাসপাতালে) খান. এ সবুরের সভাপতিত্বে কনভেশন মুসলিম লীগের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের নেতা গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খানের প্রকাশ্য বিচার দাবী করা হয়। তারা বলেন, মোনায়েম খান ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে দলের জন্য বদনাম কুড়িয়েছেন। আইয়ুবের এককালীন এ কর্মী ও নেতারা অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় থাকাকালে জনগণের দাবী-দাওয়ার প্রতি কর্ণপাত না করায় আজকে তাদের এ অবস্থা। সভায় পূর্ব পাকিস্তানী এইসব মুসলিম লীগাররা পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মী-নেতাদের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রাখার জন্যও এক নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৯৯]

কনভেনশন মুসলিম লীগের সমর্থক ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন. এস. এফ)-এর সভাপতি ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম এবং প্রাক্তন নেতা মাহবুবুল হক দুলনও ১০ ডিসেম্বর আইয়ুব-মোনায়েমের বিচার দাবী করে বিবৃতি দেন। তারা বলেন, আইয়ুব এবং তার মোসাহেবরা ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে দুর্নীতির বীজ রোপন করেছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই এদের বিচার হওয়া উচিৎ। এছাড়া নেতৃত্রয়, অবৈধ উপায়ে উপার্জিত আইয়ুব-মোনেমের সম্পদ জনগণের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্যও সরকারের কাছে আবেদন জানান।[১০০]

এর মধ্যে আইয়ুব খানের গড়া সেই কনভেনশন মুসলিম লীগের কার্যালয় দখল নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী লাহোরে ডেভিস রোডে অবস্থিত মুসলিম লীগের অফিস তালা ভেঙে দখল করেন।

পাল্টা কমিটির নেতা খান আবদুল কাইউম খান পুলিশের কাছে এক আবেদনে (১৭জানুয়ারী ১৯৭০) মুসলিম লীগের অফিস তার দখলে এনে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আইন অনুয়াযী তাঁরটাই আসল মুসলিম লীগ।[১০১]

১০ জুন (১৯৭০) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের তহবিল আটক করার নির্দশ দেন। তিনি বলেন, তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আটকাদেশ বলবৎ থাকবে।[১০২]

৯৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ জুলাই ১৯৬৯
১০০ ঐ ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৯
১০১ ঐ ১৮ জানুয়ারী ১৯৭০
১০২ ঐ ১১ জুন ১৯৭১

ডমিনিক ক্যাম্পেট
স্বত্বাধিকারী
আত্ম মুক্তি পাঠাগার
নোয়াখালী।

চাঁদের দেশে মানুষ: ছাত্র নেতাদের টেলিগ্রাম

চাঁদ ছিল মানুষের কাছে এক রহস্যময় দেশ। এ নিয়ে অনেক কল্পকাহিনী, অনেক কাব্য-কলা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়ে হাজারো গল্প মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম থেকেই চলে আসছিল। তবে বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল চাঁদে মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। আর তারই জন্য মানুষকে পেয়ে বসে চন্দ্র বিজয়ের নেশায়।

চাঁদের পথে এপোলো ১১ যাত্রা শুরু করেছিল ১৭ জুলাই ১৯৬৯। পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছাতে মানুষের সময় লেগেছিল মোট ৪ দিন। অর্থাৎ মানুষের প্রচেষ্টার সফলতা আসে অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই, পূর্ব পাকিস্তান সময় সকাল ৮টা বেজে ৫৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে। মার্কিন নভোযান এপোলো-১১তে চরে নভোচারী নীল আর্মষ্ট্রং চাঁদের উর্বর ভূমিতে প্রথম মানুষের পা স্পর্শ করান। আর সাথে সাথে ভেঙে যায় চাঁদ নিয়ে সকল প্রকার অলৌকিকতা, কুসংস্কারের বেড়াজাল।

চাঁদের মাটিতে পা ছুঁয়েই আর্মষ্ট্রং বলেন, মানুষের পক্ষে এ একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, কিন্তু মানব জাতির পক্ষে তা একটি বিরাট অগ্রগতি। এ সময় তাঁর অপর সহযাত্রী এডউইন এলড্রিন চাঁদের মাটিতে পা দেওয়ার জন্য তাঁদের নভোযানে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এলড্রিন ২০ মিনিট পর ৯.১৬ মিনিটে চন্দ্রতরীর মই 'ঈগল' যোগে ধীরে ধীরে চাঁদের বুকে নেমে আসেন।[১০৩]

চাঁদ যখন মানুষের হাতের মুঠায় পাকিস্তানের মানুষের মনেও স্বাভাবিকভাবে নেমে আসে এ চাঞ্চল্য। সে চাঞ্চল্যের বহি:প্রকাশ ঘটে ছাত্র সমাজের বিবৃতি, টেলিগ্রাম, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে।

ডাকসুর সহসভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম আবদুর রব সাফল্যজনকভাবে চাঁদে অবতরণ করায় এপোলো-১১র নভোচারীদের এক বিবৃতিতে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ বিজয় বিশ্ব সভ্যতার ও বিজ্ঞানের।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসার পরিচালকের কাছে এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে

১০৩ আজাদ, ২২ জুলাই ১৯৬৯

তারবার্তা পাঠিয়ে চাঁদে মানুষের অবতরণের বিজয়কে অভিনন্দন জানান। তার বার্তায় তাঁরা বলেন, চাঁদের বুকে মানুষের পদচারণা যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষেরই সংগ্রামের আর একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ- অপরিসীম বিজয়।[১০৪]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (আল মুজাহিদী) গ্রুপ বাংলা একাডেমীতে 'চন্দ্রবিজয়: গ্যাগারিন থেকে আমষ্ট্রং' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা মানুষ কর্তৃক চাঁদের বিজয়কে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা করেন।

সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে ড: কুদরাত-ই-খুদা বলেন, পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

চন্দ্র বিজয়ের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সত্যিকার ধর্ম আজও আমরা বুঝতে শিখিনি। যে ধর্ম বিজ্ঞান শেখায় না, সে ধর্ম ধর্মই নয়। এ জন্যেই সম্ভবত: বিশ্ব আজ ধর্মত্যাগী হতে চলেছে।[১০৬]

নূরখান শিক্ষা মিশন ও তার সারমর্ম

ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যে বিষয়টির প্রতি প্রকাশ্যে তাঁদের বেশী তৎপর দেখা যায়, তা হচ্ছে, ছাত্র এবং শিক্ষা। প্রথম থেকেই এ সরকার ছাত্রদের খুশী রাখার জন্য বেশ কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনুরূপ শিক্ষকদের সম্পর্কেও তাঁদের অধিক মনযোগ দেখা যায়।

সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক, এয়ার ভাইস মার্শাল নূরখান ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা বিষয়ে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথম থেকেই যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলেন।

২৮ এপ্রিল, ১৯৬৯ সংবাদপত্রের পাতায় সর্বপ্রথম এ নয়া সামরিক সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নতুন একটি শিক্ষানীতির রূপরেখাও তাঁরা এদিন প্রকাশ করেন।

---

১০৪ দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ জুলাই ১৯৬৯
১০৫ আজাদ ২৭ জুলাই ১৯৬৯
১০৬ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ জুলাই ১৯৬৯

এতে বলা হয়, ছাত্ররা শুধু পরিচালিত হবে না, পরিচালনায়ও অংশ নেবে। ছাত্রদের ইউনিয়ন ও সংগঠন করার অধিকার থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্য একটি মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হবে।

সকলের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হবে। প্রস্তাবিত রূপরেখার এক পর্যালোচনায় বলা হয়, পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ও তার শিক্ষকদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ।[১০৭]

এ রূপরেখার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ৩ জুলাই, ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের প্রশাসন কাউন্সিলের সদস্য ও সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার মার্শাল নূরখান একটি নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, জনমত যাচাই ও বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি নয়া শিক্ষানীতির কতকগুলির বিশেষ দিক তুলে ধরেন:

১ ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দান ও প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৯৮০ সালের মধ্যে গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা
২ ১৯৭৫ সালের মধ্যে অফিস-আদালতের ভাষা হিসাবে পুরোপুরিভাবে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা ও উর্দূ চালু করা
৩ ১৯৭৩ সালের মধ্যে সরকারী কর্মকর্তাদের জাতীয় ভাষাগুলোতে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে
৪ উভয় প্রদেশেই ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও উর্দূ দু'টোই হবে বাধ্যতামূলক বিষয়
৫ ১৮ থেকে ২২ বছর বয়স্ক সকল ছাত্রকেই বাধ্যতামূলকভাবে দু'বছরের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিসে যোগদানে ব্যবস্থা করা হবে। এর মধ্যে ৬ মাস সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ১৮ মাস পল্লী এলাকার শিক্ষাদান ও স্বাক্ষরতা কর্মসূচীতে

---

১০৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ এপ্রিল ৬৯

অংশগ্রহণ করতে হবে। ছাত্রদের এজন্য বিনামূল্যে খাওয়া-দাওয়া ও ইউনিফর্ম এবং পকেট খরচও দেওয়া হবে

৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করা হবে

৭ ছাত্রদের সংগঠন করার অধিকার থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন মতো ছাত্রদের সরাসরি অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হবে

৮ স্কুল শিক্ষাকে দু'টি স্তরে বিভক্ত করা হবে। এর মধ্যে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক স্তর এবং নবম ও দশম শ্রেণী হবে হাইস্কুলের স্তর

৯ স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণ করবে জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং এগুলো হবে স্বায়ত্বশাসিত ধাঁচের। জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ বর্তমানের সরকারী ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা পরিচালিত সমস্ত স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ কর্তৃপক্ষ বেসরকারী স্কুল অনুমোদন ও আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করবেন। প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগ করবেন। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের অধীনে একদল তত্ত্বধায়ক থাকবে, এরা পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের শেষে ছাত্রদের কার কোন দিকে ঝোঁক তা তারা নির্ণয় ও পরীক্ষা করবেন। জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাড়াও জেলায় বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে উপদেষ্টা সংস্থা গঠিত হবে

১০ কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষকদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় শিক্ষকেরা তাঁদের লেখা বা অন্যান্য সৃজনশীল কর্ম দ্বারা টাকা উপার্জন করতে পারবেন কিন্তু কখনোই প্রাইভেট টিউশনী করে টাকা কামাতে পারবেন না

১১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র থেকেই কোন কারণেই কোন প্রকার চাঁদা (ফি) গ্রহণ করা যাবে না। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র ছাত্রীগণ সকল প্রকার চাঁদামুক্ত থাকবে

১২ পরীক্ষার ফলাফলে কোন বিভাগ বা শ্রেণী থাকবে না। সনদপত্রে শুধুমাত্র নম্বর ও গ্রেড উল্লেখ থাকবে। ফলাফলে বিভাগ ও শ্রেণী উল্লেখ দূর্নীতির জন্মদেয় বলে কমিশন মন্তব্য করে

১৩ কমিশন বলে, যে ছাত্র সাময়িক পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হবে তাকে আর একবার মাত্র নিয়মিত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এরপর থেকে সে অনিয়মিত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেবে। কেউ এমনি করে পরপর তিনবার পরীক্ষা দিতে পারলেই সে কৃতকার্য বলে ঘোষিত হবে, তবে তার নম্বর সনদে উল্লেখ থাকবে

১৪ প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ (গভর্নিং বডি) থাকবে। তারা হবে স্বয়ংশাসিত

১৫ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করা হবে

১৬ সিণ্ডিকেট ও সিনেটে ছাত্রদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে তাদের প্রতিনিধি থাকবে

১৭ প্রফেসর বা এসোসিয়েট প্রফেসর মানের শিক্ষক বিভাগীয় প্রধান হবেন এবং ৩ বছর অন্তর অন্তর বৃত্তাকারে তা পরিবর্তিত হবে

১৮ বিদেশী মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা হবে

১৯ ১৯৮০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সর্বজনীন করা হবে

২০ শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে অন্যান্য অফিসের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং শিক্ষকতা পেশার জন্য একটি মাত্র জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হবে

২১ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হবে এবং প্রস্তাবিত এ শিক্ষানীতি বাস্ত-বায়নের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা বাহিনী করা গঠন হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণই এর মৌল উদ্দেশ্য হবে। প্রবেশিকা ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এতে বাধ্যতামূলক ভাবে যোগ দেবে। সরকার তাদের সকল প্রকার খরচ বহন করবে। জাতীয় শিক্ষা বাহিনীতে সদস্য হিসাবে গ্রামে থাকাকালে তারা আগন্তুকের মতো থাকবে না, বরং তারা নিজেদের গ্রামে ও সমাজের অংশ বলেই গণ্য হবে এবং সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনায় অংশ নেবে। শিক্ষাবাহিনীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ডিগ্রী নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে এবং একীভূত বেতন স্কেলে শিক্ষকের চাকুরীর নিশ্চয়তাও তাদের থাকবে

২৩ পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ময়মনসিংহ ছাড়াও এ প্রদেশে আরো একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে

২৪ বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য সম্পর্কিত একটি বিষয়ে খসড়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়, গভর্নরদের আচার্য (চ্যান্সেলর) হওয়ার দরকার নেই। দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে একজন আচার্য নিয়োগ করা হবে

২৫ উপাচার্যের মেয়াদ হবে মাত্র ৩ বছর এবং ৩ বছর অতিক্রমণ করলে তাকে আর নতুন করে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ভোটে তিনি নির্বাচিত হবেন।

২৬ খসড়া শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনাগুলোতেও শিক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশী। প্রতিবেদনে এ সম্পকিত তথ্যে বলা হয়, পাকিস্তানে দু'লাখেরও বেশী শিক্ষিত বেকার রয়েছে

জনাব নূরখান ইসলামাবাদে পরিকল্পনা কমিশনের মিলনায়তনে সাংবাদিকদের বলেন, নয়া শিক্ষানীতি নেহায়েত একটি রিপোর্টই নয়, এটা পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে। অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে বেশী আশাবাদী না হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে জানান।[১০৮]

নূরখান শিক্ষা কমিশন: প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া

ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের কাছে এয়ার মার্শাল নূরখান তাঁর প্রণীত খসড়া শিক্ষানীতি ঘোষণার পর অন্তত চারদিন সারা পাকিস্তানের পর্যবেক্ষক মহল একেবারেই নিশ্চুপ ছিল এবং ২৭ জুলাইর পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের কেউই এ নিয়ে মুখ খুলেনি। আর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠন গুলির আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানতে আগস্টের মধ্য পর্যায় পর্যন্ত সময় চলে যায়। সকলেই গভীর মনযোগের সাথে এর প্রতিবেদনের প্রতিটি বিষয় নিরীক্ষণ করতে ব্যস্ত থাকে। কারণ এর পূর্বে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কর্তৃক ১৯৫৯ সালে গঠিত শরিফ কমিশনের প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং ১৯৬২ সালে গঠিত হামদুর রহমান কমিশন প্রণীত ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ বিষয়ক প্রতিবেদন দু'টোই ছাত্ররা প্রত্যাখ্যান করে।

তবে নূর খান কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতির প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া জানাতে এগিয়ে আসে মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি সংগঠন। ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রথম অবস্থায় নূর খান শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল সতর্ক থাকলেও পরবর্তী অবস্থায় এ নিয়ে তারা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখায়। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, মিছিল-মিটিং, বক্তৃতা- বিবৃতি, এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত ঘটতে থাকে। আরো অবাক করার বিষয় যে, খুব সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মসজিদ সমূহে পর্যন্ত নূরখান শিক্ষা কমিশন নিয়ে অনুষ্ঠানিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী জামাতে তালাবা নূরখান শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে সর্বাগ্রে সতর্ক আশাবাদ ব্যক্ত করে। এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামাল এক বিবৃতিতে খসড়া শিক্ষানীতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ প্রথম জাতীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি শিক্ষানীতি তৈরী করা হয়েছে।[১০৯]

১০৮ *Proposals for a New Educational Policy, Ministry of Education, Islamabad, July, 1969* (নূর খান শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন) এবং দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জুলাই ১৯৬৯ এর সংখ্যার সমন্বয়ে অধ্যায়টি তৈরী করা হয়েছে

১০৯ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জুলাই ১৯৬৯

এর পর দিন পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি আশরাফ আলী খান, নূর খান ঘোষিত শিক্ষানীতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা–নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এতে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ও আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তদের সমমর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় গণিত ও সমাজবিদ্যা এবং আধুনিক শিক্ষায় ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করায় উভয় শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসার ছাত্রদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১১০]

পশ্চিম পাকিস্তান লেকচারার সমিতির সভাপতি ড. ইজাজ আহমেদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে, নূরখান ঘোষিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে সতর্ক আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এর কতিপয় বিষয় অত্যাধিক আদর্শবাদী। তিনি উর্দু ও বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণের পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানিয়ে এক সংশোধনী এনে বলেন, উভয় ভাষার জন্য রোমান পাণ্ডুলিপি গ্রহণ সঠিক হবে।

তিনি আরো বলেন, ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা ও উর্দূ এবং কিণ্ডার গার্টেনে একেবারেই ইংরেজীকে বর্জন করতে হবে।

তিনি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমালোচনা করে বলেন, এতে শ্রেণীহীন শিক্ষা সার্ভিসের কথা বলা হলেও প্রকৃপক্ষে ৬টি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া ছাত্ররা পরপর তিনবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর তাদের পাশ সনদ দেওয়ার যে প্রস্তাব শিক্ষানীতিতে করা হয়েছে তিনি তার বিরোধিতা করেন। শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ফল অশুভ পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[১১১]

পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ শফিউল্লা বর্তমান সামরিক সরকার প্রণীত নূর খান শিক্ষা কমিশনের খসড়া প্রতিবেদনকে অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতি দেন।[১১২]

এ সব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রাথমিক পর্যায়ে নূর খান করাচী সফর করছিলেন। এ সময় করাচী অধ্যক্ষ সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যক্ষ হাসান আদিল তাঁর সঙ্গে

---

১১০ দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জুলাই ১৯৬৯
১১১ ঐ ১০ জুলাই ১৯৬৯
১১২ ঐ ১৪ জুলাই ১৯৬৯

সাক্ষাৎ করে খসড়া শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও কলেজ সমূহের পরিচালনা পরিষদে ছাত্র প্রতিনিধি রাখার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থা শিক্ষকদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রস্তাব গৃহীত না হলে তারা গন্ডগোল করতে পারে।

কিন্তু নূর খান অধ্যক্ষ সমিতির দাবী সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবস্থাপনায় ছাত্রদের অধিকার ভোগ করতে দেওয়া উচিৎ। তিনি আরো বলেন, ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হলে ছাত্ররা শিক্ষকদের সাথে একত্রে বসে তাদের প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নে সুবিধা-অসুবিধা দু'টোই ভালভাবে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

নূরখান অভিযোগ করেন, আমলাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলে ছাত্রদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার থেকে শিক্ষাবিদরা প্রায়ই তাদের বঞ্চিত করতে চান। তিনি দাবী করেন কলেজ পরিচালনা সংস্থায় ছাত্ররা আসলে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।[১১৩]

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও এ নিয়ে অলোচনার জন্য একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে। অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কমিশনের প্রস্তাবসমূহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা হয়। সমিতি বলে, শিক্ষানীতি প্রণয়নের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেসব সুপারিশ করেছিলেন তার অধিকাংশই গ্রহণ করায় তাঁরা সন্তুষ্ট। তবে শিক্ষক সমিতি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ২১ দফা সংশোধনী আনে। এতে ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্ম নিরপেক্ষ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়।[১১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবী জানায়, তার প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বিবৃতি দেয় ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া ছাত্রসংঘের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নূরুল ইসলামও এ সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির ওকালতিকারকদের কখনো বরদাস্ত করা হবে না।[১১৫]

---

১১৩ দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ জুলাই ১৯৬৯
১১৪ ঐ ২৭ জুলাই ১৯৬৯
১১৫ ঐ ৩১ জুলাই ১৯৬৯

ইসলামী ছাত্রসংঘ নূর খানের শিক্ষানীতি সমর্থন করে ইকবাল হলে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করে। এক প্রস্তাবে ছাত্রসংঘ মহিলাদের জন্য পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, করাচীর অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পাকিস্তানে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও দাবী করে।[১১৬]

পাকিস্তান লেখক সংঘ তাদের মাতৃভাষা দিবস পালনের আলোচনা সভায় পাকিস্তান সরকারের খসড়া শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা প্রচলনের উদ্যোগকে সমর্থন জানায়।

এতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুনীর চৌধূরী বলেন, সরকারী আমলাদের চিন্তানায়ক বা পণ্ডিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু সৎ চরিত্র হয়ে কাজ করে যাওয়া। মাতৃভাষা চালুর প্রশ্নে কোন সংঘর্ষ দেখা দিলে তা পণ্ডিতরাই সমাধান করবেন। ইংরেজী বাতিল হলে দেশ বিচ্ছিন্ন হবে এমন প্ররোচণা হাস্যকর বলে তিনি মন্তব্য করেন।[১১৭]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়ে কতিপয় সংশোধনী দাবী করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ণ দাবী করেন। কিন্তু পাঠ-তালিকা নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনায় ছাত্র প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ সমীচিন হবে না বলে মন্তব্য করেন। কারণ ছাত্র কি পড়বে তা তারা ঠিক করতে পারে না।[১১৮]

পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি রাখার বিরোধিতা করে বিবৃতি দেয়। সমিতি শিক্ষার সর্বস্তরে বেশভূষা ও চাল চলনে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করারও আহ্বান জানায়।[১১৯]

ঢাকা জেলা স্কুল শিক্ষক সমিতি পাল্টা আরেক বিবৃতিতে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখার দাবী জানায়। সমিতি দাবী করে যে, কোনো শিক্ষককেই মাসে ৩৫০ টাকার কম বেতন দেওয়া যাবে না।[১২০]

---

১১৬ দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জুলাই ১৯৬৯
১১৭ ঐ ২৭ জুলাই ১৯৬৯
১১৮ ঐ ৩১ জুলাই ১৯৬৯
১১৯ ঐ ৫ আগষ্ট ১৯৬৯
১২০ ঐ ৯ আগষ্ট ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দের শতকরা ৬০ ভাগ প্রকৌশল শিক্ষার জন্য ব্যয় করার আবেদন জানায়। সমিতি চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় তিনটি বন কলেজ প্রতিষ্ঠারও দাবী জানায়।[১২১]

পাকিস্তান বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির ঢাকা শাখা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে সাধারণ শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার স্থান উল্লিখিত না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। সমিতি বলে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগের পর ছাত্রদের অন্তত: শতকরা ৭০ জনকে পেশাগত কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিৎ। সমিতি শিক্ষক সংখ্যা ছাত্র অনুপাতে স্কুল পর্যায়ে ১:২৫, কলেজ ১: ১৫ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১: ১২ করা প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করে।[১২২]

নিপা ভবনে জাতীয় পূনর্গঠন ব্যুরো (বি. এন. আর) নূরখান শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ব্যুরোর পরিচালক ড: হাসান জামান ইসলামিয়াত শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে শিক্ষার সকল স্তরে 'ইসলামিক আদর্শ' প্রবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন। তিনি সকল অনার্স ও এম, এ ক্লাশে ইসলামের সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক থিওরী বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে প্রবর্তন এবং এম,এ ক্লাশে পাকিস্তানের ইতিহাস ও আদর্শ এবং নামাজের সময়কে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করার সুপারিশ করেন।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড: আল মুতী শরফুদ্দীন। তিনি উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিটি স্কুলে আনুপাতিক হারে বিজ্ঞান শিক্ষকের হার হচ্ছে ০.৭ ভাগ। সে তুলনায় প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর নেই।

ড: কাজী মোতাহার হোসেন বলেন, পুরনো শিক্ষানীতিগুলির তুলনায় নতুন শিক্ষানীতিটি অবশ্যই ভাল। কারণ এতে বড় বড় প্রতিশ্রুতি আছে। এগুলি কিভাবে বাস্তবায়িত হয় আমরা তা-ই লক্ষ্য করবো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদে ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যাপারেও সংশয় প্রকাশ করে বলেন, এতে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটতে পারে। অবশ্য একই সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, এটি একটি নতুন ধারণা এবং তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে দেখাও যেতে পারে।[১২৩]

---

১২১ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৬৯
১২২ ঐ ৮ আগস্ট ১৯৬৯
১২৩ ঐ পয়লা আগস্ট ১৯৬৯

এ সময় মাদ্রাসা শিক্ষার উপরও একটি আলাদা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনসটিটিউটে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দীন। তিনি সেমিনারে বলেন, মুসলমানদের অবনতির কারণ হচ্ছে, ইসলাম প্রচারের সময় আমরা যে কথা বলি তা আমল করি না। এ ভাবে আমরা শুধু নিজেদেরই ধোঁকা দিচ্ছি না, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গেও প্রবঞ্চনা করছি।

প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা এ সেমিনারে যোগদান করেন। শর্ষিনার পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ এতে সভাপতিত্ব করছিলেন।

জেনারেল মোজাফর আরো বলেন, ইসলাম সত্যের ধর্ম। কিন্তু এ সত্যের ধর্ম এখন কোথায়? ইসলামপন্থীদের কথায় ও কাজের মিল না থাকার জন্য নতুন বংশধররা শুধু লক্ষহীনই নয়, তারা নাস্তিকতার দিকেও ঝুঁকে পড়ছে। আমরা কোরআন পাঠ করি কিন্তু তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি না, প্রতি ঘরে ঘরে কোরআন শরীফ রয়েছে এটাই যথেষ্ট নয়।

সভাপতির ভাষণে পীর সাহেব বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থিব প্রয়োজনের কিছু শিক্ষার অভাব রয়েছে, ফলে কর্মক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পঙ্গু হয়ে আছি।

মাদ্রাসা শিক্ষার উপর অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে যেসব খুঁটিনাটি দিক পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয় তার মধ্যে ছিল অনুষ্ঠানের সকল কর্মসূচী বাংলায় ঘোষণা করার বিষয়। শর্ষিনার পীর সাহেবও বাংলায় ভাষণ দেন। তবে সেমিনার কমিটির সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল হক (ফেনী) ও সম্পাদক মাওলানা এম.এ. মান্নান (কুমিল্লা) উর্দুতে বক্তৃতা করেন।[১২৪]

শিক্ষানীতি প্রশ্নে ডাকসুর মুক্ত আলোচনা: গোলযোগ ও মৃত্যু

নূর খান প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে উভয় পাকিস্তানে বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে বক্তৃতা, বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, সেমিনার ইত্যাদি হতে থাকলেও ছাত্র সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খুলে অনেক দেরীতে।

১২৪ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই ১৯৬৯

ছাত্রদলগুলির মধ্যে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন. এস. এফ) দুলন সমর্থিত অংশ সর্বপ্রথম এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় যে এ ক্ষেত্রেও বিবৃতি দেন এন. এস. এফ-এর প্রাক্তন নেতারা মাত্র।

এন. এস. এফ-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক দুলন ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে কতক সংশোধনী দাবী করেন। তাঁরা বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি অধ্যয়ন সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। বেসরকারী কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণ (সরকারীকরণ-লেখক) করার নীতি বাদ দিতে হবে। ভবিষ্যতে যাঁরা শিক্ষকতার পেশায় আসতে ইচ্ছুক, তাদেরই প্রস্তাবিত শিক্ষাবাহিনীর আওতাভুক্ত করতে হবে।[১২৫]

এ সময়ের আশ্চর্যজনক সংবাদ হল প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে বির্তকে পূর্ব পাকিস্তানের মসজিদগুলিও জড়িয়ে পড়ে। প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রেই পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ করে ঢাকা শহরের মসজিদসমূহে শিক্ষানীতি বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণের সংবাদ বের হতে থাকে। ১২ আগস্টের দৈনিক পাকিস্তান এ মর্মে সংবাদ পারিবেশন করে যে, ফকিরাপুল, যাত্রাবাড়ী, সিদ্দিক বাজার, শাহজাহানপুর, শিংটোলা প্রভৃতি জামে মসজিদে নূরখান ঘোষিত শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিকে এসব আলোচনায় মোবারকবাদ জানানো হয়।[১২৬]

ইসলামী ছাত্রসংঘ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নূর খান শিক্ষানীতি নিয়ে অতি উৎসাহের ফলেই শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলি এ সম্পর্কে মুখ খোলে।

পূর্ব পাকিস্তানের ৩১ জন ছাত্রনেতা ১৩ আগস্ট (১৯৬৯) এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রথম জানান নূর খান ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রতি তাঁদের কোন সমর্থন নেই। তাঁরা বলেন, এটা ছাত্রদের ১১ দফার পরিপন্থী।

ছাত্রনেতারা দাবী করেন, শিক্ষাকে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হবে এবং আদর্শ রক্ষার নামে স্কুলসমূহে ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা চলবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে নেতারা বলেন, অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এ ভাষার বোঝা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে।

---

১২৫ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ আগস্ট ১৯৬৯
১২৬ ঐ ১২ আগস্ট ১৯৬৯

বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ, ছাত্রলীগ (তোফায়েল), রোকেয়া হল ছাত্র সংসদ, ইউকসু, রাকসু, ডাকসু, বাকসু, জগন্নাথ হল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, এবং জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ স্বাক্ষর করেন।[১২৭]

এ দিন ২৬জন বিশিষ্ট নাগরিকও এক বিবৃতিতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির পাঁচটি মূল নীতির সাথে তাঁরা একমত নন বলে জানান। তাঁরা বলেন, ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করা হোক। ভাষার বোঝা কমানোর দাবী করে বিবৃতিদাতারা বলেন, তা নাহলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের ৪টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের ৫টি ভাষা শিখতে হবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, কবি জসিমউদ্দীন, বদরুদ্দীন উমর, শহীদুল্লাহ কায়সার, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, আতাউস সামাদ প্রমুখ।[১২৮]

ঠিক এমন একটা অবস্থাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নূর খান প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বিষয়ে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে। ১২ আগস্ট (১৯৬৯) ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে ডাকসু সহসভাপতি তোফায়েল আহমদ এতে সভাপতিত্ব করছিলেন।

মুক্ত আলোচনায় প্রথমেই বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সামসুদ্দোহা। তিনি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর অভিমত রাখছিলেন। তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের একদল কর্মী সভাকক্ষে ঢুকে হট্টগোল শুরু করে দেয় এবং 'ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম কর', 'ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চাই না' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকে।

ফলে সমগ্র পরিবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা মঞ্চে পর্যন্ত ওঠে পড়ে এবং এ অবস্থায় দু'দল পরস্পর চেয়ার ছুঁড়তে থাকে। ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমদ মাইকে দাঁড়িয়ে বারবার বিক্ষোভকারীদের শান্ত হওয়ার আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু এতে কোনো শুভ ফল হয়নি। বরং এ সময়ে একদল ছাত্রসংঘ কর্মী লাঠি-সোটা নিয়ে সভাকক্ষে ঢুকে পড়ে এবং এক অনাহূত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

---

১২৭ দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ আগস্ট ১৯৬৯
১২৮ ঐ

ছাত্রলীগ ও ছাত্রইউনিয়ন উভয় দলের কর্মীরা এ সময় সংঘবদ্ধ হয়ে বাধা দিতে আসে এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর ছাত্রসংঘের কর্মীরা রেসকোর্সের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের-লেখক) দিকে পালাতে থাকে। সংঘর্ষে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি আবদুল খালেক, আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ইদরীস আলী, ছাত্রলীগ নেতা নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু প্রমুখ গুরুতরভাবে আহত হন।

এই সময়ে কলাভবনের ডীনের নেতৃত্বে একদল শিক্ষক সংঘর্ষ স্থলে পৌঁছলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে ওঠে এবং পুনরায় আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে ছাত্র নেতারা 'গুণ্ডাদের সভা পণ্ড করার চক্রান্তের তীব্র নিন্দা করেন এবং গণতন্ত্রের দুশমন এসব ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র আসন থেকে উচ্ছেদ করার শপথ নেওয়ার আহবান জানান। সভার অন্য এক প্রস্তাবে, নতুন একটি বিষয় যুক্ত করা হয়। এতে বলা হয় শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের সমবায়ে নতুন করে শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে বলা হয়, শিক্ষা যেহেতু একটি প্রাদেশিক বিষয় সেহেতু এসব কমিশন প্রথম হবে প্রদেশভিত্তিক।[১২৯]

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার পি. বি. জিলানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দিনের জন্য ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা-মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক সমন জারী করেন। সমনে আরো বলা হয়, 'কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী ঢাকা পৌরসভা এলাকার মধ্যে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও গুরুতর ছাত্র সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সকল ক্লাশ স্থগিত ঘোষণা করে।[১৩০]

ডাকসু আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় ইসলামী ছাত্রসংঘ যে হট্টগোলের সৃষ্টি করে তা তারা তাদের দেওয়া বিবৃতিতে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রাদেশিক শাখার সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খসড়া শিক্ষানীতি সম্পর্কিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণের দাবী জানানোর ফলে ছাত্র ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রী গুণ্ডাদের আক্রমণের ফলে দশজন ইসলামী ছাত্রসংঘ কর্মী আহত হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, একজন বক্তার ইসলামের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।[১৩১]

---

১২৯ দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ আগষ্ট ১৯৬৯
১৩০ ঐ
১৩১ ঐ

ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রচার সম্পাদকের স্বাক্ষরিত অপর একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সামসুদ্দোহা নামক একজন বক্তা ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। তখন ইসলামী ছাত্রসংঘ নেতারা সভায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে মুহূর্তে কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র বহু গুণ্ডাসহ ইসলামী ছাত্রসংঘের নিরীহ কর্মী ও সমর্থকদের আক্রমণ করে এবং নির্মমভাবে প্রহার করে।[১৩২]

এর মধ্যে ১৫ আগস্ট রাতে ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা আহত আবদুল মালেক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। তাঁর চিকিৎসার জন্য করাচী থেকে প্রখ্যাত ডাঃ জুম্মা খানকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। আবদুল মালেকের নামাজে জানাযায় বক্তারা, হত্যাকারীদের শাস্তি দানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান। তাঁরা বলেন, আবদুল মালেক পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম ও প্রকৃত শহীদ।[১৩৩]

১৭ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের ৬ জন ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে আবদুল মালেক হত্যায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, একটি বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে কিছু সংখ্যক ছাত্র গোলযোগ সৃষ্টি করলে তারই দুঃখজনক পরিণতি হিসাবে মালেকের মৃত্যু ঘটেছে। বিবৃতিতে তাঁরা আরো বলেন, এর আগেও বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণ্ডামী ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী ছাত্র নেতারা হলেন, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহ (ছাত্র ইউনিয়ন-মেনন), সামসুদ্দোহা ও নূরুল ইসমাম (ছাত্র ইউনিয়ন-মতিয়া), তোফায়েল আহমদ ও আ. স. ম. আবদুর রব (ছাত্রলীগ-তোফায়েল)।[১৩৪]

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবও একটি শোকবাণী দেন। এমনকি পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ একটি শোকসভাও করে। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া 'শোক সপ্তাহ' পালনের জন্য সকল ইসলামী জনতা বিশেষ করে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি আহবান জানায়।[১৩৫]

মালেক স্মরণে ইসলামী ছাত্রসংঘ ২৪ আগস্ট রোববার শপথ দিবস পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ছাত্রসংঘ আবদুল মালেক স্মরণে 'শহীদ মালেক স্মৃতি তহবিল' গঠন

---

১৩২ দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ আগস্ট ১৯৬৯
১৩৩ ঐ ১৭ আগস্ট ১৯৬৯
১৩৪ ঐ
১৩৫ ঐ

করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্মৃতি তহবিলে লাহোরের এক ব্যক্তি পাঁচ বৎসর কাল মাসিক ২৫ টাকা করে চাঁদা দানের কথাও ঘোষণা করে।[১৩৬]

এ সময় পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ কামাল লাহোর থেকে রোববার ২৪ আগস্ট ঢাকা এসে পৌছান। তিনি মালেক নিহত হওয়া সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে এক তথ্যানুসন্ধান সফরে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করবেন বলে জানান।[১৩৭]

রাওয়ালপিণ্ডির ছাত্র সমাজ, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে ছাত্রদের ব্যাপারে নাক না গলানোর আহবান জানায়। রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভানেত্রী মিস গাজালা শবনম বলেন, এ দলটি ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দিচ্ছে। মিস শবনম, মাওলানা মওদুদীকে যখন-তখন শক্তি প্রয়োগের পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেন।[১৩৮]

পাকিস্তান স্টুডেন্টস ওউন লীগ, জামাতে ইসলামীর হিংসাত্মক প্রচারণার সমালোচনা করে সম্প্রতি ঢাকায় আবদুল মালেকের মৃত্যুকে জামাতের তৎপরতারই পরিণতি বলে বর্ণনা করে। অপর একটি ছাত্র সংগঠন, লিবারেল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মালেকের মৃত্যুর জন্য জামাতের হিংসাত্মক নীতিকে দায়ী করে একটি বিবৃতি দেয়।[১৩৯]

শিক্ষানীতি নিয়ে বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি এর পরেও অব্যাহত থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের ৩টি সংগঠনের ৬ জন নেতা পুনরায় আরেক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্র সমাজ খসড়া শিক্ষানীতিকে সমর্থন করতে পারে না। কারণ এ খসড়া শিক্ষানীতিতে এমন বক্তব্য ও সুপারিশ রয়েছে যা আইয়ুব আমলের শিক্ষানীতির চেয়েও অগ্রহণযোগ্য। এ শিক্ষানীতিতে আর নতুন কলেজ খুলতে না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বাতিল করেছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব। পশ্চিম পাকিস্তানে ৩টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশের মতো বৈষম্যমূলক প্রস্তাবও করেছে।

বিবৃতিদাতারা বলেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে বলছি যে, শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র সম্মত ও সহজলভ্য করা হোক। ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম

১৩৬ দৈনিক পাকিস্তান, ২০ আগস্ট ১৯৬৯
১৩৭ ঐ
১৩৮ ঐ ২৩ আগস্ট ১৯৬৯
১৩৯ ঐ

বিরোধীতা নয়। কিন্তু একটি গোষ্ঠী বিশেষ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ইসলাম বিরোধীতা হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেশে উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।[১৪০]

এর পরদিন ৬ জন ছাত্রনেতার এ বিবৃতির বিরুদ্ধে পাল্টা বিবৃতি দেন ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম। তাঁরা বলেন, পাকিস্তানের মৌলিক আর্দশ ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। তাঁরা বলেন, এসব ছাত্রনামধারী ব্যক্তিরা গত ২০ বছরে ইসলামের প্রতি তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য এদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত হয়ে আছে।[১৪১]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) শিক্ষানীতি নিয়ে বিরাজমান পরিস্থিতিতে এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করে পুস্তিকা আকারে বের করে। এতে বলা হয়, 'নূর খানের শিক্ষানীতিতে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ বয়স্ক লোককে শিক্ষিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। এজন্য একটা তোগলকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাতীয় শিক্ষা বাহিনী (NLC) ইত্যাদি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। আমরা এই তোগলকী নীতি প্রত্যাখ্যান করেছি।... ছাত্র সমাজকে একাধিকবার নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'গিনিপিগ' করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে বলতে চাই যে আমরা পুনরায় 'গিনিপিগ' হতে চাইনা। শিক্ষার বিষয়ে পরীক্ষা চালানোর অবকাশ বর্তমানে নেই। যা করা দরকার তা খুব ভালভাবে চিন্তাভাবনা ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেই করা উচিত বলে আমরা মনে করি।[১৪২]

তিন বৃহৎ সংগঠনের যৌথ প্রচারপত্র

১২ আগস্ট শিক্ষানীতি বিষয়ক মুক্ত আলোচনায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ৩টি বৃহৎ ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) যৌথভাবে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে ইসলামী ছাত্রসংঘের বিরুদ্ধে তাদের মতাদর্শগত সংগ্রামকে তুলে ধরে। প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ

'দ্বিতীয় সামরিক সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ সমর্থন করিতে পারে নাই। সামরিক সরকারের প্রস্তাবিত

---

১৪০ দৈনিক পাকিস্তান, ২০ আগস্ট ১৯৬৯
১৪১ ঐ ২১ আগস্ট ১৯৬৯
১৪২ *শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, (পুস্তিকা)* পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৩, ২৭ (লেখকের কাছে এক কপি সংরক্ষিত)

শিক্ষানীতির সমর্থক ইসলামী ছাত্রসংঘ নামক একটি তথাকথিত ছাত্রপ্রতিষ্ঠান তাহাদের মুরুব্বী জামাতে ইসলাম নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং অথবা 'ইসলাম বিপন্ন' প্রভৃতি শ্লোগান তুলিয়া আইয়ুব-মোনায়েম আমলের মতই পুরাতন কায়দায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে বলগাহীন অপপ্রচার চালাইতে শুরু করিয়াছেন।… শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেশে বর্তমানে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে নস্যাৎ করিবার অপচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়।… সকলেই একথা জানেন যে, সরকার প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে খোলাখুলি মতামত প্রদানের আহবান জানান। এই অভিমত লিখিতভাবে সরকারের নিকট পেশ করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (DUCSU) উদ্যোগে বিগত ১২ আগষ্ট শিক্ষানীতির উপর একটি আলোচনা সভা (সেমিনার) আহবান করা হয়। এই আলোচনা সভায় যখন ভাষা বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল সে সময় ইসলামী ছাত্রসংঘের কতিপয় সদস্য আকস্মিভাবে গোলযোগ শুরু করে এবং বক্তা ও শ্রোতাদের আক্রমণ করে। …

ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রচার করিয়াছে যে সেমিনারে ইসলাম বিরোধী ভাষণ দেওয়া হইতেছিল এবং তাহাদের বক্তৃতা দানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাদের এই প্রচারণা সবই মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব সামসুদ্দোহা যখন শিক্ষানীতির বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন সে সময়ই তাহারা আক্রমণ করিয়া বসে। সেমিনারে বক্তৃতা করিবার জন্য সেমিনারের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের অনুমতি চাহিয়া তাহারা নিরাশ হইয়াছে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রসমূহে এমনকি প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকাসমূহেও প্রাকাশিত হইয়াছে। …

… আমরা মনে করি যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হয় নাই। এই শিক্ষানীতি কার্যকরী করা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পাইবে। … বিরোধিতা নয়, বরং সকল ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা ও প্রয়োজন মত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও চালু রাখা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই সকল বক্তব্যকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ইসলাম বিরোধী হিসাবে মিথ্যা প্রচার করিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট'।[১৪৩]

১৪৩ প্রচারপত্রটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেখুন পরিশিষ্টে। এতে স্বাক্ষর করেছিলন তোফায়েল আহম্মদ ও আ স ম আবদুর রব (ছাত্রলীগ), সামসুদ্দোহা ও নূরুল ইসলাম (ছাত্র ইউনিয়ন-মতিয়া), মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহ (ছাত্র ইউনিয়ন-মেনন)

এয়ার মার্শাল নূর খান প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে সারা পাকিস্তানব্যাপী তর্ক-বিতর্ক ও সংঘর্ষের এ পটভূমিতে রাওয়ালপিণ্ডিতে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তা কার্যকর স্থগিত রাখার এক সিদ্ধান্তের খবর পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ সংবাদের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষা দফতরের একজন মুখপাত্র তা অস্বীকার করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মহলের মতামতের ভিত্তিতেই পরে পর্যালোচনা করে খসড়া নীতিটি চূড়ান্ত করা হবে।[১৪৪]

২৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসলে ঢাকা বিমান বন্দরে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক ছাত্র অসন্তোষ সম্প্রর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সমস্যাগুলো তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। তিনি বলেন, যদি ছাত্ররা চায় তাহলে তিনি তাদের সাথে আলাপ করবেন। কারণ ছাত্ররা বিদেশী নয়, তারা আমাদেরই সন্তান।[১৪৫]

পুস্তক বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ, প্রত্যাহার ইত্যাদি প্রসঙ্গ

গণঅভ্যুত্থানের পর সামরিক সরকার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে গণবিরোধী ভূমিকার আশ্রয় নেয়। তাদের পছন্দ নয় এমন গ্রন্থ-পুস্তক তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে থাকে। অথচ সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মীরা যে সকল গ্রন্থ পাকিস্তানে পড়ানোর উপযুক্ত নয়, তার প্রতি সামরিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

বহু বির্তক ও লেখালেখির পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর ৮ আগস্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের পাঠ্যসূচী থেকে আইয়ুব খান রচিত 'প্রভু নয় বন্ধু' গ্রন্থটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গত দু বছর থেকে পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের পাঠ্যসূচীতে উক্ত বিতর্কিত গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪৬]

এ সময় একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেষে ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে সমস্ত বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়েছেন তার একটি সংকলন 'বাইশ থেকে চল্লিশ' নামে প্রকাশিত হয়।

---

১৪৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৪৫ ঐ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৪৬ ঐ ৮ আগস্ট ১৯৬৯

এর প্রকাশক হিসাবে নাম ছিল 'পাঠচক্র'-এর পক্ষে সিরাজুল আলম খান ও আমিনুল হক বাদশা।[১৪৭]

২৭ সেপ্টেম্বর সামরিক সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক হ্যাণ্ডআউটের বরাত দিয়ে বলে, পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে ভেবে সরকার আবুল কালাম আজাদ রচিত 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ' গ্রন্থখানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন। এর প্রকাশক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের সায়েদুর রহমান হলের মফিজুর রহমান।[১৪৮]

এরপর সামরিক সরকার একে একে বেশ কতকগুলি গ্রন্থ-পুস্তকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কোনো কোনো লেখক প্রকাশককে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হয়। এর মধ্যে কামরুদ্দিন আহমদ-এর 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইষ্টপাকিস্তান', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে তিরিশ বছর', বদরুদ্দীন উমরের 'সাংস্কৃতিক সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', সত্যেন সেনের উপন্যাস আল বেরুণী, আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মত বদমাস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩১ ডিসেম্বর পুলিশ ন্যাপনেতা আজাদ সুলতানের বাসভবন থেকে মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক মতবাদের উপর লিখিত রাজনৈতিক প্রচার- পুস্তিকা আটক করে।

পূর্ব পাকিস্তানের ত্রিশজন শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক এক বিবৃতিতে সামরিক সরকারের এসব কর্মকাণ্ডে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, চিন্তা ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি যে কার্যত লাঞ্চিত হচ্ছে নিষিদ্ধ করণের মধ্যে সেই অশুভ লক্ষণ সুস্পষ্ট। তারা গ্রন্হগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারেরও আহবান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ডঃ এনামুল হক, কবি জসিমউদ্দীন, সুফিয়া কামাল, আবু জাফর শামসুদ্দিন, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ।[১৪৯]

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা পুস্তক বাজেয়াপ্তকরণ ও কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, সাহিত্যের উন্নতির জন্য লেখকের স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য।[১৫০]

১৪৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ আগষ্ট ১৯৬৯
১৪৮ ঐ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৪৯ ঐ ৩ জানুয়ারী ১৯৭০
১৫০ ঐ ৭ জানুয়ারী ১৯৭০

৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, বাংলা একাডেমীতে লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির এক প্রতিবাদ সভা সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে তৎপর ২০টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এতে যোগদেয়। মুক্ত চিন্তা ও প্রকাশ করার অধিকারের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সভায় একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, সাঈদ আতিকুল্লাহ প্রভৃতি কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন। সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত লেখকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।[১৫১]

মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতিতে লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ১৩ জানুয়ারী মঙ্গলবার বিকেলে বায়তুল মোকাররমে কবি সাহিত্যিকদের একটি পথসভায় কবি জসিমউদ্দীন ও সুফিয়া কামাল বক্তৃতা করেন। তাঁরা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী জানান।[১৫২]

১৪ জানুয়ারী বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা সাহিত্যের উপর সরকারী হামলার প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রনেতা আল মুজাহিদী এতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন এন. এস. এফ নেতা ফজলুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) নেতা নূরুল ইসলাম, মেনন গ্রুপের নেতা আতিকুর রহমান সালু, বাংলা ছাত্রলীগের আবদুল মান্নান খান। বক্তারা লেখক কবিদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।[১৫৩]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গ্রন্থ নিষিদ্ধকরণ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানচর্চা নিষিদ্ধ করার সামিল। একে তাঁরা চিন্তা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার উপর অতর্কিত হামলা বলেও উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন শিল্পী ও কর্মী অনুরূপ বিবৃতি দেন। এতে স্বাক্ষর করেন খান আতাউর রহমান, জহির রায়হান, হাসান ইমাম, শবনম প্রমুখ।[১৫৪]

---

১৫১ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জানুয়ারী ১৯৭০
১৫২ ঐ ১৪ জানুয়ারী ১৯৭০
১৫৩ ঐ ১৫ জানুয়ারী ১৯৭০
১৫৪ ঐ

১৫ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমীতে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা। এতে সর্বস্তরের নবীন-প্রবীণ লেখক শিল্পীরা এতে যোগ দেন। ডঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস মনোরমা বসু, ডঃ এবি এম হাবিবুল্লা, ডঃ আহমদ শরীফ, সিকান্দর আবু জাফর, রনেশ দাশগুপ্ত এবং তরুণ লেখক আবেদ খান ও শওকত আনোয়ার, বক্তা ও শ্রোতারা মিলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গন বজ্র আওয়াজে প্রকম্পিত করে তোলে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহে বলা হয়:

১ প্রেস ও পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল

২ সকল বইয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

৩ সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহার

৪ রেডিও ও টেলিভিশন থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার

৫ সংবাদপত্রের উপর থেকে অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ ছাপ অপসারণ

৬ সাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশনার ডিক্লারেশনের মাধ্যমে পুলিশী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার

৭ এবং সপ্তম দাবীটি এদিন গৃহীত হয় পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যে: এতে বলা হয়, জনগণকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বি.এন. আর, লেখক সংঘ,পাকিস্তান কাউন্সিল, আর্টস কাউন্সিল, প্রভৃতি সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারকে সক্রিয় না থাকার দাবী সমূহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিকদলগুলোকে তাদের মেনিফেস্টোর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এদিন সরকার বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য বাংলা একাডেমীর পরিচালক কবীর চৌধুরীকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন, ড: মুহাম্মদ এনামুল হক, ড: কাজী দীন মুহম্মদ, ড: হাসান জামান ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ড: আশরাফ সিদ্দিকী।[১৫৬]

এরপর ধীরে ধীরে এ বিষয়ে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

---

১৫৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ জানুয়ারী ১৯৭০
১৫৬ ঐ

আল আকসা মসজিদে আগুন:
ছাত্রদের প্রতিবাদ

প্রাচীনতম পবিত্র নগরী জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে হঠাৎ করে ২৯ আগষ্ট (১৯৬৯) রাতে আগুন লেগে যায়। পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, এতে ইসরাইলের হাত রয়েছে। শত শত আরব তরুণ এর প্রতিবাদে গর্জে উঠলে ইসরাইলী সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি ছাত্রদের উপর নিক্ষেপ করে।[১৫৭]

সারা পাকিস্তানের রাজনৈতিকমহল ও ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন, ইহুদিরা যদি মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায় তবে বিশ্বের মুসলমানরা তাদের ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে মারবে। জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান যদি ভারতকে পরাজিত করতে পারে তাহলে ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ানের অপর চোখটি তুলে নিতে পারবেনা কেন?[১৫৮]

পিণ্ডির ছাত্রনেতারা এক বিবৃতিতে আল আকসা মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামাতের ভুমিকার নিন্দা করে বলে, এ দলটি আল আকসায় অগ্নি সংযোগের ঘটনার চেয়ে ছাত্রসংঘের নেতা আবদুল মালেকের হত্যার ব্যাপারটিতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) এর ৬ জন নেতা ইসরাইলের নিন্দা করে এক যুক্ত বিবৃতি দেয়।

ছাত্রলীগ (তোফায়েল) ও ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ৩০ আগষ্ট (১৯৬৯) এক যৌথ প্রতিবাদ সভা শেষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) ২৯ আগষ্ট মধুর রেস্তোরায় প্রতিবাদ সমাবেশ করে।

নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মোহাম্মদ কামাল মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে যুদ্ধ করতে পাকিস্তানী ছাত্রদের অনুমতি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

---

১৫৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ আগষ্ট ১৯৬৯
১৫৮ ঐ ৩০ আগষ্ট ১৯৬৯

জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া ও পাকিস্তান ছাত্র পরিষদ আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদের কর্মসূচী ঘোষণা করে। তারা সকল মহলকে এর প্রতিবাদে নেমে আসারও আহবান জানায়।

২৯ আগস্ট সকল মহলের সমর্থনে এ নিন্দনীয় সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রতিবাদে ও ইসরাইলী সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস কামনায় ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।[১৫৯]

বিহারী-বাঙালী দাঙ্গা: নতুন চক্রান্ত

১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান বৃটিশদের অধিনতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্তির পর হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশ বিহার-পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় হিযরত করে। ভারত থেকে যেসব মুসলমান পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে তাদের মধ্যে পশ্চিম বাংলা থেকে আগত বাংলাভাষীরা অচিরেই পূর্ব বাংলায় তাদের নিজ আসন গড়ে নেয় এবং এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে মিশে যায়।

কিন্তু বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত উর্দু ভাষী মুসলমানরা শেষ পর্যন্তও এ অঞ্চলের মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে নি। এ অঞ্চলের মানুষও তাদের আপন করে নিতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল ভাষা সমস্যা এবং এ ভাষার কারণেই মোহাজের বিহারী মুসলমানরা নিজেদের বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের চেয়ে উর্দু ভাষী পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে নিজেদের বেশী নৈকট্য অনুভব করতেন। এছাড়া, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬ দফার মাধ্যমে পূর্ব পকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক বৈষম্য তুলে ধরলে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সকল শোষণ-বঞ্চণা ও দু:খ-কষ্টের আকর হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানী ও তাঁদের এ প্রদেশের সমর্থক উর্দু ভাষী মাড়োয়ারী-বিহারীদেরই ভাবতে থাকে।

ঢাকাসহ প্রদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে উর্দূ ভাষী এ মোহাজের-বিহারীদের অবস্থান ছিল খুবই শক্তিশালী। প্রদেশের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ভাবে তাদেরই হাতে। ফলে বাঙালী মনে বিহারী বিদ্বেষ দিন দিন বাড়তেই থাকে। অন্যদিকে, উর্দু ভাষী বিহারীগণ বাঙালী জনমানসকে প্রথম থেকেই হীন ভাবতে থাকায় এ দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ চরমে রূপ পায়।

---

১৫৯ আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তানের ২৫ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্টের সংখ্যাসমূহ থেকে উদ্ধৃত

পূর্বে এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতো। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশের সাথে সাথে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ অনেকাংশে লোপ পায়। কিন্তু এ অঞ্চলে বিহারী-বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিভেদ নতুন করে দাঙ্গায় রূপ নিলে তা পূর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতোই ভয়াবহ রূপ নেয়।

দু:খের সঙ্গে লক্ষ করা যেতো, মোহাজের হয়েও বিহারী উর্দু ভাষীরা বাঙালীদের উপর আক্রমণাত্মক ভাবে চড়াও হতো। ঢাকা শহরে ছিল এদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। গুলিস্তানের একটি পানের দোকান থেকে ইসলামপুরের কাপড় ব্যবসা পর্যন্ত তাদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। এছাড়া তারা পাকিস্তানী শাসক চক্রের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের উপর ঢালাও নির্যাতন চালাতো। ঢাকা শহরের মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় তারা সরকার কর্তৃক দেয় জমিতে একচেটিয়া বসতি স্থাপন করে।

এমন একটা অবিশ্বাস ও অসম অবস্থার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায়ই বিহারী-বাঙালী দাঙ্গা লেগে যেত। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর বাঙালী জনসাধারণ পূর্বের তুলনায় আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে থাকে। অন্যদিকে ঢাকার বিহারীরা ছিল এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সুসংগঠিত। তাদের সাথে পেরে ওঠা বাঙালীদের জন্য ছিল অত্যন্ত দুষ্কর। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের পর একটি চক্র পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য পয়লা নভেম্বর (১৯৬৯) রাতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ঢাকা শহরে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করে। উভয় পক্ষের লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুন্ঠন ইত্যাদির মাধ্যমে শহরে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগণকে শান্ত থাকতে ও শান্তি বজায় রাখার আহবান জানিয়ে তাৎক্ষণিক পৃথক পৃথক বিবৃতি দেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, ওয়ালী ন্যাপের প্রাদেশিক শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা, জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সাবেক সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ। তারা গুণ্ডামী বন্ধ করে আইন-শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[১৬০]

পরদিন ৩ নভেম্বর (১৯৬৯) পূর্ব পাকিস্তানের ২২ জন নেতা সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা শহরে উচ্ছৃঙ্খলতা ও হিংসাত্মক ঘটনায় দু:খ প্রকাশ করেন। তাঁরা

---

১৬০ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা নভেম্বর ১৯৬৯

উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করে নিরীহ মানুষের দু:খ-কষ্টের অবর্ণনীয় চিত্র তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, ভাই ভাইকে হত্যা করার এ ঘটনা পাকিস্তানের আদর্শেই আঘাত করছে। মিথ্যা গুজবে কান না দেওয়ার জন্যও তাঁরা জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন তাজউদ্দীন আহমদ (আওয়ামী লীগ), অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ-ওয়ালী), আতাউর রহমান খান (ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগ), সাইদুল হাসান (ভাসানী ন্যাপ), ফরিদ আহমদ (পি.ডি.পি), শামসুল হক সিদ্দিকী (আঞ্জুমানে মোহাজেরিন), গোলাম আজম (জামায়াতে ইসলামী), খাজা খয়েরউদ্দীন (কাউন্সিল মুসলিম লীগ) প্রমুখ।

এদিন সরকার এক প্রেসনোটে বলে, দুর্বৃত্তদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে সেনাবাহিনী গুলো চালালে ১ ব্যক্তি আহত হয়। প্রেসনোটে আরো বলা হয়, মীরপুর, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, রায়েরবাজার, কমলাপুরে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় মোট ১৯ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। অনেককে মৃত অবস্থাতেই হাসপাতালে আনা হয়েছিল। গোলযোগের সাথে জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিউমার্কেটের কাছে দাঙ্গাকারীরা একটি গাড়ীতে এবং মোহাম্মদপুরে একটি পেট্রোল পাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১৬১]

৩ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, ভাইস এডমিরাল এস. এম আহসান প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে শহরে উপদ্রুত এলাকাগুলি সফর করেন। গভর্নর এ সময় বলেন, এ দাঙ্গার উৎপত্তি ও প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি একটি তদন্ত কমিশন গঠন করবেন।

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত গভর্নর হাউসে রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের নিয়ে গভর্নর দু'দফা বৈঠকও করেন। এতে অত্যন্ত খোলামেলা আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে দাঙ্গা এলাকায় পুলিশ ও ইপিআর (বর্তমানে এ বাহিনীর নাম বিডিআর - লেখক) বাহিনী পাঠানোর দাবী করা হয়। এ ছাড়া সারা শহরে ১৪৪ ধারা জারী না করে উপদ্রুত এলাকাসমূহে তা অব্যাহত রাখার আহবান জানানো হয়। যেসব নিরীহ মানুষকে এজন্য গ্রেফতার করা হয়েছে সভায় তাদের মুক্তি দাবী করা হয়।

---

১৬১ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ নভেম্বর ১৯৬৯

পরে গভর্ণর হাউস থেকে গভর্ণর ও রাজনৈতিক এবং ছাত্র নেতাদের সমভিব্যাহারে একটি শান্তি মিছিল নগরীর বিভিন্ন এলাকা পরিক্রম করে।[১৬২]

পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা পীর মোহসেনউদ্দিন দুদু মিঞা এক বিবৃতিতে বলেন, দেশ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছিল, তখন স্বার্থান্বেষী মহল চক্রান্ত করে এসব দাঙ্গার সৃষ্টি করছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতারাও অনুরূপ বিবৃতি দিয়ে জনগণকে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) এ উপলক্ষে শহরে একটি প্রচারপত্র (লিফলেট) বিলি করে। এতে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে একটি প্রতি-ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে এসব দাঙ্গা প্রথমে ঢাকা শহরে, পরে সারা প্রদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রচারপত্রে বলা হয়, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এ দুস্কৃতকারীরা মীরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় উস্কানী দিয়ে আসছিল, কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি বলেই পয়লা নভেম্বরের রাতের দু:খজনক হত্যা ও লুন্ঠনের মতো ঘটনা ঘটতে পেরেছে। এতে আরো বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার ফিরিয়ে আনা, ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন তা বানচাল করার উদ্দেশ্যে এসব ঘটনা ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িকতার রেশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রচারপত্রে প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠন করে দাঙ্গা প্রতিরোধের আহবান জানানো হয়।

মাওলানা ভাসানী ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেন, সি আই এ এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভারতের ইঙ্গিতে জামায়াতে ইসলামী এসব ঘটনা শুরু করেছে। তিনি বলেন, গত দু'বছর ধরে এ দলটি দু'প্রদেশের মধ্যে উত্তেজনাকর বক্তব্য, বিবৃতি ও প্রচারপত্র বিলি করে বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। তাদের উস্কানীমূলক কার্যকলাপই দাঙ্গা বাধাতে সাহায্য করেছে।[১৬৩]

পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম ৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে ঢাকায় দাঙ্গার জন্য জামায়াতে ইসলামী দায়ী এমন ঘটনা প্রমাণের

১৬২ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ নভেম্বর ১৯৬৯
১৬৩ ঐ ৫ নভেম্বর ১৯৬৯

জন্য মাওলানা ভাসানীর প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ঢাকা শহর যখন শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর, তখন ১০ দিন যাবৎ মাওলানা ভাসানী ও তার দালালরা চীনের টাকা খেয়ে বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র বিলি করছে। তিনি বলেন, এসব দলিল তার কাছে রয়েছে।[১৬৪]

শহরের বিভিন্ন স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ নভেম্বর শান্তি সমাবেশ ও শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটিও গঠিত হয়। পাকিস্তান শান্তি কমিটি, ইনসাফ পার্টি ও পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস (আজিমপুর গ্রুপ) এর উদ্যোগে ৭ নভেম্বর শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পর বায়তুল মোকাররম থেকে একটি নীরব মিছিল বের হয়।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি.ডি.পি) শান্তি বাহিনী গঠন করে।

আওয়ামী লীগ দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফ ক্যাম্প খুলে রিলিফ বিতরণের ব্যবস্থা করে।[১৬৫]

কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও এম.ডি.এম বদরুদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র কর্মীরা ৫ নভেম্বর মীরপুর, মোহাম্মদপুর-এর দুর্গত এলাকা সফর করে জনসাধারণের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, দাঙ্গাকারী দুস্কৃতকারীরা বাঙালীও নয়, বিহারীও নয়, ওরা কায়েমী স্বার্থবাদী।[১৬৬]

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী-বিহারীদের মধ্যে অশান্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কালে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক নির্ধারিত সফরে লণ্ডন অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর সফর অসমাপ্ত রেখে ৮ নভেম্বর ঢাকা ফিরে এসে তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, গত দু'মাস ধরেই একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী এ দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছিল। সকলেই ব্যাপারটা জানেন।

---

১৬৪ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ নভেম্বর ১৯৬৯
১৬৫ ঐ
১৬৬ ঐ ৭ নভেম্বর ১৯৬৯

কারা দায়ী সরকারও তা জানেন। তিনি অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবী জানান। বঙ্গবন্ধু এর পরপরই আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে মীরপুর, মোহাম্মদপুর ও তেজগাঁও এলাকার দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবারদের সাথে কথা বলতে যান।[১৬৭]

১০ নভেম্বর সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমদ, আবদুর রব, মোস্তফা জামাল হায়দার, সামসুদ্দোহা, নূরুল ইসলাম, ইব্রাহিম খলিল, মাহবুবউল্লাহ, ফখরুল ইসলাম প্রমুখ এক যুক্ত বিবৃতিতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক, রিকসাচালক, ছোট দোকানদারদের পুর্নবাসনের দাবী জানান। তাঁরা দাঙ্গাকারী দুস্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তি দানেরও আহবান জানান।[১৬৮]

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মূল্যায়ন

উনসত্তর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল জাতীয় জীবনের গণঅভ্যুত্থানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করে। এরফলে আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার দিকগুলি এবং সংগঠনগুলির যার যার দৃষ্টিভঙ্গী এতে পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭১ এক প্রস্তাবে ১১ দফার রাজনৈতিক মূল্যায়ন করে বলে যে, যারা ১১ দফার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রচার করছে তারা সত্যি কথা বলছেন না। কারণ ১১ দফার আন্দোলন ব্যর্থ হলে শেখ মুজিব মুক্তি পেতেন না এবং দেশে সাধারণ নির্বাচনও হতো না।[১৬৯]

বস্তুত শেখ মুজিবের মুক্তি এবং একটি সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা প্রাপ্তির মধ্যেই ছাত্রলীগ ১১ দফা আন্দোলনের মৌল সফলতা খুঁজে পায়।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত রাওয়ালপিণ্ডিতে ঐতিহাসিক গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি ১১ দফা আন্দোলনের মৌল দিকগুলি কিন্তু চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে বলেন:

---

১৬৭ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ নভেম্বর ১৯৬৯
১৬৮ ঐ ১০ নভেম্বর ১৯৬৯
১৬৯ ঐ ২৫ জানুয়ারী ১৯৭১

'কোন্ সব মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দেশে আজ গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়া গেল তা নির্ণয় করিয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তবে তাহার চাইতে বিপর্যয়কর আর কিছু হইতে পারে না।.... পরিস্থিতি আজ সুস্পষ্ট রকমে অতীব গুরুতর। তাই আপাতমধুর বা আধাআধি কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান কোনক্রমেই সম্ভব নহে।....জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কন্ঠে যে সব দাবী-দাওয়া আজ ধ্বনিত হইতেছে, যত্ন সহকারে সেগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মূলে মাত্র তিনটি মৌল প্রশ্ন নিহিত। প্রথমটি হইল, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার অবলুপ্তি। দ্বিতীয়টি সীমাহীন অর্থনৈতিক অন্যায় অবিচার—যাহার ধকল পোহাইতে হইতেছে এদেশের শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ- মোটকথা আপামর জনসাধারণকে।..... তৃতীয় কারণটি হইল, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি সমানে অবিচার করা হইতেছে, এই উপলব্ধি।.....

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবিচারের প্রশ্নটিরও প্রতিফলন ঘটিয়াছে ছাত্র সমাজের রচিত ১১ দফা কর্মসূচীতে। এ প্রশ্নে তাহারা দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠনের জন্যও সুস্পষ্ট দাবী উত্থাপন করিয়াছে।....

সমাজব্যবস্থাকে সুষম খাতে ঢালিয়া সাজাইতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিকে অবিচার-অনাচারমুক্ত করার অনিবার্যতা ফুটাইয়া তুলিবার মত জোড়াল ভাষা আমার নাই। ছাত্রদের যে ১১ দফা কর্মসূচীর প্রতি আমি সমর্থন জানাইয়াছি তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা পদ্ধতি পুণর্বিন্যাসের যথোপযুক্ত প্রস্তাব রহিয়াছে। এ দাবী তাহারা তুলিয়াছে অর্থনৈতিক অবিচারের নিশ্চয়তা বিধানেরই মানসে'।[১৭০]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে এবং প্রচারের জন্য আলাদাভাবে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে। ছাত্র ইউনিয়নের মূল্যায়নে বলা হয়:[১৭১]

'....পূর্ব বাংলায় গণঅভ্যুত্থান গড়ে উঠেছিল মূলত আইয়ুব স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এগার দফার মত একটি বামপন্থী ইতিবাচক কর্মসূচীর ভিত্তিতে।...

---

১৭০ *গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ* (পুস্তিকা), (প্রকাশক, আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, ২৫ জুন ১৯৬৯, মূল্য; ১০ পয়সা) পৃষ্ঠা ১-৬

১৭১ বিস্তারিত মূল্যায়নটি *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড-গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত রয়েছে

আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ.....ছয় দফাকে বাঙ্গালী জাতির মুক্তি সনদ হিসাবে প্রচার করছিলেন।.... আর মেননপন্থী উপদলীয় ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুরা আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে 'সি.আই.এ-র ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেন..... আমাদের সংগঠন একথাই বলেছে যে কেবল স্বায়ত্বশাসন অর্জ্জন করলেই ছাত্র জনতার জীবনে সুখ সমৃদ্ধি আসবে না.... ৬ দফা কর্মসূচী সে দিক থেকে ছিল অসম্পূর্ণ।.....

আমাদের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতেই সংকীর্ণ ৬ দফা কর্মসূচীর উর্দ্ধে ১১ দফা কর্মসূচী রচিত হয়েছে।....এ সময় পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ যথা আওয়ামী লীগ ও দুইটি ন্যাপ যদি এগার দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সংগ্রামে এসে দাঁড়াতেন তবে পূর্ব বাংলার গণঅভ্যুত্থান আরও বেশী সংগঠিত ও তীব্রতর রূপ লাভ করতে পারত।....

শ্রমিক ভাইরা আমাদের আহবানে সাড়া দেন এবং লড়াইয়ে নেমে আসেন। কিন্তু.... রাজনৈতিক কর্তব্য কি করতে হবে তা বুঝতে পারেন নাই। কৃষক ভাইরাও সংগ্রামে নেমে আসেন।... ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে পরিস্থিতিকে আয়ত্বে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।.....

এসব দুর্বলতা সত্বেও গণঅভ্যুত্থানের ফলে যা পাওয়া গিয়াছে-তার মূল্য কম নয়। একনায়কত্বকে উচ্ছেদ কখনই একটি সামান্য বিজয় হিসাবে মনে করা চলে না।....

এখনকার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এগার দফা কর্মসূচীর প্রকৃত মূল্যায়ন করা দরকার।... সিয়াটো, সেন্টো ত্যাগ ও স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি কায়েম করলেই সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ উচ্ছেদ হয়ে যায় না। সামন্তবাদের উচ্ছেদের জন্য ভূমি ব্যবস্থার বিপ্লবী সংস্কার, জমির সিলিং নির্ধারণ ও ভূমিহীন গরীব চাষীদের মধ্যে জমি বন্টণের দাবী এগার দফায় নাই। তাই এগার দফার কর্মসূচীকে বিপ্লবী মুক্তি সনদ মনে করার কোন কারণ নাই'।[১৭২]

ছাত্রইউনিয়ন (মেননপন্থী) কোনো উপদলেরই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান মূল্যায়নের দলিল পাওয়া যায় নি। তবে বিভিন্ন সময়ের প্রচারপত্র ও রাজনৈতিক প্রস্তাবে এ

১৭২ গণঅভ্যুত্থানকে বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে নিতে হবে (পুস্তিকা) (কেন্দ্রীয় সংসদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, আ. ক. ম. জাহাঙ্গীর, প্রচার সম্পাদক, ৩১/১ হোসেনী দালান, ঢাকা-১ থেকে প্রচারিত, ১৭.০১.৭১, মূল্য: পনের পয়সা), পৃষ্ঠা ২-৮

সম্পর্কিত বিভিন্ন মূল্যায়নের তথ্য পাওয়া যায়। দোসরা অক্টোবর (১৯৭০)–এ পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্রইউনিয়ন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করে তাতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, 'এই গণঅভ্যুত্থান সমগ্র আন্দোলনকে উন্নীত করিয়াছে এক নতুন বিপ্লবী স্তরে'।[১৭৩]

তবে এ ধারার সাথে যুক্ত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ঊনসত্তরের মে মাসেই প্রচারিত একটি দলিলে গণঅভ্যুত্থানের মূল্যায়ন করে। দলিলে উল্লেখ করা হয়:[১৭৪]

'.....শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র এ'রকম নাজেহাল, বিকল ও বিপর্যস্ত বৃটিশ শাসনের দু'শ বছরে এবং পাকিস্তানের ২২ বছরে আর কোনদিন হয়নি।...

বহু জায়গায় কৃষকরা ছাত্রদের সহযোগিতায় বা সমর্থনের ভরসায় গরুচোরদের হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে,...তাদের খুন করেছে।...

ছাত্র নেতৃত্বের দুর্বলতা ছিল এই যে, তা সামন্তবাদ বিরোধী ছিল না, ছিল মূলত আমলাতন্ত্র বিরোধী, শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রবিরোধী, এর মূল তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণ এই যে, গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের প্রধান অংশ জোতদার ও ধনী কৃষক শ্রেণী উদ্ভুত এবং আর একাংশ মাঝারি কৃষকদের সন্তান–সন্ততি।... দ্বিতীয়ত ছাত্রদের চরিত্র জাতীয় ধনিক চরিত্র।.... তৃতীয়ত উপরোক্ত কারণে ছাত্রদের ব্যাপক অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়।....এই কারণে ছাত্র আন্দোলন বা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল না।

ছাত্র আন্দোলন বা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবর পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ সমর্থক ৬ দফাকামী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।....

গরীব মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিলেও আন্দোলন সাধারণভাবে যে পর্যায়ে গিয়েছিল তাতে শ্রেণী সংগ্রাম যে কোন সময়ের চাইতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছেছিল।....

---

১৭৩ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড (তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২) পৃষ্ঠা ৫৪৮ (পরে শুধু 'স্বাধীনতার দলিল' উল্লিখিত)

১৭৪ এ মূল্যায়নটির বিস্তারিত রয়েছে বা. ছা. আ. ই–এর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে

....শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চেয়েছিল, নিজের অভাব-অভিযোগের, দুঃখ-দারিদ্রের প্রতিকার আশা করেছিল।

শেখ মজিবর কি সে আশা পূরণ করেছিল? তার দল আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের এবং তাদের দৃঢ় সমর্থক মস্কোপন্থীদের দ্বারা কি সে আশা পূরণ হতে পারতো?....

....শ্রেণীগত কারণ ও প্রয়োজনে শেখ মজিবর যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে তাতে শাসক গোষ্ঠীর কোন সন্দেহ ছিল না।.....

এই 'মহান' কাজের বিরোধীতার জন্য ধনিক ও সামন্ত দলগুলি এবং তাদের বশংবদ মস্কোপন্থীরা আমাদের কী—না বলেছে? যেন আমরা তাদের পাকা ধানে মই দিচ্ছি। গোলটেবিলে যোগদানের বিরোধীতা করে কি আমরা ভুল করেছিলাম?....

আন্দোলনের পথেই কি শেখ মজিবরের হাত সবচেয়ে বেশী ও ভালভাবে শক্তিশালী হত না? গোলটেবিলে সমগ্র পূর্ব বাংলাকে নিয়ে গেলেও আমাদের হাত শক্তিশালী হত না। কেবলমাত্র বন্দুকের জোরেই হাত শক্তিশালী হয়।....

ছাত্রদের ব্যাপক অংশ গোলটেবিলে যোগদানের পক্ষপাতি ছিল। কারণ তারা আর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারছিল না.....

....তিনটি মূল কারণের জন্য এবারকার বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারল না।....একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি ২. একটি বিপ্লবী মুক্তিফ্রন্ট এবং ৩. জাতির সামনে জনগণের রাষ্ট্রের একটি কর্মসূচী উপস্থাপন'।[১৭৫]

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গণঅভ্যুত্থানের মূল্যায়ন করে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি একটি পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট তৈরী করে। রিপোর্টে বলা হয়:[১৭৬]

---

১৭৫ মেসবাহ কামাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৭-১৪৬
১৭৬ রিপোর্টটির খসড়া মোহাম্মদ ফরহাদ তৈরী করেছিলেন বলে তাঁর নামে থিসিসটির পূর্ণাঙ্গ সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মত আর একটি ঘটনা আগেও না, আজও না—আর কখনো ঘটেনি। এই গণঅভ্যুত্থান আইয়ুবের মত 'লৌহ-মানব' ডিক্টেটরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছেড়ে দিয়েছিল।...এটা ছিল পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম। কয়েক বছরের একটানা লাগাতার রাজনৈতিক লড়াইয়ের চূড়ান্ত হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল এই গণঅভ্যুত্থান।...

পূর্ব বাংলায় এই অভ্যুত্থান এক বিপ্লবী অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। আইয়ুব সরকার নিরংকুশভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিরোধী দলগুলোর সাথে রাজনৈতিক আপোষে আসতে বাধ্য হয়।....

আগরতলা মামলা তুলে নেয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম মনোভাব সৃষ্টি হয় যে, আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যেও একই রকম মনোভাব দেখা দেয় যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজয় সূচিত হয়েছে।....

শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলনে গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এটাই হলো মূল কারণ, যার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বাহ্যিকভাবে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়।....

পার্টি থেকে সে সময় দুই ন্যাপ ও আওয়ামী লীগকে ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় এবং বাইরেও এ ধরনের ঐক্যের শ্লোগান উত্থাপন করা হয়। কিন্তু ভাসানীপন্থী ন্যাপ তাদের 'নির্বাচন বিরোধী' নীতি ত্যাগ করতে রাজী ছিল না এবং আওয়ামী লীগ এই কারণেই ভাসানীপন্থীদের নিয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের বিরোধিতা করছিল।.....

পার্টি একই সঙ্গে 'গোলটেবিল ও সংগ্রাম' অব্যাহত রাখার নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পেরেছিল বলেই কমরেড মণি সিংহসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহার সম্ভব হয়েছিল।...

আওয়ামী লীগ এই গণ-অভ্যুত্থানের বিকাশে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং এই কারণে ন্যাপের সাথে সমঝোতাও রক্ষা করে চলেছিল। আওয়ামী লীগ এই গণ-অভ্যুত্থানে দক্ষিণের বিরুদ্ধে স্থান নিয়েছিল এবং বিশেষত গোলটেবিলের বিশ্বাসঘাতকতার পর দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামও শুরু করেছিল।

আওয়ামী লীগ ১১-দফা দাবী সমর্থন করেছিল। এরা ভাসানী ন্যাপ ও উগ্র বামপন্থীর বিরোধিতাও করেছিল।.....

কিন্তু অপর দিকে আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্বের কতকগুলি মারাত্মক দুর্বলতা....ক্ষমতার প্রশ্নে নিজ দলীয় কর্মসূচী ও মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ঝোঁক, উগ্র জাত্যাভিমান, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ সম্পর্কে মোহ, গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলনের বিরোধিতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।....ক্ষমতা দখলের জন্য বিকৃত সমাজতন্ত্র প্রচার ও দরকার হলে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারণা শুরু করতেও এদের দ্বিধা হবে না।.....একথা বলা যায় যে, আইয়ুব শাসনামলে অনেক ঝড়-ঝাপটা ও অত্যাচার সহ্য করেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অতীতের দুর্বলতাসমূহ দূর হয় নি। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং জনগণও সচেতন হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এটা হিসেব করে চলে। এরফলেই আওয়ামী লীগকে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পরিবর্তিত মনে হয়।....

কিন্তু একটি স্থানে আওয়ামী লীগ মারাত্মকভাবে দুর্বল। জনগণ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রভাব হারাতে রাজী নয়। এজন্যই শেখ মুজিব ১১-দফার সমর্থক হন।.....

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, দুর্বল ও দোদুল্যমান পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের অধীনে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক বিপ্লব কখনই তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না।....

এবার গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম থেকেই মাওলানা ভাসানী ও তাঁর দল প্রকাশ্যে আইয়ুব-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং প্রধানত সঙ্কীর্ণ জাতীয় শোভেনিজমের আওয়াজ তোলেন।.....সারাদেশের মানুষ যখন ঐক্যফ্রন্টের পক্ষে, মাওলানা ভাসানী ও তাঁর দল তখনও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার ভয়ে ভীত না হয়ে , ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করেন।......তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম থেকেই গণ-আন্দোলনের নামে উগ্র ও হঠকারী শ্লোগান ও কার্যকলাপ চালাতে থাকেন।.....

প্রকৃতপক্ষে মাওলানা ভাসানী ও তাঁর দলের কার্যকলাপ ও 'দালাল-উস্কানিদাতার' কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য টানা সম্ভব নয়।

শ্রমিকদের আন্দোলনের নামে এরা শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন....কৃষক সমাজকে.....'কৃষি বিপ্লবের নামে হঠকারী 'জ্বালাও-পোড়াও' নীতি কার্যকর করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁরা আসলে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী আন্দোলনের প্রতি শত্রুতা করেছেন।...

এটা দুঃখজনক যে, মাও সে তুঙ-এর সমর্থক পার্টি ও বিভিন্ন উপদলগুলি মাওলানা ভাসানীর নীতির প্রতি কেবল সমর্থনই জানায়নি, বরং এ সকল নীতি ও কার্যকলাপকে নির্ভুল বিপ্লবী লাইন হিসেবে প্রচার করেছে।

গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী ও 'মাও'পন্থী চীনাপন্থীদের নীতি ছিল আসলে ট্রটস্কিবাদী নীতি। ট্রটস্কিবাদী নীতির দ্বারা তারা গণ-আন্দোলনের কার্যত ক্ষতি করবার পথই গ্রহণ করেন।....

...পূর্ব বাংলার গণ-অভ্যুত্থান ও ১১ দফার সংগ্রাম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ও সাম্রাজ্যবাদীদের সকল হিসেব গরমিল করে দেয়। কারণ ১১ দফার কর্মসূচী একটি বিকল্প বামপন্থী কর্মসূচী।... আইয়ুবকে অপসারণ করে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মাধ্যমে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলি ক্ষমতা দখল করবে এই সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়।....

এই প্রথমবার পূর্ব বাংলার গণ আন্দোলন একটি বামপন্থী কর্মসূচীতে বিকাশ লাভ করেছে। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্ব বহণ করছে।.....

জনগণের জীবনের মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ব্যাপক প্রচারের পরিবেশ গড়ে তুলেছে এই অভ্যুত্থান।......

এই অভ্যুত্থান পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী জনগণকে প্রগতিশীল বিশ্বে মর্যাদার আসনের অধিকারী করেছে। এই গণ-অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটা দীর্ঘ পাঁচ মাস (নভেম্বর থেকে মার্চ) ব্যাপী সারা পাকিস্তানে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে।.... পাকিস্তানে এর আগে এভাবে দীর্ঘকালব্যাপী আর কোন আন্দোলন হয় নি।

আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে.... একটা মরণপণ মনোভাব সকলের মধ্যেই বিরাজ করছিল।....এই সংগ্রামে শহীদের সংখ্যা সাধারণ হিসেবে ৬০০ জন।....

এই অভ্যুত্থানে বারবার হরতাল পালন, একটানা কারফিউ ইত্যাদি চলার ফলে...মেহনতি জনসাধারণকে অশেষ দুর্গতি ও অর্থনৈতিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু জনগণ এটা খুশী মনে সহ্য করেছে।.....

এই আন্দোলনে ছাত্র সমাজ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। গ্রামাঞ্চল থেকে শহর অঞ্চল সর্বত্র ছাত্ররাই আন্দোলনের প্রধান কর্তৃত্ব ও নেতা হিসেবে সর্ব শ্রেণীর মানুষের কাছে মর্যাদা লাভ করেছে'।[১৭৭]

১১ দফা আন্দোলনের সর্বশেষ শহীদ

রাজশাহীর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আবদুস সাত্তার ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী মিছিলে অংশ নেয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) এমনি এক মিছিলে পুলিশের গুলীতে আহত হয়ে সাত্তার হাসপাতালে নীত হয়। দীর্ঘ ৭ মাস মৃত্যুর সাথে লড়াই করে সে ২৪ আগস্ট (১৯৬৯) হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে ১১ দফার শেষ শহীদ হিসেবে তার নামকে তালিকাভুক্ত করে।

এ খবর ঢাকায় এসে পৌঁছলে ছাত্রমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। অথচ কেউ খবর রাখতো না মহান গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিতে গিয়ে একজন গুলী খেয়ে এরপরও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্রইউনিয়ন (মেনন)-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ এক যুক্ত শোকবাণীতে সাত্তারের আত্মত্যাগে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।[১৭৮]

এগার দফা আন্দোলনের এক বছর পূর্তি

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনের সর্বশেষ দুঃখজনক পরিণতির পটভূমিতে গত বছরের গড়ে ওঠা ১১ দফা আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। শুধু যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে গেল তাই নয়, প্রায় প্রতিটি ছাত্রদলই (একমাত্র ছাত্রইউনিয়ন মতিয়া ব্যতীত) তাদের সম্মেলনকে কেন্দ্র

---

১৭৭ মোহাম্মদ ফরহাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩-১১৯
১৭৮ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ আগস্ট ১৯৬৯

করে আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছাত্র প্রভাব কমতে থাকে এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের প্রভাব বাড়তে থাকার কারণে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের পিতৃদলের রণকৌশলের শিকার হয়ে পড়ে। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অব্যাহত ভাঙন, আন্তঃবিরোধ, কলহ এবং আন্তঃদলীয় মতাদর্শগত লড়াই তীব্র হতে থাকে।

এ অবস্থার মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র সংগঠন ১৭ জানুয়ারী থেকে ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত ১১ দফা সপ্তাহ পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সপ্তাহের কর্মসূচীর মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাল পতাকা উত্তোলন, ছাত্রসভা, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, শহরের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিফলক স্থাপন, চিত্র প্রদর্শন, প্রভাত ফেরী, বিক্ষোভ মিছিল ও পল্টনে জনসভা ও গণসঙ্গীতের আসরের কথা ঘোষণা করে।[১৭৯]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ১১ জানুয়ারী (১৯৭০) সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ১৭ জানুয়ারী থেকে ২৩ জানুয়ারী পর্যন্ত এগার দফা সপ্তাহ এবং ২৪ জানুয়ারী গণঅভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানায়। এ উপলক্ষে প্রচারপত্র বিলি, পোস্টার, মিছিল, খণ্ড মিছিল, শহীদ স্মরণে কাল পতাকা উত্তোলন, কাল ব্যাজ ধারণ, প্রভাত ফেরী প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে।[১৮০]

১২ জানুয়ারী সোমবার, ছাত্রইউনিয়ন মেনন ও মতিয়া গ্রুপ, এন.এস.এফ (দুলন গ্রুপ)এবং বাংলা ছাত্রলীগ (আলমুজাহিদী) ঐক্যবদ্ধভাবে ২৪ জানুয়ারী গণঅভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি দেয়।

১৪ জানুয়ারী সংবাদপত্রে উপরিউক্ত ৪ সংগঠনের বিবৃতি প্রকাশিত হলে ১৫ জানুয়ারী ছাত্রলীগ (তোফায়েল) তাদের এককভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে আরেকটি সমান্তরাল কর্মসূচী গ্রহণ করে। পূর্বে ছাত্রলীগের ১১ দফা সপ্তাহ ছিল ১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে এ কর্মসূচী তারা আরো একদিন বাড়িয়ে দিয়ে বলে কর্মসূচী ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, শত শহীদের রক্তে স্নাত জনতার দুর্বার সংগ্রামের চিহ্নবাহী জানুয়ারী মাস আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ১১ দফার প্রধান দাবী স্বায়ত্বশাসন এখনো আদায় হয় নি। তাই এই দাবী আদায়ে অতীতের সেই

১৭৯ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জানুয়ারী ১৯৭০
১৮০ ঐ ১১ জানুয়ারী ১৯৭০

সংগ্রামী দিনগুলোকে আরো সংগ্রাম মুখর করে তোলার জন্য ১১ দফা সপ্তাহের সমস্ত কর্মসূচীকে সফল করতে হবে।[১৮২]

১৭ জানুয়ারীতে সংবাদপত্রে জানানো হয়, শুধুমাত্র ২৩ ও ২৪ তারিখের কর্মসূচী ছাত্রইউনিয়ন উভয় গ্রুপ, এন. এস. এফ দুলন গ্রুপ ও বাংলা ছাত্রলীগ যৌথভাবে পালন করবে। অন্যান্য দিনে যার যার সংগঠনের কর্মসূচীই পালিত হবে।

১৭ জানুয়ারী ছিল শনিবার। এদিন ঢাকা শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা কাক-ডাকা ভোরে ওঠে নিজ নিজ শিক্ষায়তনে কাল পতাকা উত্তোলন করে এবং কাল ব্যাজ পরিধান করে। ছাত্র-ছাত্রীরা এরপর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শহীদ মিনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগমন করে। স্কুলের ছোট ছোট বালক-বালিকারাও পায়ে হেটে এসব কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ১০-৩০ মি. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হয় এবং গণঅভ্যুত্থানের উপর একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শহীদ মতিউরের পিতা আজাহার আলী খান। ১১ টায় তারা শপথ গ্রহণ করে এবং একটি শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। বিকাল তিনটায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ছাত্রইউনিয়নের কর্মীরা ২৪ জানুয়ারী হরতাল আহবান করে পথসভা ও খণ্ড মিছিল বের করে।

ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন সংগ্রাম পরিষদ সকাল ১১টায় বটতলায় ছাত্র সমাবেশ করে শোভাযাত্রা সহকারে শহীদ মিনারে যায় এবং শপথ নেয়। বটতলার সমাবেশে এক প্রস্তাবে একুশে ফেব্রুয়ারীতে সরকারী ছুটি ঘোষণা দাবী করা হয়।

মধুর কেন্টিনে ছাত্রইউনিয়ন মেনন ও বাংলা ছাত্রলীগ যৌথভাবে সমাবেশ করে। এ সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে ১১ দফা আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য প্রতিটি গণতান্ত্রিক কর্মীর প্রতি আহবান জানান হয়। নিরাপত্তাআইনে আটক দেবেন শিকদার, শহীদুল্লাহ, ফজলুল কবীর সহ সকল বন্দীর মুক্তি ও হুলিয়া প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৮৩]

---

১৮১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ জানুয়ারী ১৯৭০
১৮২ ঐ ১৫ জানুয়ারী ১৯৭০
১৮৩ ঐ ১৮ জানুয়ারী ১৯৭০

১১ দফা সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি জসীমউদ্দীন। বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ রেহমান সোবহান, রনেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভায় ঘোষণা করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের মূল রাজনৈতিক দাবী হচ্ছে, স্বায়ত্তশাসন ও সমাজতন্ত্র। এই স্বায়ত্তশাসন কেবলমাত্র রাজনৈতিক অবিচার আদায়ই নয়, এই স্বায়ত্তশাসন হল শোষণমুক্ত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ।[১৮৪]

১৯ জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সমর্থিত বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে প্রচারিত কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেয়। এ কর্মসূচীতে নতুন করে ২৫ জানুয়ারী পল্টনে জনসভার কথা ব্যক্ত করা হয়।

২০ জানুয়ারী মঙ্গলবার, শহীদ আসাদ দিবসে ছাত্রইউনিয়ন (মেনন), ভাসানী ন্যাপ, কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ ডাকে সারা প্রদেশে ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বিকালে প্রাদেশিক ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহার সভাপতিত্বে পল্টনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, আমরা তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র চাই না, আমরা চাই জনগণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা। তাই ভোটের রাজনীতির বদলে সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই।

এ দিন (২০ জানুয়ারী) ছিল ১১ দফা সপ্তাহের চতুর্থ দিবস। ছাত্রলীগ ও তাদের সংগ্রাম পরিষদ-এর উদ্যোগে শহীদ মিনারে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শহীদ সার্জেন্ট জহরুল হকের পিতা জনাব মুজিবুল হক। তোফায়েল আহমদ এতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জাতীয় আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণের দাবী জানান।

ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) এ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এক ছাত্রসভা করে। এতে সামসুদ্দোহা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, মাওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, মিয়া মোমতাজ দৌলতানার কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে।

---

১৮৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ জানুয়ারী ১৯৭০

আল মুজাহিদীর সভাপতিত্বে বটতলায় ছাত্রইউনিয়ন মেনন ও বাংলা ছাত্রলীগেরও একটি ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।[১৮৫]

এন. এস. এফ (দুলনের) আয়োজিত আলোচনা সভায় এস. এম. হলের প্রভোস্ট ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর ও দৈনিক পাকিস্তানের চীফ রিপোর্টার আলী আশরাফ যোগদান করেন।

২২ জানুয়ারী ছাত্রলীগ (তোফায়েল) একটি শোক মিছিল বের করে।

এ দিন ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ২৪ জানুয়ারী হরতালের সমর্থনে শহরে একটি সাইকেল মিছিল করে।

২৪ জানুয়ারী শনিবার গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে ছাত্রইউনিয়ন মতিয়া ও মেনন, বাংলা ছাত্রলীগ ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন যৌথভাবে সারা প্রদেশে হরতাল ডাকে। ভোর ৫টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

বিকেলে পল্টন ময়দানের নির্ধারিত জনসভায় ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) অংশ নিতে আসে নি। পল্টনের এ দিনের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সামসুদ্দোহা। বক্তৃতা করেন প্রাক্তন ছাত্রইউনিয়ন নেতা সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, বাংলা ছাত্রলীগ নেতা আল মুজাহিদী, এন এস এফ-এর ফজলুর রহমান ও ছাত্রইউনিয়নের নূরুল ইসলাম।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ১১ দফার ভিত্তিতে সকল রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যজোট গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সভাপতির ভাষণে সামসুদ্দোহা কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। পরে তারা কলা ভবনে এক ছাত্রসভা করে।

ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) মধুর কেন্টিনে তাদের সমাবেশ অনুষ্ঠানের পর মিছিল বের করে।[১৮৬]

---

১৮৫ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ জানুয়ারী ১৯৭০
১৮৬ ঐ ২৫ জানুয়ারী ১৯৭০

এগার দফা দাবী দিবসের সর্বশেষ কর্মসূচী ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ও তাদের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের। ২৫ জানুয়ারী সর্বশেষ কর্মসূচীতে তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তোফায়েল আহমদ বলেন, আগামী নির্বাচনকে বানচাল করার যে কোন প্রচেষ্টাকে ছাত্রজনতা দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করবে। কায়েমী চক্র বাইশ বছর যাবৎ পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও জনগণকে বঞ্চনা করেছে, আজ তারাই আবার অশুভ তৎপরতায় মেতে উঠেছে। তিনি সরকারের কাছে জানতে চান, নির্বাচন বিরোধী শ্লোগান ও প্রচারণার বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় :

১ ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ও ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে
২ সরকারী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ ঘোষণা দিতে হবে
৩ রমনা রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী পার্ক করতে হবে
৪ দ্বিতীয় রাজধানীর নাম হবে শেরে বাংলা নগর
৫ আইয়ুব গেটের নাম হবে আসাদ গেট
৬ আইয়ুব পার্কের নাম শহীদ মতিউর উদ্যান
৭ এলিফ্যান্ট রোডকে সার্জেন্ট জহুরুল হক সড়ক
৮ আজিমপুর রোডকে শহীদ মনির সড়ক
৯ ফার্মগেট নিকটস্থ উদ্যানকে শহীদ আনোয়ারা উদ্যান করার দাবী ও ঘোষিত হয়।[১৮৭]

সামরিক আইন ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা, ধরপাকড়

সামরিক আইন ঘোষণার পরপর সরকারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের খুশী রাখতে চায়। এ জন্য তাঁরা ছাত্রদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দানের কথাও একে একে ঘোষণা করছিলেন। কিন্তু সরকারের গোয়েন্দা শাখার রিপোর্টের ভিত্তিতে সারা দেশে সামরিক সরকার ছাত্রনেতাদের হয়রানীর জন্য বিভিন্ন মামলা দায়েরও করতে থাকেন। কোথাও কোথাও আবার লোক-দেখানোর জন্য ছাত্রদের মামলা প্রত্যাহারও হতে থাকে।

উনসত্তরের এই সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের সময়ে ১৪৪ধারা ভঙ্গ ও অন্যান্য অভি-যোগে প্রায় ২৮০ জন সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে আইয়ুব-মোনায়েম[১৮৭]

১৮৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ জানুয়ারী ১৯৭০

সরকার ৩৫টি মামলা দায়ের করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রসাশনের নির্দেশে ৭ মে এ সব মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৮৮]

১৯৬৬ সালের ২৬ নভেম্বর যশোরের এম. এম কলেজে এক ছাত্র-বিক্ষোভের সময় পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে ছাত্ররা একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন পুলিশ অফিসারের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং পরে তাদের আটকে রাখে। মোট ২৯ জন ছাত্র ও ৫ জন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) যশোরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এম. এ সাত্তার এ চাঞ্চল্যকর মামলার ২২ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেন।[১৮৯]

১৫ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) উপ সামরিক আইন প্রশাসক পূর্ব পাকিস্তানের ৪ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে সামরিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি ছাত্রনেতাদের সামরিক কর্তৃপক্ষের অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর উপাচার্য জনাব ওসমান গনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ছাত্রনেতা, তোফায়েল আহমদ, সামসুদ্দোহা, মোস্তাফা জামাল হায়দার ও ইব্রাহিম খলিলকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম আহসানের সাথে দেখা করেন এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনা করে নিরসনের চেষ্টা করেন।[১৯০]

২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) মঙ্গলবার ৪ নম্বর সামরিক বিধির প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ঢাকার ডেপুটি সাব মার্শাল ল এর প্রশাসক লে: কর্নেল সৈয়দ আকবর হোসেন এক ইশতেহারে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ, সামসুদ্দোহা, মোস্তফা জামাল হায়দার, ইব্রাহীম খলিল, মাহবুবউল্লাহ, আ.স.ম আবদুর রব, এই ৬ জনকে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার মধ্যে তার কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ১৬ খ সামরিক বিধি লঙ্ঘন করে সভা, মিছিল করার অপরাধের তদন্ত করার জন্য এ ৬ জনকে ডাকা হয়েছে বলে জানানো হয়।[১৯১]

২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করার সমাবেশে বক্তৃতা করার অভিযোগে আনীত মামলা

---

১৮৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ মে ১৯৬৯
১৮৯ ঐ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৯০ ঐ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৯১ ঐ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

প্রত্যাহার করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানানো হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া, মেনন) গ্রুপ ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।[১৯২]

দোসরা অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ও ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ছাত্র মামলা প্রত্যাহার ও কারাদণ্ডদেশ প্রত্যাহার দাবী করেন। তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, প্রেসিডেন্ট ছাত্রদের সন্তানতুল্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। আইনগত জটিলতায় না গিয়ে এই পিতৃসুলভ প্রীতি-স্নেহ নিয়েই ছাত্রসমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া দরকার।[১৯৩]

সাম্প্রতিক শিক্ষাদিবস (১৭ সেপ্টেম্বর) উদযাপন করায় সারা প্রদেশেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে সামরিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা দায়ের করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম আবদুর রব কর্তৃপক্ষের কাছে এ সব মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহবান জানান।[১৯৪]

মাওলানা ভাসানী ২৯ অক্টোরব (১৯৬৯) সন্তোষ থেকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানতে পেরেছি যে, প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র. শ্রমিক, কৃষকদের দাবী-দাওয়া আদায় করার জন্য সংগ্রামরত কর্মীদের হয়রানী ও গ্রেফতার চলছে। মাওলানা সরকারের এসব দমনমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করার আহবান জানান।[১৯৫]

৮ অক্টোবর (১৯৬৯) লাহোরের ৪ নম্বর সেকটরের সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে স্থানীয় ৮ জন ছাত্রনেতা ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং ভবিষ্যতে সদাচারণের নিশ্চয়তা প্রদান করায় তাদের ক্ষমা করা হয় বলে সংবাদপত্রে জানানো হয়।[১৯৬]

১০ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে আইয়ুব আমলে দায়েরকৃত ছাত্রদের উপর থেকে সকল মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবী করেন। ছাত্র ইউনিয়ন মেনন ও মতিয়া গ্রুপ, ছাত্রলীগ (তোফায়েল), এন.এস.এফ (দোলন গ্রুপ) এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ এ

১৯২ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৯৩ ঐ ২ অক্টোবর ১৯৬৯
১৯৪ ঐ ২২ অক্টোবর ১৯৬৯
১৯৫ ঐ ৩১ অক্টোবর ১৯৬৯
১৯৬ ঐ ১০ অক্টোবর ১৯৬৯

বিবৃতিতে বলেন, আইয়ুব আমলের দায়েরকৃত মামলাগুলি ১১ দফা আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৬ সালে সিলেটে আইয়ুব খানের এক জনসভায় গোলযোগকে কেন্দ্র করে সিলেটের ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা আবার হাইকোর্টে তোলা হয়েছে।

কুমিল্লা চিশ্‌তিয়া টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক ধর্মঘটকে সমর্থন ও সহযোগিতা করায় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সিলেট, হবিগঞ্জ, বগুড়া, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, চাটখিল সহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের নামে মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদান করা হয়। অনেক স্থানে ছাত্ররা এখনো কারাগারে আটক আছেন বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। তাঁরা অবিলম্বে সকল মামলা প্রত্যাহার করে ছাত্রদের মুক্তির দাবী করেন।[১৯৭]

২৪ নভেম্বর সোমবার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে, সিন্ধু প্রদেশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার প্রাক্কালে নতুন ভাবে রাজনৈতিক গ্রেফতার শুরু হওয়ায় জন-মনে সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্নে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বলেন, সিন্ধু এলাকার ছাত্র জনতা তাদের মাতৃভাষায় ভোটার করণের ন্যায়সঙ্গত দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছিল। সামরিক সরকার সিন্ধু জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ না করে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করছেন। নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে এ নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করার আহবান জানান।[১৯৮]

৯ নভেম্বর রোববার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন গত ৭ নভেম্বর শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পোস্টার লাগাবার সময় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মি: সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁরা অবিলম্বে মি: সরকারের মুক্তি দাবী করেন।[১৯৯]

---

১৯৭ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ নভেম্বর ১৯৬৯
১৯৮ ঐ ২৬ নভেম্বর ১৯৬৯
১৯৯. ঐ ৯ নভেম্বর ১৯৬৯

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি আবদুল্লাহ্ জাবির দেশরক্ষা আইনে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা শেখ ফজলুল হক মণির কারাদণ্ডাদেশ বাতিল করে একটি রিভিশন মামলার রায় প্রদান করেন। মামলাটি ১৯৬৬ সালে দায়ের করা হয়েছিল। এ বছর ১৩ মে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতায় শেখ মণি দেশরক্ষা আইনের ৪৭ (৫) নং ধারার লঙ্ঘন করে বলে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। মামলায় শেখ মণির এক বছর বিনা শ্রমে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।[২০০]

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে সকল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ছাত্রদের মুক্তি দানের আহ্বান করে সকল মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।[২০১]

ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম. রব এক বিবৃতিতে সামরিক আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত দু'জন ছাত্র খসরু ও মঞ্জুর দণ্ডাদেশ আরো তদন্ত সাপেক্ষে স্থগিত রাখার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে আবেদন জানান। এ দু'জন ছাত্রকে সামরিক আদালতে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। নেতৃবৃন্দ এতে পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনেরও হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[২০২]

পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদের নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে দু'জন ছাত্র খসরু ও মন্টু সহ ছাত্রনেতা সেলিমের সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তে দু:খ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, এ ৩জন ছাত্রের সাথে আমাদের দীর্ঘকালের পরিচয় রয়েছে এবং দাঙ্গার সময়ে (বিহারী-বাঙ্গালী দাঙ্গায়-লেখক) গভর্নর ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিচালিত শান্তি মিছিলে অংশ গ্রহণ করে উপদ্রুত এলাকার শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া দাঙ্গাকালে প্রাদেশিক গভর্নরের সাথে আমাদের সাক্ষাতের সময়েও তারা আমাদের সাথেই ছিলেন। বিবৃতিতে তাঁরা এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[২০৩]

---

২০০ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ নভেম্বর ১৯৬৯
২০১ ঐ ২৭ নভেম্বর ১৯৬৯
২০২ ঐ ২৯ নভেম্বর ১৯৬৯
২০৩ ঐ ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯

সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) ১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ এক বিবৃতিতে বিনাবিচারে আটক কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করেন। ময়মনসিংহ থেকে তিনি এ বার্তা সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন।[২০৪]

মাওলানা ভাসানী ২১ ডিসেম্বর (১৯৬৯) সোমবার সন্তোষ থেকে প্রদত্ত বিবৃতিতে বিভিন্ন সামরিক আইনে যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ কারাবরণ করেছেন তাদের মুক্তি দেওয়ার দাবী করেন।[২০৫]

এসময় ধীরে ধীরে সারাদেশে সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি ও প্রকাশ্যে রাজনীতি করার অধিকারের দাবীতে আন্দোলন গড়ে উঠছিল।

৩১ জুলাই (১৯৬৯) সরকার এক হ্যাণ্ডআউটে জানিয়েছিলেন, এখন থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সামরিক আইন আরো শিথিল করা হল। গৃহাভ্যন্তরে ঘরোয়া রাজনীতি করতে এখন আর অনুমতি লাগবেনা বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।[২০৬]

১৫ সেপ্টেম্বর সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ এক প্রেসনোটে বলে, স্বাভাবিক রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমে ক্রমে চালু করাই সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু সরকার জানতে পেরেছে বিভিন্ন ছাত্রদল ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রেসনোটে বলা হয়, ছাত্রদের বুঝাতে হবে যে, সভা অনুষ্ঠান, মিছিল করা, ধর্মঘট করা ইত্যাদি ৫০ নং ও ১৮নং সামরিক বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সুতরাং সামরিক বিধি বা নির্দেশের কোন বরখেলাপ কর্তৃপক্ষ বরদাশত করবে না।[২০৭]

মাওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল থেকে ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বার্তায় জনসভা ও সমাবেশের উপর থেকে অবিলম্বে সকল প্রকার বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আহবান জানান।[২০৮]

---

২০৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৯
২০৫ ঐ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৯
২০৬ ঐ ৩১ জুলাই ১৯৬৯
২০৭ ঐ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
২০৮ ঐ ২৪ নভেম্বর ১৯৬৯

১৮ ও ১৯ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র কেন্দ্রীয় সংসদের এক বর্ধিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সভা-সমিতির উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। প্রস্তাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং মামলা প্রত্যাহারেরও আহ্বান জানানো হয়।

এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক মহল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে তাঁর ২৮ নভেম্বরে জাতির উদেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণে ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

তার পরিপেক্ষিতে ২৮ ডিসেম্বর (১৯৬৯) পূর্ব পাকিস্তন ছাত্রলীগ (তোফায়েল) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এক যুক্ত বিবৃতিতে পয়লা জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ছাত্র জমায়েত, মিছিল ও সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, জানুয়ারী মাসেই শহীদের বুকের রক্তে গণঅভ্যুত্থান গড়ে উঠেছিল এবং ১১দফা দাবী সনদ রচিত হয়েছিল। তারা পয়লা জানুয়ারী সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে ১১ দফা কায়েমের শপথ নেওয়ার জন্যও সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[২০৯]

কিন্তু ২৪ জানুয়ারী (১৯৭০) গত বছরের গণঅভ্যুত্থান দিবস স্মরণে অনুষ্ঠান করার সাথে যুক্ত থাকার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস ও বিধান চন্দ্র বিশ্বাসকে সামরিক আইনে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরা উভয়েই ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র জগন্নাথ হল শাখার নেতা। ২৪ জানুয়ারী হরতালের সময় এদের গ্রেফতার করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এ দু'ছাত্র নেতার কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে। সভায় অন্যান্যর মধ্যে শওকত চৌধুরী, শেখর দত্ত ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বক্তৃতা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠনের ৩৭ জন ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে নির্মল ও বিধান বিশ্বাসের মুক্তি দাবী করে। পয়লা ফেব্রুয়ারী রোকেয়া হলে

---

২০৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯

সর্বদলীয় ছাত্রসভায় নির্মল ও বিধানের মুক্তি দাবী করা হয়। এ ছাত্রসভায় একই সাথে কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং, দেবেন সিকদার, অজয় রায়, হায়দার আলী প্রমুখের মুক্তি দাবী করা হয়।

এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে গোলযোগ হয়। ছাত্রদের উপাচার্যের বাস ভবনে বেআইনী প্রবেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা ও ব্যালট বাক্স সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। সামরিক আইনের ১৬ (ক) ধারায় লাহোর হাইকোর্ট ৩৫ জন ছাত্রের বিচার করে এবং ১৬ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে ১ মাস থেকে ১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে।[২১১]

দোসরা মার্চ (১৯৭০) ঢাকার জেলা প্রশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, শহরের বিভিন্ন ঘর-বাড়ী, প্রাচীর বেআইনী ও আপত্তিকর কথাবার্তা লিখিত পোষ্টারে ছেয়ে আছে। সামরিক আইনের দৃষ্টিতে এ সব দণ্ডনীয় অপরাধ। বিভিন্ন ভবন ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এ ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে যাতে কেউ এসে দেওয়ালে পোষ্টার সেটে দিয়ে যেতে না পারে। অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[২১২]

২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) তারিখে শহীদ দিবস উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত এক জনসভায় স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এই ১১দফা কর্মসূচী মূলত ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের কর্মসূচী।

কর্মসূচীতে বলা হয়:

'পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষক, যেহেতু তারা সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত- সেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ্ব প্রধান। যদিও এই কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচারিত হচ্ছে তবুও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে····· মুক্তিফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর

২১০- দৈনিক পাকিস্তান, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
২১১ ঐ ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
২১২ ঐ ৩ মার্চ ১৯৭০

করে, শ্রেণী সংঘর্ষ রূপান্তরিত করে দীর্ঘ সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা গঠন এবং শ্রেণী শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ছাত্রসমাজ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম-যদি ছাত্র সমাজ নিজেরা শ্রেণীচ্যুত হয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের শ্রেণী শত্রুকে খতম করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে'।[২১৩]

কর্মসূচীটি জনসভায় পরে শোনান ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহ। বক্তৃতা করেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রণো ও রাশেদ খান মেনন। সভাপতিত্ব করেছিলন, মোস্তফা জামাল হায়দার। দুদিন পর দৈনিক ইত্তেফাকে 'রাজনৈতিক মঞ্চে' এনিয়ে উপসম্পদকীয় লেখা হয়। বলা হয়, কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী যুবক পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার মানসে ষড়যন্ত্র আটছে। কিন্তু সরকার এর প্রতিকারে কিছুই করছে না।

এর কিছুদিন পরেই উপসম্পাদকীয়-এর প্রভাব এবং আলামত দেখতে পাওয়া যায়।[২১৪]

২১শে মার্চ (১৯৭০) শনিবার বিকালে পুলিশ তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) -এর সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহকে গ্রেফতার করে। তিনি লাহোর যাত্রাকারী মাওলানা ভাসানীকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন। একই দিন ন্যাপ (ভাসানী) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নেতা কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, মোস্তাফা জামাল হায়দার প্রমুখের বিরুদ্ধেও হুলিয়া জারী করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত পূর্বে উক্ত জনসভায় সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বক্তব্য রাখার দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গ্রেফতারের কয়েকদিন পরই ঢাকার সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে মাহববুউল্লাহকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫ টি বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আই এস. পি. আর

২১৩ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ—লেখক)-এর পক্ষে মাহবুবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রচারপত্র, ৭ মার্চ ১৯৭০

২১৪ সাক্ষাৎকার, রাশেদ খান মেনন

(সামরিক গণসংযোগ কর্মকর্তার) অফিস থেকে বলা হয় ৯নং সেকটর কমাণ্ডার তার কারাদণ্ড বলবৎ রেখে ১৫টি বেত্রদণ্ড মওকুফ করে দিয়েছেন।[২১৫]

২১ মার্চ গভীর রাতে ভাসানী ন্যাপের প্রাদেশিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার জাহিদকে তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দু'জন পুলিশ অফিসারকে মারধোর করার অভিযোগ ছিল।[২১৬]

২৪ মার্চ ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহর মুক্তির দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। তেজগাও কলেজ ও কলা ভবন ছাড়া অন্যত্র আকস্মিকভাবে ডাকা এ ধর্মঘটের খবর জানানো সম্ভব হয় নি। দুপুরে বটতলায় একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২১৭]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) মাহবুবউল্লাহর মুক্তি দাবীতে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এতে ২৭ মার্চ শুক্রবার মধুর কেন্টিনে কর্মী সভা ও সন্ধ্যায় মশাল মিছিল, ২৮ মার্চ সারা প্রদেশে ছাত্রসভা, ছাত্র ধর্মঘট এবং বটতলায় কেন্দ্রীয় প্রতিবাদ সভা অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২১৮]

ন্যাপ (ওয়ালী), ন্যাপ (ভাসানী) ও ১১ জন শ্রমিকনেতা রাজনৈতিক কারণে ধর-পাকড় ও হুলিয়া প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দেয়।[২১৯]

২৭ মার্চ বুধবার রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে ছাত্রীনেত্রী মিস আখতার বালচুকে গ্রেফতার করা হয়। আখতার বালুচ সিন্ধুর পতিত জমি নিলামে দেওয়া বন্ধ করে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের দাবীতে অনশন ধর্মঘট করছিলেন। তাঁকে নিয়ে এ ব্যাপারে সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদে মোট ৯৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[২২০]

২৯ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) রংপুর শাখা, শহরে ভাসানী ন্যাপ নেতা মশিউর রহমানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা মাহ-বুবউল্লাহ, আনোয়ার জাহিদ ও মনি সিং এর মুক্তির দাবীতে শ্লোগান দেয়।[২২১]

---

২১৫ দৈনিক পাকিস্তান, ২২, ২৯ মার্চ, ৯ এপ্রিল ১৯৭০
২১৬ ঐ ২২ মার্চ ১৯৭০
২১৭ ঐ ২৫ মার্চ ১৯৭০
২১৮ ঐ ২৬ মার্চ ১৯৭০
২১৯ ঐ ২৮ মার্চ ১৯৭০
২২০ ঐ ২৯ মার্চ ১৯৭০
২২১ ঐ ৩১ মার্চ ১৯৭০

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মীরা দোসরা এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে মণি সিং সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে একটি মশাল মিছিল বের করে।২২২

ছাত্র ইউনিয়ন গ্রেফতার, হুলিয়া, নির্যাতন ও রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীতে সারা প্রদেশে প্রতিরোধ কর্মসূচীর শেষ দিনে (১০ এপ্রিল) শহীদ মিনার থেকে মশাল শোভাযাত্রা বের করে।২২৩

সামরিক শাসনের সমালোচনা, সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২২ এপ্রিল (১৯৭০) পল্টনের জনসভায় অসন্তোষ ছড়ানো, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সত্ত্বা মুছে ফেলা, চলতি বছর অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রচারণা ইত্যাদি অভিযোগে সাবেক ছাত্রনেতা এ.এস. এম রাশেদ খান মেননের বিরুদ্ধে সামরিক কর্তৃপক্ষ ছয়, সতেরো এবং ষাট নম্বর ধারায় বিচারের জন্য ১৩ মে সকাল ১০টায় ঢাকার সহকারী উপসামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়।২২৪

কিন্তু রাশেদ খান মেনন এবং কাজী জাফর আহমদের কেউই আদালতে হাজির হননি। ফলে তাদের অনুপস্থিতিতেই সামরিক আদালত তাদের বিচার করে সাত বছর সশ্রম করাদণ্ড এবং সম্পত্তির ৬০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়।২২৫

সমারিক কর্তৃপক্ষের ছাত্র হয়রানী এর মধ্যে সারাদেশে আরো বিস্তৃতি লাভ করে। বিভিন্ন জায়গায় মিছিল সভা করার অভিযোগে ছাত্রদের ধরে নিয়ে গিয়ে চালান দেওয়া শুরু হয়। ৭ মে তেজগাঁও কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ হাসানকে পুলিশ কোন কারণ ছাড়াই থানায় নিয়ে যায় এবং অজ্ঞাতস্থানে তাকে স্থানান্তর করা হয়। ১০ মে ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ সরাদেশে সরাকারী নির্যাতনে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক বিবৃতি দেন।২২৬

সরকারী ছাত্র নির্যাতন, দমন পীড়নের অংশ হিসাবে সিলেটে জুন মাসে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। মাওলানা ভাসানী এ সময় সারাদেশে জুন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অভিযোগে সিলেটের ছাত্রনেতা রকিবুদ্দিন

---

২২২ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ এপ্রিল ৭০
২২৩ ঐ, ১১ এপ্রিল ১৯৭০
২২৪ ঐ, ২ মে ১৯৭০
২২৫ ঐ, ১২ মে ১৯৭০
২২৬ ঐ ২৬ জুন ১৯৭০

চৌধুরী ও আশীষ কুমারকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা সিরাজুল হোসেন খান তাদের মুক্তি দাবী করে এক বিবৃতি দেন।[২২৭]

সিন্ধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় হায়দরাবাদ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী মিস রিয়াজ মেমনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ কারাদণ্ড ভোগরত এ ছাত্রীনেত্রীকে হঠাৎ করে আবার হায়দরাবাদ কারাগার থেকে পেশোয়ার কারাগারে স্থানান্তর করে। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা নূরজাহান মোরশেদ তাঁর প্রতি অসদাচারণ করায় কর্তৃপক্ষের নিন্দা করে বিবৃতি দেন।[২২৮]

১৬ই জুন রংপুরে সামরিক আইনের ৬, ১৭, ৬০ নম্বর বিধি লঙ্ঘন করায় স্থানীয় ন্যাপ (ওয়ালী) নেতা মোহাম্মদ আফজাল ও আমজাদ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।[২২৯]

১৭ জুন বুধবার রাত ৩টায় পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে সাতঘন্টা ব্যাপী এক আকস্মিক তল্লাসী চালিয়ে মিরপুরে কিছুদিন আগে সংঘটিত বাঙালী--বিহারী দাঙ্গায় হত্যার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা মোস্তাফা মহসিন মন্টু ও সেলিমকে গ্রেফতার করে। পুলিশের ভাষ্যে বলা হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবে ছ'জনকে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে। সামরিক আদালতে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার হয় এবং ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছাত্রলীগ এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরদিন ধর্মঘট ডাকে।[২৩০]

ছাত্রলীগ ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ধর্মঘট শেষে বটতলায় এক প্রতিবাদ সভা করে। সভায় বক্তরা মোস্তাফা মহসীন মন্টু ও সেলিমকে পুলিশের কছে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)কে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, ঐক্যের মুখোশধারীরা ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেফতারের সহযোগিতা করেছে।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগকে অসত্য ও বানোয়াট বলে দাবী করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, অসত্য কাল্পনিক কথা রটিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা ইকবাল হলের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী জসিমউদ্দিনকে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আহত করে।সে এখন হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় শয্যাশায়ী।[২৩১]

---

২২৭ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ জুন ১৯৭০
২২৮ ঐ ১৬ জুন ১৯৭০
২২৯ ঐ ১৭ জুন ১৯৭০
২৩০ ঐ ১৮ জুন ১৯৭০
২৩১ ঐ ১৯ জুন ১৯৭০

২ জুলাই মাওলানা ভাসানী, কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের দণ্ডাদেশ বাতিলের আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি তারবার্তা পাঠান।২৩২

৫ সেপ্টেম্বর (১৯৭০) পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্ররা আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে জেলখানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছাত্ররা তাদের কলেজের উপাধ্যক্ষের অপসারণের দাবীতেও ধ্বনি দেয়।২৩৩

১৫ নভেম্বর পাবনার শালগাছিয়া থেকে পুলিশ পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আজগর চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। তার গ্রেফতারের সময় পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুড়ে এবং আজগর চৌধুরীকে মারধোর করে।২৩৪

৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ডাকসু এবং ডাকসুর নেতৃবৃন্দ সহ মোট ১১ জন ছাত্রনেতা ডাকসুর সহসভাপতি আ.স.ম আব্দুর রবের সাথে মাইজদী কোর্টের আমলাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানান এবং জনাব রব সহ স্থানীয় ৫ জন নেতার বিরুদ্ধে জারিকৃত হুলিয়া প্রত্যাহারের আবেদন জানান। ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীও অনুরূপ বিবৃতি দেন।২৩৫

পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা: গোলযোগ ও মৃত্যু

পাকিস্তানী রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলাম আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলোর কাছে জামাত কখনোই গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমনকি পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও ইসলাম পছন্দ দলগুলোর কাছেও জামাতে ইসলাম ও তার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদুদী ছিলেন ইসলাম বিরোধী, কারো করো মতে 'কাফের'ও। (আলাদা অধ্যায়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

পাকিস্তানের রাজনীতি যখন মওদুদী এবং তার দল জামাতে ইসলাম নিয়ে সরগরম তখন মাওলানা মওদুদী ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে ঢাকা আসেন। মাওলানা মওদুদীর ঢাকায় আগমনের সংবাদ অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলাম ও তার ছাত্রশাখা ইসলামী ছাত্রসংঘ মওদুদীর ঢাকা আগমনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

২৩২ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা জুলাই ১৯৭০
২৩৩ ঐ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
২৩৪ ঐ ১৭ নভেম্বর ১৯৭০
২৩৫ ঐ ৩, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭০

এ উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারী (১৯৭০) পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে একটি জনসভারও আয়োজন করা হয়। ১৭ জানুয়ারী লাহোর থেকে মাওলানা আবু আলা মওদুদী ঢাকায় আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য কারণে তিনি পল্টনের জনসভায় উপস্থিত হননি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই সভার কাজ শুরু হয় এবং জামায়াতের চট্টগ্রাম জেলার আমীর অধ্যাপক ওসমান রমিজ এতে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি তীব্রভাবে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ এবং ৬দফা ও ১১দফার সমালোচনা করে বক্তৃতা দেন। তিনি এ সম্পর্কে কটুক্তি করলে জনসভায় উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায় এবং এক পর্যায়ে জনতার সাথে জামাত কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, জামাত তার সভামঞ্চের পাশে চাঁদোয়া ও পর্দা দিয়ে ঘেরা একটি বিরাট কক্ষ তৈরী করে রেখেছিল। তাতে লেখাছিল 'রিসেপশন'। এই পর্দার ভেতরে রক্ষিত ছিল কাঁচা বাঁশের লাঠি এবং ফার্স্ট এইডের দ্রব্যাদি। এখান থেকে জামাত কর্মীরা দলে দলে লাঠি নিয়ে জনতার উপর মারমুখী আক্রমণ চালায়। তিনি আরো বলেন এক পর্যায়ে পল্টনের জনতা ভেঙে পড়ে জামাত কর্মীদের উপর এবং তাদের লাঠি উপস্থিত জনতা কেড়ে নেয় এবং পাল্টা হামলা চালায়। এ পর্যায়ে পল্টন ময়দান পরিণত হয় রণক্ষেত্রে।

এ দিনের সরকারী দৈনিক পাকিস্তান এ সম্পর্কে রিপোর্ট করে যে, বেলা যখন ৫টা তখন স্টেডিয়ামের প্রধান গেটের কাছে এসে পুলিশ অবস্থান নেয়। এসময় একজন জামাত নেতা তাদের কর্মীদের মাইক যোগে নির্দেশ দিতে থাকেন, 'উত্তর দিকে পুলিশ আছে, আপনারা দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালান'।

কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা জামাত কর্মীদের হঠিয়ে দেয় এবং প্যাণ্ডেল, মাইক ও অন্যান্য আয়োজনে আগুন লাগিয়ে দেয়। একটি ক্ষুদ্র দল স্টেডিয়াম এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে মতিঝিলে অবস্থিত হোটেল ইডেনেও যায় এবং সেখানে ইসলামী ছাত্রসংঘের সম্মেলন মঞ্চেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিন পল্টনে লাঠিধারী জামাতের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও মারমুখী বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপ্তিকাল ছিল আনুমানিক প্রায় দু' ঘন্টা। আহত হয় পাঁচ শতাধিক। হাসপাতালে গুরুতর ভাবে আহত একজন সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

জামাতের কর্মীদের আক্রমণের ছবি তোলার কারণে আজাদের আলোকচিত্র শিল্পী মোহাম্মদ আলম, ইত্তেফাকের বড়ুয়া এবং এ পি পি-র মোকাদ্দেমকে পেটানো হয় এবং তাদের ক্যামেরা জামায়াত কর্মীরা ভেঙে ফেলে।২৩৬

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ও ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম আব্দুর রব এক বিবৃতিতে পল্টন ময়দানে জামাতে ইসলামী কর্তৃক নিরীহ মানুষের উপর হামলাকে নিন্দা করেন। তাঁরা অভিয়োগ করেন, শান্তিপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ট্রাক বোঝাই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত জামাত কর্মীদের হামলা নিন্দনীয় অপরাধ।

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহাবুবউল্লাহ বিবৃতিতে বলেন, নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার অধিকার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আপত্তিজনক ও অশোভন উক্তি করার অধিকার কারো নেই।

ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পরদিন ১৯ জানুয়ারী সারা প্রদেশে জামাতের বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বান করে।

পরদিন হাসপাতালে আহত আরো একজন মারা যায়। ইসলামী ছাত্র সংঘের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দু'য়ে দাঁড়ালো। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, নিহতদের প্রথমজনের বাড়ী খুলনার মোড়েলগঞ্জের মওলবী মোসলেহউদ্দীনের পুত্র আব্দুল মজিদ ওয়াহেদী, দ্বিতীয় জন নোয়াখালীর চর-লক্ষীগঞ্জের জুলফিকার আলীর পুত্র আব্দুল আওয়াল। আওয়াল কাজিরহাট কলে-জের আলিয়া মাদ্রসার ছাত্র। এবং উভয়েই ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী।২৩৭

নিহতদের লাশ তাদের গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে চকবাজার মসজিদ, পরে বায়তুল মোকাররমে নিহতদের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম রক্তের বিনিময়ে জেহাদ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

এদিন পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, পুলিশ ১৮ জানুয়ারীর পল্টনের ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে মোট ৮০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

---

২৩৬ দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক ইত্তেফাক ও আজাদ, ১৯ জানুয়ারী ১৯৭০
২৩৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২০ জানুয়ারী ১৯৭০

বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান খান ২১জানুয়ারী এক বিবৃতিতে বলেন, পল্টনে জামাত ইসলামীর বক্তাগণ বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বাংলার বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ এবং বাঙালীদের হিন্দুদের গোলাম বলে আখ্যায়িত করায় নিরীহ জনতার অনেকই সভা ত্যাগ করেছিল। একপর্যায়ে জামাত কর্মীরা ছোরা ও লাঠি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। এ বর্বরতার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া দরকার।

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর ২০ জানুয়ারী প্রদত্ত তার বিবৃতিতে বলেন, পল্টনের ঘটনা মত প্রকাশের সম্পূর্ন পরিপন্থী। পেশাগত দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের উপর হামলাকেও তিনি নিন্দা করেন।

জামায়াতে ইসলামের মনগড়া ইসলামের জন্য সমগ্র আলেম সমাজকে অহেতুক বিপদগ্রস্থ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিবৃতি দেন, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামসুদ্দীন কাজেমী। তিনি বলেন, মওদুদীর সমর্থকদের সাথে দেশের প্রকৃত ইসলাম পন্থীদের কোনো সম্পর্ক নেই। গোলাম আযমরা যে ইসলামের নামে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন তা মদীনার ইসলাম নয়, বরং তা আমেরিকার ইসলাম তথা মওদুদী মতবাদ ও সরাসরি গোমরাহী, একথা দেশের আলেম সমাজ বহু আগেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী পল্টন ময়দানে নিরীহ মানুষের উপর জামাতে ইসলামের কর্মীদের হামলার তীব্র নিন্দা করে এদের রুখতে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য কামনা করে বিবৃতি দেন।[২৩৮]

২১ জানুয়ারী বুধবার ইসলামী ছাত্র সংঘের কার্যকরী পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন মতিউর রহমান নিজামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এক প্রস্তাবে সমাজতন্ত্রী, ফ্যাসীবাদী ও আঞ্চলিকতাবাদীদের যাবতীয় শক্তি ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযোগ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে পল্টনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরে ছাত্র সংঘের নেতা রুহুল কুদ্দুস ও ফরিদপুর শাখার সভাপতি মুহম্মদ মুজাহিদকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয়।

মওলানা মওদুদী ২৩ জানুয়ারী ঢাকা থেকে লাহোর ফিরে যান এবং এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকায় তার আগমন ও জনসভাকে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ হয় তার জন্য ইসলাম বিরোধী ব্যক্তিদের দোষারোপ করেন।

---

২৩৮ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ জানুয়ারী ১৯৭০

এক সাংবাদিক, মাওলানাকে বলেন ঢাকায় অন্তত একটি জনসভা না করে তাঁর ফিরে আসা উচিৎ হয়নি। জবাবে মাওলানা বলেন, আর একটি জনসভা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ ঢাকায় এখন অত্যন্ত উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করছে। প্রশাসনযন্ত্রও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। গোলযোগ শুরুর দুই ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ঢাকায় জামাত বিরোধীরা উঠে পড়ে লাগে যে সমগ্র ঘটনার জন্য জামায়াত ইসলামই দায়ী। একটি ভ্যানে মাইক লাগিয়ে সারা শহরে প্রচার করা হয় যে, এই ঘটনার জন্য জামাত দায়ী এবং জামায়াত ইসলামীকে রুখে দাড়াঁনোরও আহবান জানান হয়।[২৩৯]

২৬ জানুয়ারী সোমবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গনে ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া যৌথভাবে পল্টনের ঘটনার প্রতিবাদে এক ছাত্র সভার আয়োজন করে। এতে মতিউর রহমান নিজামী বক্তৃতায় বলেন, দেশে দু'টি ফ্যাসীবাদী শক্তি তৎপর। এদের একটি, ভোটের আগে ভাত চায়, অন্যটি যারা অন্য কাউকে দলীয় মত প্রচার করতে দেয় না। তিনি পল্টনে জামায়াতের সভায় হামলার নিন্দা করেন।[২৩৯]

'পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলন

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরণের ছাত্র আন্দোলন ছিল, 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক একটি গ্রন্থ স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্যসূচী থেকে বাতিলের আন্দোলন। গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে যারা নবম ও দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের জন্য প্রথম পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বলা হয়েছিল, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পূর্ণ ২০০ নম্বরের প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারিত হল।

প্রথম খণ্ডটি রচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রিডার ড: সিরাজুল ইসলাম।

গ্রন্থটির 'মুখবন্ধে' ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু সাইদ মাহমুদ জানান, 'কিছুকাল পূর্বে বেশ কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও চিন্তাশীল

---

২৩৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ জানুয়ারী ১৯৭০

অভিভাবক এ যাবৎ অবশ্য পঠনীয় সমাজবিদ্যার স্থলে পাঠ্যসূচীতে কতকগুলি পরিবর্তন সুপারিশ করিয়াছিলেন। প্রদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলি সম্মিলিতভাবে সুপারিশ-সমূহ বিবেচনার পর পাকিস্তানের ইতিহাস ও কৃষ্টিকে অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন'।[২৪০]

বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে সমগ্র প্রদেশব্যাপী তুমুল ছাত্র আন্দোলন আনাচে--কানাচে সকল শ্রেণীর ছাত্রদের বেশ কয়েকবারই স্পর্শ করেছে, কিন্তু ছাত্রদের নিজস্ব বৈষয়িক দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভবত এই প্রথম সমগ্র ছাত্র সমাজ, স্কুলের ছাত্র--ছাত্রীরা তো বটেই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত মাঠে নেমে পড়ে। তারা দাবী তুলতে থাকে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক গ্রন্থটি পাঠ্যসূচীতে আরো অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে চাপানো হয়েছে, এ বই ছাত্ররা পড়বে না এবং সিলেবাসের বোঝাও কমাতে হবে। এ বই পাঠ্য করার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পাঠের যে নম্বর কমানো হয়েছে তাও পুনর্বহাল করতে হবে।

'দেশ ও কৃষ্টি'র ব্যাপারে ছাত্রদের আন্দোলনে রাজনৈতিক মানদণ্ডও চলে আসলো। ছাত্ররা অতিরিক্ত সিলেবাস হিসেবেই নয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে এ গ্রন্থের মাধ্যমে এবং পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নেতাদের, বিশেষ করে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি বলেও অভিযোগ উত্থাপন করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলের সাধারণ ছাত্ররাই এ নিয়ে স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলন করে যাচ্ছিল। রাজনীতির সাথে যুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি এর সাথে প্রথমে জড়িত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন এ বিষয়ে দু'টো আলাদা আলাদা স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় এবং সারাদেশে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। দুই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বাতিলের আন্দোলন সারাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র আন্দোলনে পরিণত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব একান্ত শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে আন্দোলন করে দাবী আদায় করে নেয়।

তেসরা জুলাই (১৯৭০) ছাত্রদের এ সম্পর্কিত আন্দোলনের খবর প্রথম সংবাদপত্রে স্থান পায়। খবরে বলা হয়, সিলেটের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা বেশ কিছু দিন

---

২৪০ মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি, ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা জুন ১৯৬৯

ধরে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক একটি বই পাঠ্যসূচী থেকে বাতিলের জন্য আন্দোলন করছে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ ছাত্রদের দাবী সমর্থন করে বিবৃতি দেন।[২৪১]

এরপর দোসরা আগস্ট থেকে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ কাগজের পাতায় আসতে থাকে। এ দিন ঢাকা সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্ররা ষান্মাসিক পরীক্ষায় 'দেশ ও কৃষ্টি' বিষয় বর্জন করে। পরীক্ষা বর্জন করে ছাত্ররা স্কুল প্রাঙ্গনে এক প্রতিবাদ সভা করে অবিলম্বে পাঠ্যসূচী থেকে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বইটি বাতিলের আহ্বান জানায়।

এ দিন ঢাকা শহরের পনেরটি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি যৌথ বিবৃতি দিয়ে অবিলম্বে বইটি প্রত্যাহারের দাবী তোলে। বিবৃতিদাতা স্কুলগুলি ছিল, সেন্ট গ্রেগরীজ, ঢাকা কলেজিয়েট, মুসলিম হাই, গ্রাজুয়েট হাই, ইস্ট বেঙ্গল ইনসটিটিউট, আরমানীটোলা হাই, কে এল জুবিলী, ওয়েস্ট এণ্ড, পগোজ হাই, ইসলামিয়া, গভ: লেবরেটরী, নবাবপুর গভ: হাই, নারিন্দা গভ: হাই, গেণ্ডারিয়া হাই ও সেগুনবাগিচা হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ।[২৪২]

এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এবং এ সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ আগষ্ট শহীদ মিনারে প্রথম সমাবেশের আয়োজন করা হয়। স্কুল ছাত্রদের এই সমাবেশ উপলক্ষে তারা একটি প্রচারপত্র ঢাকা শহরের সকল স্কুলগুলিতে বিলি করে। প্রচারপত্রটিতে বলা হয় :

'আজ পর্যন্ত কোন সরকারই শিক্ষা সমস্যার সমাধান করে নাই, উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রসমাজ ছাত্রদের উপর থেকে সিলেবাসের বোঝা কমিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সিলেবাস প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই আমাদের কথায় কান দেয় নাই, বরং সিলেবাসের বোঝা দিন দিন অবৈজ্ঞানিকভাবে বৃদ্ধি

২৪১ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ জুলাই ১৯৭০
২৪২ ঐ ৩ আগস্ট ১৯৭০

করা হচ্ছে। সম্প্রতি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপর 'পাকিস্তান-দেশও কৃষ্টি' বইটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।... অন্য দিকে এই বই-এ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মুখে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও 'পাকিস্তান-দেশও কৃষ্টি' চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার সময় ও সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে। সরকারের এই তোগলোকী নীতির ফলে সমস্ত দেশের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনে এক চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের স্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভের ফলে সরকার এই বই-এর দ্বিতীয় অংশ বাতিল করলেও আজও ছাত্রদের মাথায় বাধ্যকতামূলকভাবে চাপিয়ে রেখেছে, এই বই-এর প্রথম অংশটি'।[২৪৩]

৬ আগস্ট (১৯৭০) 'দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিলের দাবীতে সারা শহরের স্কুল ছাত্রদের নিয়ে শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)। সংগঠনের সভাপতি সামসুদ্দোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করে।

পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বায়তুল মোকাররমে এসে শেষ হয়। এখানে ৮ আগস্ট পুস্তক বাতিলের দাবীতে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।[২৪৪]

এদিন বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেনও বইটি প্রত্যাহারের দাবীতে বিবৃতি দেন।

৮ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বটতলায় এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও বাংলা ছাত্রলীগ যৌথভাবে শহীদ মিনারে পুস্তক বাতিলের দাবীতে সমাবেশ করে। এদিন সংগঠনগুলির ডাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটও পালিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বটতলায় সমাবেশের পর মধুর কেন্টিনে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পাল্টা আরেকটি পূর্ব পাকিস্তান স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এতে মোস্তাক হোসেন ও লুৎফে হাসিনা যুগ্ম আহবায়ক এবং আবুবকর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২৪৫]

---

২৪৩ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৩৯ (প্রচারপত্রটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেখুন পরিশিষ্টে)
২৪৪ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ আগস্ট ১৯৭০
২৪৫ ঐ ৯ আগস্ট ১৯৭০

এবং এরপরই দেশ ও কৃষ্টি আন্দোলনে দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি এসে পড়ে। ঢাকার ৬৩টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় গঠিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ আগস্ট এক বিবৃতিতে, ছাত্রলীগ পরিচালনাধীন স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করে।[২৪৬]

১০ আগষ্ট ডাকসু ও ছাত্রলীগের সমর্থিত এই স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ধর্মঘট শেষে এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন আ. স. ম. আবদুর রব। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল ডি. পি. আই অফিসে ধর্ণা দেয়।[২৪৭]

১৫ আগষ্ট রোববার ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মধুর কেন্টিনে মো: হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক কর্মীসভায় 'দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলন জোরদার করার আহবান জানান।[২৪৮]

ইতোমধ্যে এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে পর্যন্ত সাধারণ ছাত্ররা বইটি বাতিলের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করতে থাকে।

১৯ আগষ্ট স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুই গ্রুপেরই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করে। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) গ্রুপের সমর্থিত স্কুল সংগ্রাম পরিষদ ২১ আগষ্ট শুক্রবার ঢাকার সকল স্কুলে ও শনিবার প্রদেশের সকল স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল সংগ্রাম পরিষদও অনুরূপ কর্মসূচী নেয়। ছাত্রলীগ, ডাকসু, চাকসু ও রাকসু এ গ্রুপের কর্মসূচী সমর্থন করে বিবৃতি দেয়।[২৪৯]

পরদিন দুটি স্কুল সংগ্রাম পরিষদের ডাকেই ছাত্রধর্মঘট অত্যন্ত সফল ভাবে পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত স্কুল সংগ্রাম পরিষদের সভা তকছিম আহমদের সভাপতিত্বে বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় থিসিস মার্কা বই 'দেশ ও কৃষ্টি' পুরোপুরি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার

---

২৪৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ আগষ্ট ১৯৭০
২৪৭ ঐ ১১ আগষ্ট ১৯৭০
২৪৮ ঐ ১৮ আগষ্ট ১৯৭০
২৪৯ ঐ ২০ আগষ্ট ১৯৭০

আহবান জানান। সভায় এক প্রস্তাবে সাধারণ বিজ্ঞান থেকে কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাশ বাতিলেরও প্রতিবাদ জানানো হয়।

ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় শহীদ মিনারে। মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ডাকসু নেতা আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন বক্তৃতা করেন। তাঁরা দেশ ও কৃষ্টি পুনর্লিখনের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন।[২৫০]

দীর্ঘদিন বিরতির পর পূর্ব পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে মুখ খোলেন এবং ঘোষণা করেন, ১৯৭২ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য বইটি সহজ ভাষায় লেখা হচ্ছে এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০-এর বেশী হবে না। সরকার বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলে, ১৯৭১ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের সুবিধার্থে এরই মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম খণ্ডের ৫টি অধ্যায় তাদের পড়তে হবে না।[২৫১]

২১ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের ৪টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিচালক অনুরূপ আরেকটি বিবৃতি দেন। তিনি এতে অতিরিক্ত যোগ করেন যে, পাকিস্তানের উদ্ভব ইতিহাস ও আজাদী আন্দোলন সম্পর্কে একটা মুখস্ত ধারণার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলেই এ ধরণের একটি পাঠ্য বিষয় অপরিহার্য মনে করেন। তিনি আশা করেন ছাত্ররা এই হ্রাসকৃত পাঠ্যসূচী সহজ মনেই গ্রহণ করবে।[২৫২]

২২ আগস্ট শনিবারেও দুটি স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শহরের স্কুল ছাত্রদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত সংগ্রাম পরিষদের শহীদ মিনারের সমাবেশে তেজগাঁও পলেটেকনিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা বেগমকে বহিস্কারের নিন্দা করে পুনরায় তাকে ভর্তি করার আহবান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৫৩]

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মশিউর রহমান পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সংস্কার মুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা

---

২৫০ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ আগস্ট ১৯৭০
২৫১ ঐ ২০ আগস্ট ১৯৭০
২৫২ ঐ ২৯ আগস্ট ১৯৭০
২৫৩ ঐ ২৩ আগস্ট ১৯৭০

ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষানীতি প্রনয়ণকারীদের প্রতি আহবান জানান। এক বিবৃতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিতর্কমূলক বই 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করে ন্যাপ নেতা বলেন যে, আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীরা যদি মনে করেন যে, মাধ্যমিক পর্যায়েই ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে পণ্ডিত হতে হবে তবে তাঁরা উপনিবেশবাদী মনোভাবের পরিচয় দেবেন।

মশিউর বলেন, পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করছে এবং জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এব্যাপারে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ২৩ বছর পরেও একটি উপযুক্ত পাঠ্যসূচী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির দাবীতে আমাদের ছাত্র সমাজকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। বর্তমান পাঠ্যতালিকা সুবিন্যস্ত না করেই উপরোক্ত বইটি পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার তীব্র সমালোচনা করে জনাব মশিউর রহমান বলেন যে, ডিপিআই এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৩০ নম্বরের জন্য উক্ত বইটি পড়তে হবে। উক্ত ত্রিশ নম্বরও আবার তাদের পাঠ্য তালিকায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র থেকে কেটে নেওয়া হবে। অথচ এর জন্য তাদের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের পাঠ্য তালিকায় কোন পরিবর্তন করা হবে না।

জনাব মশিউর রহমান, বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিজ্ঞান বহির্ভূত একটি বিষয় এভাবে চাপিয়ে দেওয়ার সমালোচনা করেন।

পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বই বাতিলের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) দিনাজপুর শাখার উদ্যোগে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশবর্জন ও পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে আর্যপাঠাগারে প্রাক্তন ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগেও এদিন এখানে ক্লাশ বর্জন ও মিছিল বের করা হয়।

পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বইয়ের বাতিল দাবী করে মাদারীপুরেও ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে এবং একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রম করে।

নওগাঁ শহরের সরকারী হাইস্কুল, সরকারী গার্লস হাই স্কুলসহ বিভিন্ন ছাত্র--ছাত্রীরা ১১ আগষ্ট তৃতীয় দিনের মতো ধর্মঘট পালন করে।

মানিকগঞ্জে ২২ আগস্ট পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বইটি বাতিলের জন্যে সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করে এবং একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি পরে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে দেবেন্দ্র কলেজে সমাবেশ করে।[২৫৪]

স্কুল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তাদের বৃহত্তর সংগ্রাম আরো জোরদার করার দাবীতে পয়লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পুনরায় প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ তাদের এদিনের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি দেয়।[২৫৫]

২৯ আগষ্ট পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নও পয়লা সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক সমর্থন করে বিবৃতি দেয়।

এদিন ১৬ জন বুদ্ধিজীবী দেশ ও কৃষ্টি গ্রন্থখানি পুরোপুরি বাতিলের আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন, কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানে নম্বর কমিয়ে এবং সাধারণ বিজ্ঞানে ব্যবহারিক ক্লাশ বাতিল করে নতুন বই চালু করে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। এতে স্বাক্ষর করেন, কবি সুফিয়া কামাল, কবি জসিমউদ্দিন, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, ড: আহমদ শরীফ, ওয়াহিদুল হক, সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, বজলুর রহমান, জাহেদুর রহিম, জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান প্রমুখ।[২৫৬]

পয়লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকল ছাত্র সংগঠনের সমর্থনে ও স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুটি গ্রুপের ডাকে সারাদেশে 'দেশ ও কৃষ্টি' বইটি বাতিলের দাবীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটী ছাত্ররা সারাদেশেই খণ্ড খণ্ড মিছিল করে।[২৫৭]

মৌলভীবাজারে এদিন প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘট করে রাস্তায় এসে শ্লোগান দিতে থাকে। পরে স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মতিউর রহমানের

---

২৫৪ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ আগষ্ট ১৯৭০
২৫৫ ঐ ২৭ আগষ্ট ১৯৭০
২৫৬ ঐ ২৯ আগষ্ট ১৯৭০
২৫৭ ঐ দোসরা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা করে অবিলম্বে বইটি বাতিলের আহবান জানায়।[২৫৮]

৪ সেপ্টেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ইয়াফেস ওসমান ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম এক বিবৃতিতে স্কুল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ৮ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট সমর্থন করে একে সফল করার আহবান জানিয়ে এক বিবৃতি দেন।[২৫৯]

পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন,ছাত্রলীগ ও ডাকসুও এদিন ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করে।[২৬০]

এসময় ইসলামী ছাত্রসংঘ 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলন বিরোধিতা করে পাল্টা আরেকটি 'গণতান্ত্রিক স্কুল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ৯ সেপ্টেম্বর তাদের সমর্থিত ছাত্রদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কার্জন হলে। এতে সভাপতিত্ব করেন সোহায়েল আবদুল্লাহ মোয়াজ্জেম। তাঁরা জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে পাঠ্য তালিকাভুক্তি করার দাবী জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

এদিন মোহাম্মদপুর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক জনসভায় অধ্যাপক গোলাম আযম, পাকিস্তান আন্দোলনের উপর লিখিত একখানি বই বাতিলের দাবীতে বর্তমানে যে বিক্ষোভ চলছে সে ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের নিষ্প্রভ ভূমিকার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আমি বুঝে উঠতে পারছিনা যে, দেশের ভিত্তির উপর আঘাত স্বরূপ এই সব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সরকার কিভাবে সহ্য করছেন।[২৬১]

১১ সেপ্টেম্বর কার্জন হলে গণতান্ত্রিক স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় বক্তৃতা করেন ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা জামাল চৌধুরী ও মোস্তফা শওকত ইমরান। নেতৃদ্বয় জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়তে না দেওয়ার ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করেন।[২৬২]

---

২৫৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
২৫৯ ঐ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
২৬০ ঐ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
২৬১ ঐ
২৬২ ঐ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নারায়ণগঞ্জ স্কুলের ছাত্ররা ১০ সেপ্টেম্বর থেকে দেশ ও কৃষ্টি বই বাতিলের দাবীতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্লাশ থেকে বিরত থাকা শুরু করেন।[২৬৩]

ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে প্রদেশের সকল স্কুল-কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩দিন ব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে জেলা ও মহকুমা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট ও মশাল মিছিলের আহবান জানায়।[২৬৪]

৩০ সেপ্টেম্বর এ পরিষদের আয়োজিত বটতলার সভায় ডাকসুর সহসভাপতি আ. স. ম. রব 'দেশ ও কৃষ্টি' বইটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান।[২৬৫]

২২ অক্টোবর এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শিক্ষা বোর্ডগুলিকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মোতাবেক ৪টি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানগণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগিতায় 'পাকিস্তানের ইতিকথা' নামে একটি নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরী করছেন বলে জানান। এবং এ বই আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বইটিও প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।[২৬৬]

২৬ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বাতিল করে নতুন ভাবে 'পাকিস্তানের ইতিকথা' বই চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তাঁরা এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান জানান।[২৬৭]

'জীবন থেকে নেয়া'

উনসত্তরের আন্দোলনকে মূল কাহিনী করে অমর চলচ্চিত্র রূপায়ন করলেন জহির রায়হান। তার নাম দিলেন 'জীবন থেকে নেয়া'। ভাষা আন্দোলন, শহীদ মিনার,

---

২৬৩ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
২৬৪ ঐ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
২৬৫ ঐ পয়লা অক্টোবর ১৯৭০
২৬৬ ঐ ২২ অক্টোবর ১৯৭০
২৬৭ ঐ ২৬ অক্টোবর ১৯৭০

৬টি চাবি (৬ দফা) ইত্যাদি নিয়ে এ মহান চলচ্চিত্রটিকে অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান সেন্সর বোর্ড আটকে দেন।

১০ এপ্রিল (১৯৭০) ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। দর্শকরা ছবি দেখতে গিয়ে দেখে অন্য ছবি চলছে। সারা ঢাকা শহর ফেটে পড়লো এর প্রতিবাদে। ইট-পাটকেল ছুঁড়ে সিনেমা হলগুলো আক্রান্ত করলো তারা।[২৬৮]

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষায় প্রথম সরাসরি রাজনৈতিক ছবি এটি। বঙ্গবন্ধুকেই নায়ক করা হয়েছিল এতে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা মুক্তি দিতে অস্বীকার করে।

নিন্দা প্রতিবাদের মুখে অবশেষে মুক্তি দেওয়া হয় অমর চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'।

ডাকসু নির্বাচন: ১৯৭০

২৮ জানুয়ারী (১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরীর সভা-পতিত্বে সিণ্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গৃহীত হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, এখন থেকে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যক্ষভাবে। এর ফলে ডাকসুর সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদের সরাসরি ভোটে। পূর্বে ডাকসু নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। একেক বছর চক্রাকারে এক একটি হল থেকে ডাকসু কর্মকর্তারা নির্বাচিত হয়ে আসতেন।

গঠনতন্ত্র সংশোধনীর পর কর্তৃপক্ষ ১৬ মে (১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-র নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। এ প্রথম প্রত্যক্ষ সরাসরি ছাত্রদের ভোটে ডাকসু কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে বলে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে নতুন উদ্যম ও সাড়া জাগে।

নির্বাচন উপলক্ষে ইসলামী ছাত্রসংঘ উপাচার্য বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। এতে ১৮ ও ১৯ মে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি, নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বর্ষ অনার্স পরীক্ষা এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পরিচিত করার জন্য ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র ব্যবহারের অনুমতি দান ইত্যাদি সহ দশ দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

২৬৮ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ এপ্রিল ১৯৭০

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দুইটি পরিষদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ আ.স.ম রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখনকে তাদের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে। এ সত্ত্বেও বিরোধী গ্রুপ মাহবুবুল হুদা ভুইয়াকে ডাকসুতে সহ সভাপতি হিসাবে দাঁড় করায়। ছাত্রলীগের ইকবাল হল সংসদেও দুইটি পরিষদ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ জিনাত-শফিক পরিষদকে তাদের অফি-সিয়াল প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে। এনিয়ে ছাত্রলীগে উত্তেজনা চলতে থাকে।

কিন্তু ১৪ মে ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের প্রাক্কালে কলাভবনে গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের মূল ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর ৩টি উপদলের মতদ্বৈধতা। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর ৩টি উপদল মাহবুবউল্লাহ, দিলীপ বড়ুয়া এবং মোস্তফা জামাল হায়দার ও জুনোর নেতৃত্বাধীন অংশগুলি সকলেই ডাকসু নির্বাচন বয়কট করেছিল। কলাভবনে তারা নির্বাচন বিরোধী ৩টি বিভক্ত মিছিল বের করে।

কলাভবনে এসময় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র মিছিল চলছিল। এক পর্যায়ে বিভিন্ন দল শ্লোগান দিতে দিতে পরস্পর মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ বেধে যায়। মতিয়াপন্থীদের সাথে প্রথমে সংঘর্ষ বাধে মাহবুবউল্লাহ গ্রুপের। পরে জামাল হায়দার-জুনো গ্রুপও এতে যোগ দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন(মতিয়া)-র সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম সংঘর্ষে আহত হন।

সকল সংগঠনই এ ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেয়। নির্বাচনের সময় নির্বাচন বিরোধীদের তৎপরতা অশুভ ও অগণতান্ত্রিক বলে বিবৃতিদাতারা উল্লেখ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী সকলকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহবান জানান। নির্বাচন স্থগিত রাখার গুজবও তিনি অস্বীকার করেন।

ডাকসু নির্বাচনে নিম্নলিখিত ছাত্র সংগঠনগুলি সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে তাদের প্রার্থী দেয়:

১	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	:	আ.স.ম. আবদুর রব আবদুল কুদ্দুস মাখন
২	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	:	ফিরোজ আনোয়ার মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

৩	ইসলামী ছাত্রসংঘ	:	মাসুদ আলী আশরাফুজ্জামান খান
৪	বাংলা ছাত্রলীগ	:	খালিদ হাসিম ইকবাল সোবহান চৌধুরী
৫	এন.এস.এফ	:	মাহবুব সিদ্দিক মাজহারুল হান্নান
৬	গণতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট	:	নিয়ামতউল্লাহ মফিজুর রহমান

সর্বমোট ১৮৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এ বছর ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশ নেয়। মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র মধ্যে।

নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্রলীগের আ.স.ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন যথাক্রমে ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ৮টি হল সংসদের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন ৩টিতে এবং ছাত্রলীগ ৫টিতে জয়লাভ করে।

১৭ আগস্ট (১৯৬৯-৭০) সালের নব নির্বাচিত কার্যপরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড: কুদরাত-ই-খুদা। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকায় বিগত পরিষদের প্রতিবেদন পেশ করা সম্ভব হয়নি। বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য অভিষেক অনুষ্ঠানের বিচিত্রানুষ্ঠান বাতিল করা হয়। সভাপতির ভাষণে উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অতীতের কথা ভুলে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের নয়া অধ্যায় সৃষ্টির আহবান জানান।[২৬৯]

ইউকসু নির্বাচন: ১৯৭০

৩ জুলাই শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন। কেন্দ্রীয় ও হল সংসদের নির্বাচন একইদিন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (তোফায়েল)-এর মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

২৬৯ দৈনিক পাকিস্তান, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ মে এবং ১৮ আগস্ট ১৯৭০

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সবকয়টি আসনই ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) লাভ করে। ইয়াফেস ওসমান সহসভাপতি ও আবুল কাশেম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এপসু (মতিয়া) গ্রুপ নির্বাচনে জয়লাভ করে ২৪ ঘন্টা ব্যাপী একটি বিজয় উৎসব পালন করে।

নির্বাচনের ফলাফলের পর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাত্মক ছাত্র সংঘর্ষ ঘটে। নবনির্বাচিত সহসভাপতি ইয়াফেস ওসমান এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম এক বিবৃতিতে দাবী করেন, একটি ছাত্র সংগঠন পরাজয়ের গ্লানি এড়াতে না পেরে গুণ্ডামীর আশ্রয় নিচ্ছে।[২৭০]

বাকসু নির্বাচন: ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ)-এর ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ আগস্ট (১৯৭০)।

এখানেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে।

জহিরউদ্দীন তালুকদার সহসভাপতি এবং আবদুল খালেক সাধারণ সম্পাদক-এর পদসহ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) মোট ১৭টি পদে জয়লাভ করে।

বার্ষিকী সম্পাদক ও দুটি সদস্যপদে ছাত্রলীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে।[২৭১]

স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ছাত্র আন্দোলন: এলাকা ও বিষয় ভিত্তিক

গণঅভ্যুত্থানের পর সারাদেশের ছাত্রসমাজের দৃষ্টি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে তাদের নিজ নিজ স্থানীয় সমস্যার দিকে নিবদ্ধ হয়। বস্তুত ছাত্ররা এ সময়টায় তাদের নিজেদের লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ের সমস্যা নিয়েই বড় বড় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এবং এসব ক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র সংগঠন-গুলির জড়িত হওয়া ছাড়াই ছাত্ররা যার যার প্রতিষ্ঠান-বিভাগের ও এলাকার মাধ্যমে এসব আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দিতে সক্ষম হয়।

---

২৭০ দৈনিক পাকিস্তান, ৪, ৬, ৭ জুলাই ১৯৭০
২৭১ ঐ ১২ আগস্ট ১৯৭০

সমসাময়িক সময়ে ছাত্রদের স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে যেসব ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলন, বাণিজ্য ছাত্রদের আন্দোলন, প্রকৌশল ছাত্রদের আন্দোলন, কারীগরী প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের আন্দোলন, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্রদের আন্দোলন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমস্যা, জগন্নাথ কলেজের প্রাদেশীকিকরণ বিরোধী আন্দোলন, গ্রাফিক আর্টস ছাত্রদের আন্দোলন, মাদ্রাসা ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা, সমাজ কল্যাণ ছাত্রদের বিক্ষোভ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন, সমাজ বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলন, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের আন্দোলন, মহসিন হল ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলন, শিক্ষক ধর্মঘট, আই,ই, আর ছাত্রদের ধর্মঘটসহ প্রভৃতি বিভাগীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্ররা বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। এসব আন্দোলন পুরোটুকুই হয় অরাজনৈতিক ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র সংগঠনগুলির প্রভাব ছাড়াই। তবে বিভাগীয় ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছাত্ররা স্থানীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বেই এসব আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে অথবা জাতীয় রূপ দিতে সক্ষম হয়।

রংপুরে ১০ জুলাই ছাত্ররা পুলিশ হল প্রাঙ্গনে হাউজি খেলা ও অশ্লীল নৃত্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে পুলিশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে লাঠি চার্জ করলে বহু ছাত্র আহত হয়। ছাত্ররা বলে, যেখানে জেলার সর্বত্র দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছে সেখানে এ ধরনের প্রমোদ, প্রহসনের সামিল।[২৭২]

হবিগঞ্জে ৯ জুলাই সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের তরুণ সঙ্গীত শিক্ষক মিলন রায়কে অপহরনের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে শহরের সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[২৭৩]

পাবনা গোপালচন্দ্র ইনসটিটিউটের ছাত্ররা বিভিন্ন দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল। ২৪ জুন (১৯৭০) এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবীর সমর্থনে শহরের আটটি বেসরকারী হাইস্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে।[২৭৪]

দিনাজপুর মহিলা কলেজের ছাত্রীরা ১২ অক্টোবর কলেজ আমতলায় মিস মাসুম আরা হোসেন রেশমীর সভানেত্রীত্বে এক সভায় অবিলম্বে কলেজ ছাত্রী সংসদ

২৭২ দৈনিক পাকিস্তান, ১২ জুলাই ১৯৭০
২৭৩ ঐ ১৩ জুলাই ১৯৭০
২৭৪ ঐ ৭ জুলাই ১৯৭০

গঠনের দাবী জানায়। ছাত্রীরা কলেজের পরিচালনা পরিষদের বর্তমান কমিটি বাতিল এবং হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের অপসারণ দাবী করে।[২৭৫]

৩১ ডিসেম্বর (১৯৭০) কুড়িগ্রাম কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্ররা তাদের কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মীর আলী আখতার ও আবদুস সামাদকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। ছাত্ররা পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি, মহকুমা প্রশাসকের অপসারণ ও অন্যান্যদের প্রতি গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করার আহবান জানান।

এর আগে ২৯ ডিসেম্বরও ছাত্ররা স্থানীয় কুড়িগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ধর্মঘট পালন করে। ছাত্ররা এদিনও একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং কুড়িগ্রাম স্টেশন ক্লাবের ক্ষতিসাধন করে। ছাত্ররা এরপর মহকুমা পর্যায়ের সকল অফিসারদের বাড়ীর সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা প্রধান সড়কের বিভিন্ন মোড়ে সভা করে।

ছাত্ররা দাবী করে :

১ অবিলম্বে মডেল টাউন সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে স্টেশন ক্লাব নির্মাণ বন্ধ করতে হবে
২ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় বন্ধ করতে হবে
৩ সরকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে সরকারী বাড়ী প্রদান
৪ কুড়িগ্রাম থানার অফিস পূর্ব স্থানে ফিরিয়ে নেওয়া
৫ বর্তমান এস, ডি, ও - কে অপসারণ
৬ ও রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের মুক্তি দিতে হবে।[২৭৬]

১০ জানুয়ারী সাতক্ষীরায় ছাত্ররা ভুখা মিছিল বের করে, পরে তারা সাতক্ষীরা কোর্ট প্রাঙ্গনে বক্তৃতা করে। এই অপরাধে পুলিশ ৬০ নং সামরিক বিধিবলে ৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর ছাত্র নূরুজ্জমান ছাত্রদের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অন্য আর যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় তারা হচ্ছেন, গোলাম সফদর সিদ্দিকী ও আহমদ হোসেন কচি।

ছাত্ররা সাতক্ষীরা মহকুমাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবী জানাচ্ছিল।[২৭৭]

---

২৭৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ অক্টোবর ১৯৭০
২৭৬ ঐ দোসরা জানুয়ারী ১৯৭১
২৭৭ ঐ ১১ জানুয়ারী ১৯৭১

পটুয়াখালীর ছাত্ররা ২৬ জানুয়ারী বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্র বেতন মওকুফ, বইপত্র, কম্বল ও কাপড়-চোপড় সরবরাহের দাবীতে ছাত্ররা মিছিল করছিল। পটুয়াখালী মহিলা কলেজের ছাত্রীরাও ২৫ জানুয়ারী শহরে মিছিল করে উপদ্রুত এলাকার (১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে উপদ্রুত-লেখক) শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফ ও অন্যান্য সাহায্যের দাবীতে মিছিল করে।[২৭৮]

পটুয়াখালী শহরের সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্থানীয় ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে। ছাত্ররা এরপর স্থানীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক আবদুল আউয়ালের সভাপতিত্বে লতিফ স্কুলে এক সভায় মিলিত হয়ে ৬ দফা দাবী আদায়ের শপথ নেয়।[২৭৮]
ছাত্রদের ৬ দফা দাবী ছিল নিম্নরূপ:

১ দূর্গত এলাকায় ছাত্রদের এক বছরের বেতন মওকুফ
২ সমস্ত বেসরকারী স্কুলের ছাত্রদের প্রত্যেককে একশত টাকা সাহায্য দান
৩ কম্বল সরবরাহ
৪ ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ
৫ বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের এক বছরের অগ্রীম বেতন দান
৬ এবং রিলিফের মালের সুষ্ঠু বণ্টন করতে হবে।[২৭৯]

দাবী আদায় না হওয়ায় ২৫ ফেব্রুয়ায়ী থেকে ১৫ জন মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র অনশন ধর্মঘট শুরু করে। তারা ২০০ টাকা এককালীন সাহায্য, স্কুলের বেতন মওকুফ, মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ সরবরাহ, শিক্ষকদের এককালীন ১০০০ টাকা সাহায্য এবং ৫০০০ টাকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের দাবীও করতে থাকে।

অনশনের উদ্যোক্তারা জানান, পটুয়াখালী শহরের বাইরে মফস্বল থেকে আরো অনশনকারী ছাত্ররা দলে দলে এদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আসছে।[২৮০]

৩০ জুলাই খুলনা বিভাগের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় যশোরে স্থাপনের দাবীতে ছাত্রলীগের আহবানে যশোরের নোয়াপাড়ায় হরতাল পালিত হয়।

---

২৭৮ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জানুয়ারী ১৯৭১
২৭৯ ঐ, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
২৮০ ঐ, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

দাবী-দাওয়ার সমর্থনে এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে শহরের রাস্তাঘাট প্রদক্ষিণ করে। তবে পুলিশ প্রহরায় কিছু সংখ্যক বাস রাস্তায় চলাচল করে। ছাত্ররা তাদের ক্লাশ থেকে বিরত থাকে।

স্থানীয় টাউন হল ময়দানে বিকেলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ যশোর শাখার সভাপতি খান টিপু সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে জনাব আবদুল হাই, খয়রাত হোসেন, মহিউদ্দিন, শেখ আবদুস সালাম, হুমায়ূন কবীর ও রবিউল আলম বক্তৃতা করেন।[২৮১]

সিলেট মুরারীচাঁদ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্ররা ১৬ আগষ্ট কলেজের অধ্যাপক বাড়ানোর দাবীতে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। তারা জানায় কলেজের প্রতিটি বিভাগে অধ্যাপকের অভাব রয়েছে। এদিন থেকেই কলেজের ১ম বর্ষ ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাশ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ধর্মঘটী ছাত্ররা একটি মিছিল বের করে এবং শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রম করে। ছাত্ররা জানায় যতদিন না এই দাবী পূরণ হয় ততোদিন তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।[২৮২]

বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলন

২৬ ডিসেম্বর (১৯৬৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন দাবী ও সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের সুত্রপাত করে। ছাত্ররা কার্জন হল প্রাঙ্গনে মাঈনউদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বিজ্ঞানের ছাত্রদের এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে একসভায় মিলিত হয়ে ৭ দফা দাবী প্রস্তুত করে। এবং কর্তৃপক্ষকে এ দাবী মেনে নেওয়ার জন্য মাত্র ১ দিনের সময় দেয়া। বলা হয়, ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই দাবী মেনে নিতে হবে, অন্যথায় পয়লা জানুয়ারী থেকে ক্লাস বর্জন এবং অন্যান্য চরমপন্থা গ্রহণ করা হবে।[২৮৩]

সভায় বিজ্ঞান ছাত্রদের ভবিষ্যতে বেকার জীবন থেকে রক্ষা করার জন্য ফলপ্রসূ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠনের জোর দাবী জানানো হয়। সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা এব্যাপারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ

---

২৮১ দৈনিক পাকিস্তান, পয়লা আগষ্ট ১৯৭০
২৮২ ঐ ১৮ আগষ্ট ১৯৭০
২৮৩ ঐ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯

মুজিব, মাওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সহ সকল রাজনৈতিক নেতার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

কিন্তু এ কর্মসূচী শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। ধর্মঘটী ছাত্ররা ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) শনিবার আবার একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ফজলুল হক হলের ক্যান্টিনে কায়সার আহমদের সভাপতিত্বে আন্দোলন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এখানে 'বিজ্ঞান ছাত্র সমিতি' নামে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। পরে ছাত্ররা একটি মশাল মিছিল বের করে। ছাত্ররা সভায় তাদের দাবীনামা সুসংবদ্ধ করে। তাদের দাবী সমূহ নিম্নে সাজানো হল:

১ কৃষি ও কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এম.এস.সি ও বি.এস.সি ডিগ্রীধারীদের যথাক্রমে এম.জি.ও বি.এ.জি ডিগ্রীধারীদের সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে

২ তার ও বেতার বিভাগ, সিভিল এভিয়েশন, প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং ইলেকট্রোনিক্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পদার্থ ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানীদের গ্রহণ

৩ কক্সবাজার মেরিন বাইওলজি রিসার্চ ল্যাবরেটরী চালু, ফলিত রসায়নে এম.এস. সি ডিগ্রীধারীদের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গ্রহণ

৪ সকল এম.এস.সি ও বি.এস.সি ছাত্রীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করার পরিকল্পনা গ্রহণ

ঢাকা আনবিক শক্তি কেন্দ্রের বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন দু'টি কেন্দ্র স্থাপন

৫ এছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানের লবণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, পাট ও পাটখড়ির শিল্পভিত্তিক বৃহত্তর সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ

দেশে ব্যাপক হারে পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে বিভিন্ন স্থানে পুষ্টি রসায়ণ বিষয়ক গবেষণাগার স্থাপন

পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র এন্টিবায়োটিক প্রকল্প স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানা বাস্তবায়ন

৬ বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে অধিকতর বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ দান

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ও কলেজগুলিকে অধিক বই-পুস্তক, আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিতকরণ,

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণারত পোষ্ট গ্রাজুয়েটদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান

৭ পাকিস্তান সায়েন্টিফিক সার্ভিস প্রবর্তন ও মিনিস্ট্রি অব সায়েন্টিফিক এ্যাফেয়ার্স প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সকল বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নতুন বিভাগ চালু

গবেষণায় জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ এবং মোট বরাদ্দের ন্যূনপক্ষে শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয়,

বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত স্কলারশীপের শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের বিজ্ঞানীদের জন্য সংরক্ষণের নিশ্চয়তা,

নতুন জিওলজিক্যাল প্রজেক্ট চালু,

সিলেটের সুনামগঞ্জের নতুন সিমেন্ট কারখানা স্থাপন ও কাগজ শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি।[২৮৪]

বস্তুত বিজ্ঞান ছাত্র সমিতির দাবীসমূহ তাদের নিজস্ব দাবী হলেও এটা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গড়া। ফলে এ আন্দোলন দেশবাসীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং রাজনীতি সচেতন সকল ছাত্রের সমর্থন, এমনকি বিজ্ঞানের শিক্ষক, ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙালী বিজ্ঞানীদেরও সমর্থন কুড়িয়েছিল।

৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসান নয়া বিজ্ঞান ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তিনি অত্যন্ত খোলা-মেলা পরিবেশে বিজ্ঞান ছাত্রদের সাথে আলাপ করেন। তিনি স্বীকার করেন, সমাজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পূরণের পূর্বশর্ত হিসেবেই মুক্ত ও প্রতিবন্ধকতাবিহীন শিক্ষা পরিবেশের প্রয়োজন।[২৮৫]

---

২৮৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
২৮৫ ঐ ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

১১ ফেব্রুয়ারী ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ছাত্র প্রতিনিধিদল গভর্নর এস. এম. আহসানের সাথে দেখা করে তাদের ৭ দফা দাবীর সমর্থনে একটি স্মারকলিপি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান ছাত্রদের দাবী বিবেচনার জন্য ১৫ দিনের সময় চান। কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক আশ্বাস পেয়ে ছাত্ররা তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।[২৮৬]

কিন্তু কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় ছাত্ররা ২৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবনে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। এদিন সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ছাত্র সমিতির উদ্যোগে সহসভাপতি মাহবুব সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়।[২৮৭]

২৮ ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানের ছাত্ররা মার্চ মাসের মধ্যে তাদের সকল দাবী মেনে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে এক চরমপত্র দেয়। ৩ মার্চ এক সরকারী প্রেসনোটে সরকার বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। প্রেসনোটে আরো বলা হয়, চট্টগ্রামে একটি রিসার্চ ল্যাবরেটরী ও রূপপুরে দু'শ মেগাওয়াট পারমানবিক বিদ্যুত কারখানা স্থাপনের একটি স্কীমও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া, লবণ শিল্প সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনা সরকার শীঘ্রই কার্যকর করছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ছাত্রদের অন্যান্য দাবীও সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।[২৮৮]

৪ মার্চ (১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ছাত্র সমিতি সায়েন্সএনেক্স ভবনে এক সভায় মিলিত হয়ে সরকারী প্রেসনোট প্রত্যাখ্যান করে। সরকারকে পুরো দাবী মেনে নেওয়ার জন্য ৭ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সমিতির সভাপতি কায়সার আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বলা হয়, অন্যথায় ছাত্ররা আরো কঠোর পথের সন্ধান করবে।[২৮৯]

৭ এপ্রিল বিজ্ঞান ছাত্র সমিতি সংবাদপত্রে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলে যে, যদি সরকার ৮ এপ্রিলের মধ্যে তাদের দাবী-নামা না মেনে নেয় তাহলে সারা প্রদেশব্যাপী তারা ধর্মঘট শুরু করবে।[২৯০]

২৮৬ দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
২৮৭ ঐ ৩ মার্চ ১৯৭০
২৮৮ আন্দোলনের সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের পদার্থবিদ্যার ছাত্র মোশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত ডায়রী থেকে দাবীসমূহ সংগৃহীত। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের একজন কর্মকর্তা
২৮৯ দৈনিক পাকিস্তান, ৫ মার্চ ১৯৭০
২৯০ ঐ, এপ্রিল, ১৯৭০

৮ এপ্রিল সরকার ছাত্রদের এ নোটিশের জবাব দেয়। এদিন এক প্রেসনোটে ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট আকারে তাদের দাবী-দাওয়ার তালিকা পেশের আহবান জানায়। সরকার এ সম্পর্কে একটি কমিটি গঠনের সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল ৮ এপ্রিল প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে। এ সময় ড. ইন্নাস আলী ও প্রফেসর শাহ ফয়জুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।[২৯১]

১০ এপ্রিল ছাত্ররা তাদের ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিবসে বিজ্ঞান অনুষদে এক প্রতিবাদ সভা করে। ধর্মঘটী ছাত্ররা এদিন রাতে বিজ্ঞান অনুষদের সকল বিভাগে তালা লাগিয়ে দেয়। ১১ এপ্রিল থেকে শিক্ষকরা কোনো কক্ষে প্রবেশ করতে পারে নি। বিকেলে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন তালাগুলো খুলে দিলে ছাত্ররা তার বাড়ীতে চড়াও হয় এবং তাঁকে ঘেরাও করে রাখে। উত্তেজনা চরম পর্যায়ে যেতে পারে ভেবে উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী এসে ছাত্রদের শান্ত করেন।[২৯২]

১২ এপ্রিল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক সভায় মিলিত হয়ে কক্ষে তালা লাগানো এবং ডীনের বাসভবন ঘেরাও করার ঘটনার নিন্দা করে।[২৯৩]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্ররাও তাদের এ ৭ দফা দাবীর সমর্থনে ৯ এপ্রিল থেকে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করে। প্রায় দেড় হাজার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। উপাচার্য ছাত্রদের সাথে এক বৈঠক করেন কিন্তু ছাত্ররা তাদের আন্দোলন থামাতে অস্বীকার করে। পোস্টারে পোস্টারে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেয়ে যায়, সভা ও মিছিলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ সময় এক বিক্ষোভের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২৯৪]

বিজ্ঞান ছাত্র সমিতির এ আন্দোলন সারাদেশের বিজ্ঞান ছাত্রদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। পয়লা এপ্রিল থেকে দিনাজপুর সরকারী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাদের বিভাগে আরো বিজ্ঞান শিক্ষক, বিজ্ঞান গ্যালারী, বিজ্ঞান পাঠকক্ষ, গবেষণাগারের উন্নয়নসহ ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে।

---

২৯১ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ এপ্রিল ১৯৭০
২৯২ ঐ ১২ এপ্রিল ১৯৭০
২৯৩ ঐ ১৩ এপ্রিল ১৯৭০
২৯৪ ঐ ২৯ এপ্রিল ১৯৭০

কর্তৃপক্ষ দাবী মানতে অস্বীকার করায় ছাত্ররা শহরে মিছিল করে এবং অনির্দিষ্ট-কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে।[২৯৫]

পরে ছাত্ররা তাদের দাবীসমূহ সুনির্দিষ্ট করে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়। ছাত্ররা দাবী করে,

১ শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে
২ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা ও তার সংখ্যা বৃদ্ধি
৩ ল্যাবরেটরী কক্ষের সম্প্রসারণ
৪ কমনরুম, ক্যান্টিন ও রিডিং রুমের ব্যবস্থা
৫ এবং অনার্স কোর্স চালু করা ইত্যাদি।

পয়লা মে সংবাদপত্রে দিনাজপুরের বিজ্ঞান ছাত্রদের ধর্মঘটের উপর পূর্ব পাকিস্তানের চারটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ: ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এরা মোস্তফা জামাল হায়দার ও আতিকুর রহমান সালু, এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহীম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম বিবৃতি দেন। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানান।[২৯৬]

মেডিক্যাল, ডেন্টাল ও প্যারা মেডিক্যাল ছাত্রদের ক্ষোভ

জুন (১৯৭০) মাসে সরকার মেডিক্যাল কলেজ সমূহ থেকে ইন্টার্নী প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছিলেন। এ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সারাদেশের মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ছাত্ররা আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। কারণ ইন্টার্নী প্রথার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্ররা ছাত্রজীবনের পর সর্বপ্রথম চিকিৎসক হিসাবে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করে।

২৫ জুন বৃহস্পতিবার, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নী এসোসিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পক্ষ থেকে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওয়াজেদুল ইসলাম এক বিবৃতিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ইন্টার্নী প্রথা বিলোপের

২৯৫ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ এপ্রিল ১৯৭০
২৯৬ ঐ পয়লা মে ১৯৭০

তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, নতুন ডাক্তারদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইন্টার্নী প্রথা অব্যাহত রাখতে হবে।

২৭ জুন শনিবার, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এরপর একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে। ছাত্ররা বিভিন্ন স্থানে থেমে ইন্টার্নী ব্যবস্থা তুলে দিলে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে তা জনগণের সামনে তুলে ধরে। একই সঙ্গে ছাত্ররা দেশে একটি গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতেও শ্লোগান দেয়।

সারাদেশে এভাবে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা যখন আন্দোলনে নেমে পড়ছিল তখন ৩০ জুন সরকার এ সম্পর্কে একটি প্রেসনোট জারী করে। সরকার দাবী করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ইন্টার্নী প্রথা বাতিল করার সরকারী সিদ্ধান্তের সংবাদ সত্য নয়।

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়েও কথা উঠে। গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই পূর্ব-পশ্চিমের সকল ক্ষেত্রের মতো স্বাস্থ্য সার্ভিসেও যে নিদারুণ বৈষম্য চলছে তা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ছিলেন প্রথম থেকেই সোচ্চার। পাকিস্তান মেডিক্যাল সমিতির পূর্বাঞ্চল শাখা ২৮ এপ্রিল (১৯৭০) মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মেডিক্যাল শিক্ষা ও সার্ভিসের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের বর্তমান বৈষম্য যথাসম্ভব দ্রুত দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দাবী জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৪৭ সালে আজাদী লাভের পর থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের গতি অত্যন্ত শ্লথ। এই সময়ের মধ্যে করাচীতে জিন্নাহ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টার ও ইসলামাবাদে বিরাট জাতীয় মেডিক্যাল ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্সসহ বহু সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে একটি উপযুক্ত হাসপাতাল স্থাপনেও ব্যর্থ হয়েছেন।

পয়লা জুলাই (১৯৭০) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। কর্তৃপক্ষ নতুন ডাক্তারদের হাসপাতালে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।

দোসরা জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ এর প্রতিবাদে একটি সভার আয়োজন করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতেও বাধা দেয়। ডাক্তার-ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে এক বিবৃতিতে বলেন, একটি গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্যই তাঁরা সংগ্রাম করছেন। ডাক্তাররা জনান, বর্তমানে বিভিন্ন পদে যে শূন্য অবস্থা চলছে তাতে তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও যোগ দিতে রাজী আছেন।

এ দিন পুলিশ সদ্য পাশ করা দু'জন ডাক্তার ডা: হাফিজ ও ডা: হাবিবকে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করে। পরে এলিফ্যান্ট রোডস্থ বাসা থেকে ডা: ওয়াজেদুল ইসলাম খান ও পুরানা পল্টনস্থ বাসা থেকে পঞ্চম বর্ষের ছাত্র শফিউল হাসানকেও গ্রেফতার করে।

তেসরা জুলাই পূর্ব পাকিস্তান সরকার তিন মাসের জন্য ডাক্তার-নার্সদের কোন প্রকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেন।

সরকার ৬ জুলাই পরিস্থিতি মারাত্মক অবস্থায় মোড় নেওয়ায় সকল মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

পুলিশী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ইন্টার্নী প্রথা অব্যাহত রাখার দাবীতে ডাক্তার-ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সকল মেডিক্যাল কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেয়।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ঢাকা শহর শাখা ছাত্র-ডাক্তার সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আযম বলেন, ডাক্তারদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, আবার রোগীদের প্রতিও আছে। তাই সরকারকে দাবী মানতে ও ডাক্তারদের ধর্মঘট না করার জন্য অনুরোধ করে তিনি বিবৃতি দেন।

বেগম সুফিয়া কামাল, কবি জসিমউদ্দীন, রনেশ দাশ গুপ্ত, সত্যেন সেন, শহীদুল্লাহ কায়সার সহ ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক ছাত্র-ডাক্তারদের মুক্তি দাবী করে বিবৃতি দেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম ছাত্র-ডাক্তার সংগ্রাম পরিষদের প্রতি একাত্মতা ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবীতে প্রদেশব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের আয়োজন করার জন্য শাখাগুলোর প্রতি নির্দেশ দেন।

২১ আগস্ট মতিয়া গ্রুপ এ দাবীতে গভর্নর হাউজ ঘেরাও করে। এখানে আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন নূরুল ইসলাম, সাইফউদ্দীন আহমদ, রাশেদা খানম রীনা, আবুল কাশেম প্রমুখ। তাঁরা বলেন, মেডিক্যাল কলেজগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ রেখে দেশের চিকিৎসা শিক্ষাকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

সরকার ২৭ আগস্ট এক ঘোষণায় মেডিক্যাল কলেজগুলো খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

২৯ সেপ্টেম্বর ইসলামী ছাত্র সংঘ মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য সলিমুল্লাহ্ মেডিক্যাল কলেজকে মহিলা মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত করার আহবান জানান।

২০ অক্টোবর গভর্নর এ. এস. এম আহ্সান পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইনসটিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলাভবন থেকে শাহবাগ হোটেল ভবনে স্থানান্তরের ঘোষণা দেন।

ডেন্টাল কলেজের ছাত্রদের ৮ দফা:

ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) মাস থেকে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্ররা ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক সংগ্রাম গড়ে তুলে। দাবীগুলোর মধ্যে ছিল,

১ কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মতো পূর্ব পাকিস্তানে ডেন্টাল গ্রাজুয়েটদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি

২ ঢাকা ডেন্টাল কলেজে একজন পূর্ণসময়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ
৩ ডেন্টাল ছাত্র ও ডাক্তারদের জন্যে আবাসিক সুবিধা
৪ ডেন্টাল কলেজে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ
৫ ডেন্টাল গ্রাজুয়েটদের উন্নততর চাকুরীর সুবিধা ও
৬ ডেন্টাল গ্রাজুয়েটদের জন্যে কনডেনসড এম.বি.বি.এস কোর্স চালু।

পাকিস্তান ডেন্টাল সমিতির পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যকরী পরিষদ ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এক সভায় মিলিত হয়ে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্রদের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন

জানায়। সমিতি প্রদেশের দন্ত চিকিৎসার সুস্থ উন্নয়নের জন্যে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত দাবীগুলো মেনে নেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে আবেদন জানায়।

ছাত্রলীগ সমর্থিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে ৭ জন ছাত্র নেতা ২ মার্চ (১৯৭০) সোমবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে ডেন্টাল কলেজের ছাত্রদের ৮ দফা দাবী ভিত্তিক ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। তাঁরা বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠারও আহ্বান জানান।

প্যারা মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী

ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) থেকে শুরু হয় প্যারামেডিক্যাল ছাত্রদের ৯ দফার সংগ্রাম। ২ মার্চ সোমবার ছাত্ররা প্যারা মেডিক্যাল ইনসটিটিউটের প্রাঙ্গনে ৯ দফার সমর্থনে এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়। ছাত্র সংসদের সহসভাপতি সৈয়দ খালেদ বখত এতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। ছাত্ররা এ ধর্মঘট শুরু করে পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে।

ছাত্রদের দাবীর মধ্যে ছিল,

১ তাদের যথাযথ ডিপ্লোমা প্রদান
২ বেতনের হার ২১০ — ৪৫০ টাকা করা
৩ ৫০ টাকা হারে টেকনিক্যাল ভাতা প্রদান
৪ রিক্সা এলাউন্স ৩০ টাকা করে প্রদান
৫ উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।[২৯৭]

কারিগরী ছাত্রদের সংগ্রাম

১৯৭০ সালের ১০ ও ১১ জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান কারিগরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে। সম্মেলনে নূরুল আলম ফরিদকে সভাপতি ও মেসবাহুল করিমকে সাধারণ সম্পাদক করে কারিগরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

---

২৯৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৬, ২৮, ৩০ জুন ১৯৬৯, ২৯ এপ্রিল, ৭ ফেব্রুয়ারী, ৪, ৩ মার্চ ১৯৭০

এই সম্মেলনে গত ১২ ও ১৩ অক্টোবর (১৯৬৯) থেকে কারিগরী ছাত্ররা তাদের ৭ দফা আদায়ে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল তার পর্যালোচনা করা হয়। এদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ায় বলা হয়েছিল :

১ কারিগরী ছাত্রদের মেট্রিক টেক, ইন্টার টেক, বি.টেক, এম.টেকসহ সকল কারিগরী ডিপ্লোমাধারীদের রাজশাহী প্রকৌশল কলেজের অনুসরণে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা

২ শিক্ষা সফর চালু, অধ্যয়নরত অবস্থায় শিল্প-কারখানায় শিক্ষানবিশী ট্রেনিং

৩ ষ্টাইপেণ্ড-স্কলারশীপ-এর সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি

৪ উপযুক্ত পদমর্যাদা দান, কারিগরী ভাতা প্রদান, চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান

৬ গ্রাফিক আর্টস ইনসটিটিউটের ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক ত্রুটি, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসান

৭ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, লেদার টেকনোলজি, লিয়াকত টেকনিক্যাল ওয়ার্ডের অধ্যয়নরত ছাত্রদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবী বিবেচনা ইত্যাদি।

এসব দাবী ও সমস্যা সমাধানে সম্মেলনে প্রদেশব্যাপী ক্লাশ ও পরীক্ষা বর্জনের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করা হয়। তবে সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের পূর্বেই আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৫ জানুয়ারী (১৯৭০) থেকে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০ জানুয়ারী কারিগরী ছাত্ররা তাদের শিক্ষা পরিচালকের অফিস তালাবন্ধ করে দেয়। এদিনের ঘটনাবলীতে মূলতঃ ঢাকা পলেটেকনিক ইনস্টিটিউট ও গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট শাখার ছাত্ররাই অংশ গ্রহণ করে।

২২ জানুয়ারী (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে তোফায়েল আহমদ ও আ.স.ম. আবদুর রব সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ৭ দফা দাবী মেনে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান।

এদিকে কারিগরী ছাত্রদের আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ছাত্ররা সকাল ১০টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত গভর্নর হাউসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। গভর্নর পরে আশ্বাস প্রদান করায় ছাত্ররা তাদের অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ফিরে যায়।

১০ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তান সরকার এক প্রেসনোটে বলে, বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাধারীদের গেজেটেড মর্যাদা দান, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান, আন্তপ্রাদেশিক শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা এবং বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবী সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) কারিগরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে সকল কারিগরী ছাত্রদের ক্লাশে ফিরে যেতে আহবান জানান। নেতৃদ্বয় বলেন, প্রাদেশিক শিক্ষা সচিব ও কারিগরী শিক্ষা পরিচালকের কাছ থেকে দাবীসমূহ বিবেচনার আশ্বাস পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, কারিগরী ছাত্ররা ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর থেকে ক্লাশ ও পরীক্ষা বর্জন করে আসছিল।

কিন্তু কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্ররা তাদের নিজস্ব ৫ দফা দাবী আদায়ের প্রশ্নে অটল থাকে। ২৬ মার্চ এ কেন্দ্রের ছাত্রদের এক ইশতেহারে কিছু কিছু দাবী সরকার মেনে নেওয়ায় এবং অন্যান্য দাবী সম্পর্কে আশ্বাস দেওয়ায় ৩০ মার্চ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরী ছাত্রদের) তাদের প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুললে কারিগরী ছাত্রদের মধ্যে নতুন করে আন্দোলন গড়ে উঠে। ঢাকার পলেটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা পয়লা মে থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রকৌশল ছাত্রদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে নতুন করে ধর্মঘট শুরু করে।

১০মে পূর্ব পাকিস্তান কারিগরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করে। এ সম্মেলনে কারিগরী ছাত্ররা প্রকৌশলী ছাত্রদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

এরমধ্যে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা কারিগরী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার প্রিপারেটরী ক্লাশে ভর্তি হতে বাধা দেয়। প্রতিবাদে কারিগরী ছাত্ররা ১৮মে সারা প্রদেশে পলেটেকনিক ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে বি.এস.সি ও এম. এস. সি. ইঞ্জিনিয়ারদের প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

১১ জুন (১৯৭০) দিনাজপুর পলেটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র আবদুল মোতালেব, ইকবাল, সাবের জামিল, আজিজুল ইসলামকে সামরিক আইনের ১৬ বিধিবলে

গ্রেফতার করা হয়। এরা কারিগরী ছাত্রদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময়ে ২০ থেকে ৩১মে পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন। আরো ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়। পলেটেকনিক ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আটক ছাত্রদের মুক্তি দাবী করে একটি বিবৃতি দেয়।[২৯৮]

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিভিন্ন রকম আন্দোলন

অক্টোবরের (১৯৬৯) প্রথম সপ্তাহের দিকে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরন্নবী ও মুস্তাফিজুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র বিষয়ের সমস্যাসমূহ সমাধান করার আহবান জানান। তাঁরা এ মর্মে তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবীও পেশ করেন। তাঁরা বলেন:

১ পরীক্ষা ১৫ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বরের পরিবর্তে ২৫ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে হবে

২ প্রশ্নপত্রে শতকরা ৫০ ভাগ অতিরিক্ত প্রশ্ন দিতে হবে

৩ কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের ফেল করানো অথবা ফার্স্টক্লাশ না দেওয়ার ভয় দেখানো থেকে বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকদের বিরত থাকতে হবে।[২৯৯]

অক্টোবরের শেষ দিকে এসে দেখা যায়, ছাত্রদের এক বিরাট অংশ হল কর্তৃপক্ষের কাছে মেসিং টাকার ব্যাপারে ঋণী রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ ছাত্র মেসিং-এর বিল পরিশোধ করে নি। দেখা গেল, একমাত্র শের-এ-বাংলা হলেই বকেয়া টাকার পরিমান ২২,৫৯৭ টাকা। ফলে হলকর্তৃপক্ষ ২৪ অক্টোবর থেকে মেস বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ দেন। এসব ছাত্রকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়ার জন্য তাদের তালিকাও হল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা দাবী করে, পূর্বে মেসিং চার্জ না দেওয়ার কারণে কখনো পরীক্ষা দানের সুযোগ থেকে ছাত্রদের বঞ্চিত করা হয় নি,

---

২৯৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৩১, ৬,২৪ জানুয়ারী, ৯, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২৬ মার্চ, ১৯ মে, ১৫ জুন ১৯৭০

২৯৯ সাক্ষাৎকার, ইয়াফেস ওসমান ও আবুল কাসেম, (সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইউকসু ১৯৭০-৭১) এবং দৈনিক পাকিস্তান ৮ অক্টোবর ১৯৬৯

এ ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার ফল আটকিয়ে রাখা হতো। ছাত্ররা এ অমানবিক সুপাবিশ কার্যকরী না করার আহ্বান জানায়। তারা আরো বলে, ৫ দিনের মধ্যে দুই থেকে তিন শত টাকা পরিশোধ করা ছাত্রদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ তুলে ধরে যে, গত সেমিস্টারের মেরিট স্কলারশীপের তালিকা এখনো প্রকাশ করা হয় নি। ছাত্ররা অনেকেই এ বৃত্তির টাকা থেকে মেসিং-চার্জ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ছাত্ররা বলে, শুধুমাত্র অভিভাবকদের উপর নির্ভর করে প্রকৌশলী ছাত্রদের পড়াশুনা সম্ভব নয়।

নভেম্বরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়দে আযম হলের নাম পরিবর্তন করে তিতুমীর হল রাখার আন্দোলনে মেতে উঠে। আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তুতির পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় এর নিন্দা করে সংবাদ পরিবেশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ নভেম্বর (১৯৭০) বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার এক বিবৃতিতে নাম পরিবর্তনের খবরকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেন।

১৯৭০ সালের প্রথম দিকে সমগ্র প্রকৌশলী সমাজে চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেধে উঠে। প্রকৌশলীদের এ সম্পর্কিত আন্দোলন শুরু হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে। ১০ মার্চ (১৯৭০) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ একটি সর্বদলীয় ছাত্র সভার আয়োজন করে। এতে যোগদান করে ছাত্রইউনিয়ন মেনন, মতিয়া, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন হল সংসদের নেতারাও এতে যোগদান করেন। ইউকসু সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

এ সভায় প্রকৌশলীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১০ দফা প্রণয়ন করা হয়। দশ দফায় বলা হয়:

১ প্রকৌশল বৃত্তিতে অপ্রকৌশলীর নিয়োগ চলবে না এবং প্রকৌশলী ও স্থপতিদের উপর সি. এস. পি. অথবা অন্য কোন অপ্রকৌশলীর কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে:

(ক) অতিসত্ত্বর প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন ইপি আই ডিসি, ওয়াপদা, ওয়াসা ইত্যাদিতে এবং স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বিল্ডিং ডাইরেক্টরেট,

পাক পি ডব্লিউ ডি, বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদিতে অপ্রকৌশলীদের অপসারণ করে প্রকৌশলী ও স্থপতিদের নিয়োগ করতে হবে

(খ) প্রকৌশলী এবং স্থাপত্য বিভাগীয় সব সচিবালয় সার্ভিসে প্রকৌশলী ও স্থপতিদের নিয়োগ করতে হবে

২ খ্যাতনামা প্রকৌশলী ও স্থপতিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড আর্কিটেকটস কমিশন গঠন করতে হবে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত সব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকটস সার্ভিস এই কমিশনের পরিচালনাধীন থাকবে। এতে অবশ্যই জনসংখ্যা ভিত্তিক নিয়োগ নীতি বজায় রাখতে হবে

৩ কারীগরী পরিকল্পনাগুলো বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরিবর্তে সুযোগ্য দেশী ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের দ্বারা পরিকল্পিত হতে হবে

৪ ডিপ্লোমা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করা চলবে **না**, কিন্তু সে দায়িত্ব এড়াবার জন্য ডিপ্লোমাধারী ভাইদের রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ঘাড়ে না চাপিয়ে অবিলম্বে নতুন ইনস্টিটিউট স্থাপন করে ডিপ্লোমাধারীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলতে হবে

৫ সরকারী চাকুরীতে বর্তমান প্রচলিত বেতনের হার পরিবর্তন করে প্রকৌশলীদের জন্য কমপক্ষে প্রারম্ভিক ৭৫০ টাকা ও স্থপতিদের জন্য কমপক্ষে প্রারম্ভিক ৮৫০ টাকা এবং ১০০ টাকা করে কারিগরী ভাতা দিতে হবে। অন্যান্য ভাতাও বাড়াতে হবে

৬ পূর্ব পাকিস্তান সড়ক বিভাগ সহ অনুরূপ অন্যান্য বিভাগে প্রকৌশলী ও স্থপতিদের অস্থায়ীভাবে (এডহক ও ওয়ার্ক চার্জ বেসিস–এ) নিয়োগ করা চলবেনা। তাদের সরাসরি নিয়োগ করতে হবে

৭ (ক) প্রকৌশল এবং স্থপতিদের অবশ্যই চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে। অন্যথায় বেকার ভাতা দিতে হবে

(খ) সরকারী ও আধা সরকারী স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বিল্ডিং ডাইরেক্টরেট, বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদিতে স্থপতি ও প্লানারদের নিয়োগ করতে হবে এবং জাতীয় পরিকল্পনাগুলোতে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে

৮ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রূপপুর আনবিক শক্তি, যমুনা সেতু, তিস্তা জল বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে এবং প্রকৌশল ও স্থপতিদের জন্য অবিলম্বে একটি রিসার্চ ল্যাবরেটরী স্থাপন করতে হবে

৯ বর্তমানে প্রচলিত চার ও পাঁচ বছর মেয়াদী ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য ডিগ্রী কোর্সকে যথাক্রমে বি. এস. সি. বিই ও বি. এস. সি বি আর্ক নামে অভিহিত করে উভয়কেই দ্বৈত ডিগ্রীর মর্যাদা দিতে হবে। এবং এ সব শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করতে হবে

১০ প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য প্রকৌশলী ও স্থপতিকে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সব বাড়ীর নকশা ও ডিজাইন রেজিস্টার্ড স্থপতি ও প্রকৌশলীদের দ্বারা প্রণীত হতে হবে

দশ দফা প্রণয়নের পর উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠন ও হলের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত প্রকৌশলী ও ঢাকার বাইরে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ৬ এপ্রিল সোমবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে। সকাল ৮টায় একটি সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাশেষে একটি মিছিল বের করা হয়। সভায় রাজশাহী প্রকৌশল কলেজে ডিপ্লোমাধারী ছাত্রভর্তির নিন্দা করা হয় ও ডিপ্লোমাধারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের জন্য আলাদা ইনস্টিটিউট খোলার প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া প্রকৌশলীদের উপর সি.এস. পি. দের ক্ষমতা প্রয়োগের নিন্দা করা হয়। প্রকৌশলী ছাত্রদের বৃত্তির হার ৬০ টাকা হারে মঞ্জুর করার জোর দাবী জানানো হয়।

৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজশাহী প্রকৌশল কলেজে ডিপ্লোমাধারী ছাত্র ভর্তির প্রতিবাদে ও প্রকৌশলীদের ১০ দফা দাবী আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় দিনের মতো ধর্মঘট অব্যাহত রেখে মিছিল বের করে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন ডিপ্লোমা ছাত্রদের প্রকৌশল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আপত্তি তুলে ধর্মঘট করছে তখন ঢাকা পলেটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর ছাত্ররা (১১ এপ্রিল শনিবার) উচ্চ শিক্ষার দাবীতে পাল্টা মিছিল বের করে। মিছিলটি এক পর্যায়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে পুলিশ বাধা দেয় এবং এ সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাত্ররা ঘুরে পলাশী ও আজাদ হয়ে নজরুল ইসলাম হলে যেতে চাইলেও পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় পলেটেকনিক ছাত্ররা শ্লোগান দেয়, প্রকৌশলীদের ১০ দাফা মানিনা, উচ্চ শিক্ষা রুদ্ধ করা চলবে না ইত্যাদি।

এ সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও প্রকৌশল ও স্থপতি ছাত্রদের আন্দোলন সমর্থন করে এক বিবৃতি দেয়।

প্রকৌশল ছাত্রদের আন্দোলনের রেশ চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে গিয়েও পৌঁছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা ১০ দফার সমর্থনে ধর্মঘট শুরু করে। কর্তৃপক্ষ উত্তেজনার আশঙ্কায় রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্লাশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখে।

কেন্দ্রীয় প্রকৌশল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অব্যাহত ধর্মঘট ও আন্দোলনের পর্যায় হিসাবে প্রাদেশিক গভর্ণরের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১১ মে প্রকৌশলী ছাত্রদের ধর্মঘটের বত্রিশতম দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এ আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে চলে আসে। ১৩ মে সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মুস্তাফিজুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, দেশও জাতির সুষ্ঠু ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও অপব্যয় বন্ধ করে নিজেদের কাজ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে গ্রহণ করার জন্যই প্রকৌশলীরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি ডিপ্লোমাধারী ছাত্রদের বি.এস. সি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, ডিপ্লোমা ও ইঞ্জিনিয়ারিং দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ডিপ্লোমারা যেখানে ব্যবহারিক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, ইঞ্জিনিয়ারিং এ সেখানে অঙ্কন ও থিওরীর উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

তাই ডিপ্লোমা ছাত্ররা তাদের লাইনের উপরে উচ্চশিক্ষা লাভ করুক তা সমর্থন করি। আমাদের ১০ দফায়ও তা রয়েছে।

এ সময় রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে এক মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটে যায়। ডিপ্লোমা ছাত্ররা সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০ জুন (১৯৭০) রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রিপারেটরী কোর্সে ভর্তি হতে এসেছিল। কলেজের একদল ছাত্র তাদের উপর হামলা চালায়। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ই.পি. আর (বর্তমান বি.ডি. আর -লেখক) বাহিনী নিয়োগ করতে হয়।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী অবস্থান করা সত্ত্বেও ১১ জুন রাতে পুনরায় ছাত্র সংঘর্ষ ঘটে। কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

কারিগরী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ১২ আগস্ট বুধবার পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিরেক্টরের অফিসের

সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ছাত্রগণ উত্তেজিত হয়ে অফিসে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকলে পুলিশ দু'জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ছাত্রদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গতকাল প্রকৌশল ছাত্র ও ডিপ্লোমাধারীদের কতিপয় দাবী বিবেচনার জন্যে ইতঃপূর্বে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে ডিপ্লোমা পরীক্ষা পাশের পর পলিটেকনিক ছাত্রদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুপারিশ করা হয়।

এই রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৌশল বিশবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এবং ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাশ বর্জন করে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

২২শে আগস্ট শনিবার প্রকৌশল বিশবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে। তারা প্রকৌশল বিশ্বদ্যািলয়কে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সিদ্ধান্ত ও সম্প্রতি প্রকাশিত কারিগরী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ জানান এবং রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সহ প্রদেশের সব মেডিকেল্ কলেজ খোলা, গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রের মুক্তির দাবী জানান।

এই উপলক্ষে সকাল ৮টায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সভাপতি জনাব ইয়াফেস ওসমানের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব ইয়াফেস ওসমান তার বক্তৃতায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে বিজ্ঞান ফ্যাকালটি খোলার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন প্রকৌশল বিষয়ক অন্যান্য বিভাগ খোলার কথা বিবেচনা না করে কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্ত ছাত্ররা কিছুতেই মেনে নেবে না। তিনি রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সহ প্রদেশের মেডিকেল কলেজসমূহ খোলারও দাবী জনান।

সভাশেষে ছাত্ররা একটা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি মেডিকেল কলেজ, কার্জন হল ও সেক্রেটারিয়েট হয়ে গভর্নর হাউসের সামনে সমবেত হয়। এ সময় গেটে ডিউটিরত অফিসারকে ছাত্ররা একটা স্মারকলিপি প্রদান করে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইউকসু)-এর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ও হল ছাত্রসংসদের সহসভাপতিবৃন্দ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতিবৃন্দ ২ সেপ্টেম্বর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রে অনার্স কোর্স খোলার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

নিজেদের সমস্যাবলী উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন যে, এমনিতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ও বাসস্থান সমস্যা এবং শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির অভাবে জর্জরিত। তাছাড়া যেখানে পূর্ব প্রস্তাবিত প্রকৌশল বিষয়ক কয়েকটি বিভাগ খোলা সম্ভব হচ্ছেনা সেখানে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করে কয়েকটি অপ্রকৌশল বিষয় অনার্স কোর্স খোলা আদৌ উচিত হবে না।

অক্টোবরের (১৯৭০) ২২, ২৫, ২৮, ২৯ তারিখে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট, উপাচার্য অফিস ঘেরাও ইত্যাদির মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্থাপত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ও অনুষদের ডীন ড: জহির হোসেনের অপসারণ দাবী করে ছাত্ররা ধ্বনি দেয়। অপরদিকে যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যক্ষ ড: ভি.জি দেশীকে বিভাগে রেখে তাঁর অপসারণ আদেশ বাতিলের দাবী জানাতে থাকে।

ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব প্রস্তাবিত আই বি এম ৩৬০ কম্পিউটার স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিলের নিন্দা করে। ছাত্রসংসদের সহ সভাপতি ইয়াফেস ওসমান ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ সমাবেশগুলিতে ভাষণ দেন।

২১শে ডিসেম্বর থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ধর্মঘট শুরু করে। ২৬ ডিসেম্বর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অটো প্রমোশনের দাবীতে উপাচার্যের বাস ভবন ঘেরাও করে। ১৩ জানুয়ারী রাজশাহী প্রকৌশল কলেজের ছাত্ররা তাদের ৫ দফা দাবীতে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। ছাত্ররা দাবী করে:

১ ঢাকা, চট্টগ্রামের প্রকৌশল কলেজের মতো রেফার্ড পরীক্ষার পরিবর্তে সাপলি-মেন্টারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে
২ এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে
৩ পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষার শতকার ৩০ ভাগ নম্বর পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে
৪ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।[৩০০]

---

৩০০ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ অক্টোবর, ২৭ নভেম্বর ১৯৬৯, ১২ মার্চ, ৭, ১০, ১২, ৩০,এপ্রিল, ৪ মে, ১১, ১২ জুন, ১৩, ২৩ আগস্ট, ৩ সেপ্টেম্বর, ২৩, ২৬, ২৯, ৩০ অক্টোবর, ২৪, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, ১৩ জানুয়ারী ১৯৭১ এবং সাক্ষাৎকার: ইয়াফেস ওসমান ও আবুল কাসেম

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন

১৯৬৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব পাকিস্তান কৃষি ছাত্র সমিতির সভাপতি আবদুল হামিদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কৃষি ছাত্রদের দু'দফা দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আহবান জানান। তিনি বলেন, কৃষি ছাত্রদের দাবীর উপর দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও জাতীয় সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

১১ অক্টোবর (১৯৬৯) শনিবার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম আবদুর রব এক যুক্ত বিবৃতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দু'দফা দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির চাকুরীর ক্ষেত্রে বেতন, কারিগরী ভাতা, পদ মর্যাদা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নিয়োগ সংক্রান্ত দু'দফা দাবী সরকার আজো মেনে নেন নি। ১৯৬২ সাল থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের দু'দফা দাবী আদায়ে আন্দোলন করে আসছে। বিগত দিনগুলোতে তাদের দাবী সরকার আংশিকভাবে দু'দফা মেনে নেয় কিন্তু আজো তা বাস্তবায়িত হয় নি।

১৮ ডিসেম্বর (১৯৬৯) কৃষি ছাত্র সমিতির সভাপতি আবদুল হামিদ ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে দু'দফা দাবী পূর্ণরূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করে। এর মধ্যে কৃষি ছাত্ররা তাদের ধর্মঘটের ৮০দিন অতিক্রম করে। ছাত্ররা তাদের আন্দোলনে উপাচার্য ভাঙন সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা উপাচার্য ড: কামাল উদ্দিনের পদত্যাগের দাবী করে।

৮০ দিন ধর্মঘটের পরও ছাত্ররা ক্লাশে ফিরে না আসায় উপাচার্য অভিভাবকদের কাছে ছাত্রদের সম্বন্ধে একটি পত্র লেখেন। ছাত্ররা উপাচার্যের কার্যকলাপেরও নিন্দা করে বিবৃতি দেয়।

২৭ ডিসেম্বর থেকে কৃষি ছাত্ররা তাদের দু'দফা দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এ দিন ছিল ধর্মঘটের ৯০তম দিবস। ছাত্ররা উপাচার্যের

পদত্যাগ দাবী করে। উপাচার্যের বাস ভবনে এসে ছাত্ররা সেখানে অবস্থান নেয়। ছাত্ররা জানায় দাবী আদায় না হলে তারা পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনেও অবস্থান ধর্মঘট করবে।

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর কর্মকর্তাগণ ৮ আগস্ট শুক্রবার দু'টি পৃথক বিবৃতিতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পাঠ্য তালিকায় বাংলা ভাষা শিক্ষাদান অব্যাহত রাখার দাবী জানান।

কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড: আলীম আল রাজী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম এক বিবৃতিতে বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকল্পনার বরখেলাপ এবং বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমীক কাউন্সিল ও অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির প্রভাবকে পদদলিত করে কর্তৃপক্ষ কেন যে বাংলাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এবং পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষা চালু করার দাবী করা হয়েছে। বাংলাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দেয়া জাতীয় এই দাবীর প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শনের সামিল বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। এই ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্যে তাঁরা সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহসভাপতি আ.স.ম. আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে বাংলা ও ইংরেজী বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেন। এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বাংলা চালু করার দাবী জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে বাংলা ও ইংরেজী পাঠ্য বিষয় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় নাকি উপাচার্য বাংলা বিষয় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের সাথে সাথে তিনি নাকি ইংরেজী বিষয়ও পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের সাথে মতবিরোধের বিষয়টি অন্যভাবে সমাধান করা যেত বলে তাঁরা মনে করেন।

৮ সেপ্টেম্বর সন্তোষ থেকে মওলানা ভাসানী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগ তুলে দেওয়ার নিন্দা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি সমিতি প্রদেশের সকল সাধারণ বিশ্ববিবদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার দাবী জানিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর পাল্টা আরেকটি বিবৃতি দেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (বাকসু) -এর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতা জহিরউদ্দিন তালুকদার ও আবদুল খালেক এক বিবৃতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান অনুষদ খোলার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁরা বলেন, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়ে অনার্স ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স খুলে সারা প্রদেশের ক্রমবর্ধমান ভর্তি সমস্যা মেটানো যাবে না। সুতরাং অযথা বিবৃতি দান থেকে সকল মহলের বিরত থাকা উচিৎ। এতে সাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হবে।

বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ১২ অক্টোবর বাকসু নেতাদের সমর্থন করে বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ কলা অনুষদ বা বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার কোনো যুক্তি নেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বরং কৃষির আরো বিষয় খুলে কৃষি শিক্ষার অধিকতর সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২০ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন ও শিক্ষকরা এক বিবৃতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও সাধারণ বিজ্ঞান অনুষদ খোলার দাবীর বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, এ সব দাবী অযৌক্তিক এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিবিরুদ্ধ ও আবেগ প্রসূত দাবী। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মহাপরিকল্পনার অনেক কর্মসূচীই যেখানে এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন বাকী রয়েছে সেখানে অন্য রকম বিষয় খোলার দাবী অযৌক্তিক।

দোসরা জানুয়ারী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ উপাচার্য ড: কামালউদ্দিনের অপসারণ দাবী করে। বাকসু নেতারা বলেন, উপাচার্যের ক্ষতিকর কার্যকলাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। ছাত্ররা তাঁর অপসারণের দাবীতে চরমপত্র দিয়ে ধর্মঘট করছে বলে তাঁরা জানান।

কিন্তু একই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনরা পাল্টা বিবৃতি দিয়ে বলেন, কিছু সংখ্যক ছাত্রের গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও নিয়মিত ক্লাশ হচ্ছে।

ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ছাত্রইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে ছাত্রদের দাবী সমর্থন করেন।

তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দাবী দাওয়ার প্রতি শুধু উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন নি, নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ২টি প্রতিনিধিদল ৮ জানুয়ারী প্রাদেশিক গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ভাইস এডমিরাল এস.এম আহসানের সাথে দেখা করেন। ছাত্র প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে গভর্নর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনশন ধর্মঘটরত ৬ জন ছাত্রের প্রতি ধর্মঘট প্রত্যাহার এবং সুষ্ঠুভাবে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতার আবেদন জানান। তিনি বলেন, তদন্ত কমিশন শীঘ্রই সমস্যার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তা সমাধানের সুপারিশ করবেন।

গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ছাত্ররা ধর্মঘট করে আসছে এবং গত পয়লা জানুয়ারী প্রথম বর্ষের ছাত্ররা তাদের বার্ষিক পরীক্ষা বর্জন করে। এ দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন ছাত্র গত ২ তারিখ থেকে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে।

ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) সভাপতি নুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পৃথক পৃথক বিবৃতিতে অবিলম্বে উপাচার্যকে অপসারণ করে সংকট অবসানের আহবান জানান।[৩০১]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রকম সমস্যা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রদবদলের একটি খবরে দোসরা নভেম্বর (১৯৬৯) এখানকার ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় উপাচার্য হিসাবে কর্মরত ছিলেন

৩০১ ১, ১৪ অক্টোবর, ২০, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৯, ৯ আগষ্ট, ৮, ১১, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১২,২০ অক্টোবর, ১৯৭০, ২,৬,৯ জানুয়ারী ১৯৭১-দৈনিক পাকিস্তানের বিভিন্ন সংখ্যা

ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক। তাঁকে অপসারণ করে জনৈক সরকারী কর্মকতাকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।

ছাত্র শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে এর বিপক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, গভর্নর এস.এম আহসান, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখের কাছে জরুরী তারবার্তা পাঠানো হয়। বার্তায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার কাজের অভিজ্ঞতা নেই এমন কোন সরকারী কর্মচারীকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করায় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে। সে জন্য বহিরাগত কোন উপাচার্য নিয়োগ করা অনুচিত। এ পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককেই মনোনীত করা যথাযথ হবে বলে বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

জানুয়ারী (১৯৭০) মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টিগ্রেটেড অনার্স কোর্স চালু করা হয়। ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এই কোর্স প্রত্যাহারের দাবীতে ৭ জানুয়ারী অনার্স ছাত্রদের এক সভা বিশ্ববিদ্যালয় বাসস্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেখান থেকে মিছিল করে ছাত্ররা উপাচার্যের কাছে যায় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্ররা উপাচার্যকে এ কোর্স প্রত্যাহারের ১০ দিনের সময় সীমা বেধে দেয় এবং এ সম্পর্কে একটি চরমপত্র প্রদান করে।

উপাচার্যের সাথে বৈঠকের পর অনার্স কোর্সের ছাত্ররা অন্যান্য সাধারণ ছাত্রদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়। এ সভায় দাবী আদায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরদিন ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তেজনা মুখর হয়ে উঠে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে। তীব্র উত্তেজনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা এক সর্বদলীয় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি শাসমুজ্জামান হীরা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছাড়া অন্যান্য সকল ছাত্র সংগঠন, ছাত্রইউনিয়ন (মেনন), এন. এস. এফ, বাংলা ছাত্রলীগ, ইসলামী ছাত্রসংঘও এতে যোগদান করে।

ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করে বন্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা করে এবং অবিলম্বে অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী গঠনতন্ত্র বাতিলের আহ্বান জানান। ছাত্রনেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন।

অটোপ্রমোশনের দাবীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ প্রথম পর্বের ছাত্ররা ৪ জানুয়ারী (১৯৭১) মোট ৪ ঘন্টা উপাচার্যের কক্ষের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। এ সময় শিক্ষকরা বোঝাতে আসলে ছাত্ররা তাঁদের সাথে বিরূপ আচরণ করে। ছাত্ররা বলে, দাবী না মানলে তারা ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। চাকসুর সাধারণ সম্পাদক এ সময় ছাত্রদের আচরণে দুঃখ প্রকাশ করে।

৫ জানুয়ারী সারাদিন ধর্মঘটী ছাত্ররা পুনরায় উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাও করে রাখলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক কামাল মোস্তাফা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ছাত্ররা তবু ঘেরাও প্রত্যাহার করতে সম্মত হয় না। শিক্ষকরা এই সময় হুমকি দেন, যদি ছাত্ররা পরীক্ষা না দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন কলুষিত করে তাহলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আহসানুল হক ৬ জানুয়ারী এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অযৌক্তিক দাবীর নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন, কিছু সংখ্যক ছাত্র বিনা পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভের চেষ্টা করছে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে এজন্য দুর্ব্যবহার করছে। তাদের দাবী অযৌক্তিক এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে তা ক্ষতিকর। পরীক্ষার্থীদের ভুল পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য অভিভাবকদের কাছে তারা আবেদন জানান।

বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেনও এক বিবৃতিতে এক শ্রেণীর ছাত্রের হঠকারী আচরণের নিন্দা করেন।

এ দিকে ছাত্ররা ৬ জানুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট পালন করে এবং প্রিলিমিনারী সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলাওল হলে এক সভায় মিলিত হয়ে পরীক্ষা ছাড়াই প্রমোশন দাবীর কথা পুর্নব্যক্ত করে।

ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সাথে দেখা করেন, কিন্তু কোন সমঝোতা হয় নি। উপাচার্য বলেন, কিছু সংখ্যক ছাত্রের খামখেয়ালীপনাকে কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

৭ জানুয়ারী এম.এ প্রিলিমিনারী ছাত্ররা অটোপ্রমোশনের যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়। ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর উপাচার্যের সাথে দেখা করে।

উপাচার্য ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক ছাত্রদের শুভবুদ্ধি ফিরে আসায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩০২]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবীনামা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৫ অক্টোবর (১৯৬৯) থেকে অনির্দিষ্ট কালের ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্ররা তাদের সংগ্রামের কর্মসূচী হিসেবে ১৫ দফার একটি দাবী নামাও প্রস্তুত করে:

১ শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহা ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজের আশু বাস্তবায়ন
২ সমাজকর্ম কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিভাগীয় মর্যাদা দান
৩ অনার্স শ্রেণী থেকে ভাষাপত্র তুলে দেওয়া ও সমাজিক পরীক্ষায় পাস ডিগ্রী কোর্সে কোন প্রকার পূর্বশর্ত ব্যতীত ঐচ্ছিক করা
৪ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস কোর্সের ভাষাপত্রে তিনটি পত্রে যেখানে পাশ ঘোষণা করার যে পূর্বরীতি চালু তা পূনঃপ্রবর্তন
৫ আইন বিভাগের ডিগ্রী শ্রেণীতে বাংলা শিক্ষার মাধ্যম সহ অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় বাংলাকে অপশন দেওয়া
৬ ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে যে দ্বিতীয় ও উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণী বা বিভাগ চালু ছিল তা বাতিল করে ৪০ থেকে ৫৯ নম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণী করা
৭ সমাজবিজ্ঞান বিভাগকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে পরিণত করা
৮ নবাগত ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে আরও নতুন হল চালু করা
৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তাঘাট পাকা করা
১০ ১৯ থেকে ২৫ নম্বরের নীচে কোন পত্র বাতিল প্রথা বিলোপ
১১ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ক্ষতিগ্রস্থ স্থায়ী জনগণের সন্তানদের ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ দান
১২ বিজ্ঞান ছাত্রদের সুবিধার জন্য গবেষণাগারের সরঞ্জাম ক্রয় করা
১৩ কেন্দ্রীয় মিলনায়তন, নবাব আবদুল লতিফ ছাত্রাবাসে মিলনায়তন, ছাত্রীবাসে মিলনায়তন, আমীর আলী ছাত্রাবাসে নূতন ভবন নির্মাণ করা
১৪ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীবাসে বিবাহিত ছাত্রীদের থাকার সুযোগ দান
১৫ সৈয়দ আমীর আলী হলের টিন সেডের বর্ষাকালীন সমস্যার সমাধান

৩০২ দৈনিক পাকিস্তান, ২ নভেম্বর ১৯৬৯, ৮ জানুয়ারী, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, ৫,৬,৭,৮ জানুয়ারী ১৯৭১

এ ১৫ দফা দাবীর সমর্থনে ছাত্ররা ১৫ অক্টোবর থেকে ধর্মঘট শুরু করার পর প্রোকটর ৪ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস জারী করে। ফলে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ২১ অক্টোবর (১৯৬৯) ছাত্ররা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। ছাত্ররা এরপর শহীদ মিনার ও আমতলায় দুটি পৃথক সভায় কর্তৃপক্ষের নিন্দা করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ২০ আগস্ট ১৯৬১ সালের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স-এর ৬নম্বর ধারা বাতিল করার বিষয়ে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। এই ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের ছিল। উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে ছাত্ররা এ ধারা বাতিলের জন্যও আন্দোলন করে।

এ সময় রাজশাহী সরকারী কলেজের সহ সভাপতি আবদুস সামাদের নেতৃত্বে ছাত্ররা কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবীতে ৯ই আগষ্ট এক সাধারণ সভা করে। ছাত্ররা জানায়, দাবী না মানলে ২৫ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তারা ধর্মঘট করবে।৩০৩

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়: প্রতিষ্ঠাকালীন সংকট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার সরকারী পরিকল্পনা শুরুতেই ভেস্তে যায়। ছাত্র, শিক্ষক ও দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ এই পরিকল্পনার বিরোধীতা করে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই সকল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে একে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

৮ জুলাই/(১৯৭০) ঢাকা হাইকোর্টের ২৫জন আইনজীবী এক বিবৃতিতে চলতি শিক্ষাবছর থেকেই সকল শাখায় ছাত্রভর্তি করার আহ্বান জানান।

এন. এস. এফ (দুলন) গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বরের সভায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

---

৩০৩ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪, ২২ অক্টোবর, ২১ আগস্ট ১৯৭০

৩ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালযের প্রথম উপাচার্য (মহামহাপধ্যায়) ড: এনামুল হকের পরিবর্তে ড: মফিজউদ্দিন আহমদকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।

নতুন উপাচার্য ২৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কলা বিভাগ চলতি বছর থেকেই খোলার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষনা করেন এবং বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি শুরু হবে।

২৩ আগস্ট শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞানে পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চলতি শিক্ষা বছর থেকে সরকার ঘোষিত কেন্দ্রীয় বিশবিদ্যালয় চালু করার দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা নেহায়েত সীমিত বলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর উচ্চশিক্ষার্থীদের চাপ হ্রাস পাবে না এবং ভর্তি সমস্যা সমাধান হবেনা। এ ছাড়া কলা বিষয়কে পাঠ্য তালিকা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া বাস্তব সম্মত হয়নি।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হলেও এ ব্যাপারে সরকার নিশ্চুপ রয়েছে। অথচ এই ধরণের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখেনা।

১৪ জানুয়ারী (১৯৭১) পূর্ববাংলা ছাত্রইউনিয়ন অবিলম্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার আহবান জানায়।

২৪ জানুয়ারী গণঅভ্যূত্থান দিবস উপলক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এ সভার আয়োজন করে।

মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ প্রথম ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন, আমানুল হক, আব্দুল খালেক ও আমিনুল ইসলাম।

সভায় এক প্রস্তাবে আসন্ন একুশের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের দাবী জানানো হয়। এ ছাড়া এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে কমিউনিস্ট নেতা মণিসিংহ ও দেবেন শিকদারের মুক্তি দাবী করা হয়।[৩০৪]

৩০৪ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই, ১২, ৪, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২৪ আগস্ট ১৯৭০, ২৫ জানুয়ারী ১৯৭১

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ ছাত্রদের সংগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা ৩০ ডিসেম্বর (১৯৬৯) মধুর কেন্টিনে তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী আদায়ের সংগ্রামকে তরান্বিত করার জন্য এক সাধারণ সভা করে। সভায় একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং ৫ দফা দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি চূড়ান্ত করে তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে।

সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের ৫দফা দাবীর সমর্থনে ১৭ জানুয়ারী (১৯৭০) থেকে ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। প্রতীক ধর্মঘট পালনের চিহ্ন হিসেবে ছাত্ররা কাল ব্যাজ পরিধান করে ক্লাশে হাজির হয়।

২৭ জানুয়ারী সোমবার ছাত্ররা বিভাগের ছাত্র হোসেন ইমামের সভাপতিত্বে কলাভবনের বটতলায় একটি সভা করে। সভাশেষে ছাত্ররা প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিচালকের অফিস ঘেরাও করে। ছাত্ররা পরে প্রাদেশিক সচিবালয়ের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সমাজকল্যাণ কলেজের ছাত্ররা তাদের সমস্যার ভিত্তিতে ৭দফা দাবী প্রস্তুত করে। এরপর দাবী আদায়ে তারা ধর্মঘটের আশ্রয় নেয়। ধর্মঘটের দশম দিবসে দোসরা এপ্রিল বৃহস্পতিবার আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্ররা ৭ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করে এবং দাবী না মানার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে ৭দফা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করে।

সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রের ছাত্ররা ৮এপ্রিল বুধবার তাদের ৭দফা দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘটের ১৬তম দিবস পালন করে। প্রাদেশিক সমাজকল্যাণ সচিব ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা ছাত্রদের এক সভায় দাবী পূরণে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ছাত্ররা তাদের দাবীর সমর্থনে সুস্পষ্ট সমর্থন না পাওয়ায় ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে।[৩০৫]

বাণিজ্য ছাত্রদের দাবী আদায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কারণে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। ছাত্ররা

৩০৫ দৈনিক পাকিস্তান, ২২, ২৮ জানুয়ারী, ৪,৯ এপ্রিল ১৯৭০

তাদের সমস্যার ভিত্তিতে ৫দফা দাবী প্রণয়ন করে উপাচার্যের সাথে ১৩ মার্চ শুক্রবার (১৯৭০) দেখা করে। সংগ্রাম পরিষদ ১২ মে'র মধ্যে বাণিজ্য ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের আহবান জানায়, অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করা হবে বলে হুমকি দেয়।

কোনো সন্তোষজনক সদুত্তর না পেয়ে বাণিজ্য ছাত্ররা ৬ এপ্রিল (১৯৭০) থেকে ধর্মঘট শুরু করে। বটতলায় এদিন তারা একটি ছাত্রসভাও করে। ছাত্ররা তাদের দাবী মেনে নেওয়ার তারিখ আরো এক মাস এগিয়ে নিয়ে আসে। তারা ১২ এপ্রিল পর্যন্ত সরকার ও কর্তৃপক্ষকে এজন্য সময় দেয়। ছাত্ররা অন্যথায় ১৩ এপ্রিল থেকে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট শুরু করার কর্মসূচী ঘোষণা করে। তারা কলাভবনে প্রতিদিন বিক্ষোভ করতে থাকে।

১১ এপ্রিল শনিবার উপাচার্য বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বাণিজ্য ছাত্রদের দাবী অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক বাণিজ্য অনুষদ খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাণিজ্য ছাত্রদের আন্দোলনের এটাই ছিল মূল দাবী।

২৫শে মার্চ (১৯৭০) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনুরূপ পৃথক বাণিজ্য অনুষদ গঠনের দাবীসহ মোট ৬টি দাবী আদায়ের সংগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মোহাম্মদ ইউসুফ ও রবিউল হোসেন।

ছাত্ররা এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে নিম্নলিখিত ৬দফা প্রণয়ন করে ও এ দাবী আদায়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়:

১ বর্তমান বাণিজ্য বিভাগকে কলা অনুষদ থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র বাণিজ্য অনুষদ গঠন করতে হবে
২ এর অধীনে হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স বিভাগ পৃথক পৃথক ভাবে চালু করতে হবে
৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী শিক্ষাবছর থেকে বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনার্স কোর্স চালু করতে হবে
৪ কেন্দ্রীয় কমার্স সার্ভিস চালু করতে হবে

৫ সরকারী ও আধা সরকারী, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্য ছাত্রদের সরাসরি নিয়োগ করতে হবে।[৩০৬]

মহসিন হল ছাত্রদের দাবী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসিন হলের আবাসিক ছাত্ররা দীর্ঘদিন থেকেই কতকগুলি দাবীর সমর্থনে সংগ্রাম করে আসছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার প্রতি কোনো সুনজর না দেওয়ায় সাধারণ ছাত্ররা হলের টেলিভিশন কক্ষে এক সভায় মিলিত হয়। এতে সাধারণ ছাত্ররাই বক্তৃতা করে। বক্তৃতা শেষে ছাত্ররা কতগুলি প্রস্তাব দাবী আকারে পেশ করে।

ছাত্ররা বলে,

১ (ক) উন্নতমানের (খ) খাঁটি ও (গ) নির্ভেজাল খাবার (ঘ) যথাসময়ে পরিবেশন করতে হবে

২ মাসিক 'ফিস্ট' -এর ব্যবস্থা করতে হবে

৩ (ক) বর্তমান মেস কমিটি ভেঙে দিতে হবে
(খ) এ কমিটিকে সঠিক হিসাব দিতে হবে
(গ) সৎ ছাত্রদের দ্বারা মেস পরিচালনা করতে হবে

৪ হাউস টিউটর ও প্রাধ্যক্ষের বাসায় নিজস্ব কাজে হলের বয়--বেয়ারাদের ব্যবহার করা চলবে না।

উল্লেখ্য দাবীগুলির অধিকাংশই ছিল ছাত্রদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা কেন্দ্রীক। একদল ছাত্র মেস কমিটির নামে দূর্নীতির আখড়া গড়ে তোলায় সাধারণ ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে এবং এসব দাবীনামা পেশ করে।[৩০৭]

আইন ছাত্রদের দাবী-দাওয়া

দোসরা জানুয়ারী (১৯৭০) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এল.এল.বি দিবা ও নৈশ বিভাগের ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ছাত্ররা তাদের দাবী না মানা পর্যন্ত ক্লাশে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। ছাত্ররা বলে:

---

৩০৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ মার্চ, ৮, ১২, ২, এপ্রিল ১৯৭০
৩০৭ ঐ, ১৪ জুলাই ১৯৬৯

১ তাদের বাংলা মাধ্যমে আইন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে
২ আইন বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষকে অপসারণ করতে হবে
৩ বিভিন্ন ছাত্রাবাসে আইন বিভাগের ছাত্র--ছাত্রীদের থাকার সুবিধা প্রদান করতে হবে।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবা বিভাগে আইন বিষয় ও এল.এল.বি ডিগ্রী পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ছিলনা। ঢাকার আইন ছাত্রদের এটি ছিল বহুদিনের জনপ্রিয় দাবী।

২৭ মার্চ (১৯৭০) ছিল পূর্বপাকিস্তানের প্রাচীনতম আইন কলেজ ঢাকা সিটি ল' কলেজের ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। সভাপতির ভাষণে কলেজের অধ্যক্ষ ড: আলীম আল রাজী ছাত্রদের দাবী পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।[৩০৮]

জগন্নাথ কলেজ সরকারীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন

ঢাকা নগরীতে অবস্থিত সর্ববৃহৎ বেসরকারী কলেজ জগন্নাথ কলেজ আইয়ুব শাসন আমলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ঘাটি হিসাবে পরিগণিত হয়। এক অর্থে বলা চলে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মূল সাংগঠনিক শক্তি ছিল প্রথমে জগন্নাথ কলেজ। এ কলেজ থেকে মিছিল না আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা সরগরম হয়ে উঠতো না। যতোক্ষণ জগন্নাথ কলেজ থেকে মিছিল না আসতো ততোক্ষণ সভাকে বিলম্বিত করা হতো। তৎকালে ছাত্র আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজ ছিল এতোই গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান জগন্নাথ কলেজকে বশে আনার জন্য কলেজটি সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় সরকারীকরণকে প্রাদেশিকীকরণ বলা হতো (বর্তমানের জাতীয়করণ)। মোনায়েম খানের এই নীল নক্সার বিরুদ্ধে ছাত্র শিক্ষক উভয় দিক থেকেই প্রবল প্রতিবাদ উঠে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হবে এমন আশংকা থেকেই ছাত্ররা বেশী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। এছাড়া, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া ও নৈশ বিভাগ চালু দাবী নিয়ে ও ছাত্র অসন্তোষ ঘটে।

৩০৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জানুয়ারী, ২৯ মার্চ ১৯৭০

প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন হলেও এর তীব্রতা গণঅভ্যুত্থানের সময়ে এতো বড় আকার ধারণ করে যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের প্রণীত ১১দফা কর্মসূচীতেও তা শুধু অন্তর্ভুক্ত করেনি, এ ইসুটি ১নং দফায়ও স্থান করে নেয়। ১১দফার ভিত্তিতে গণঅভ্যুত্থান ঘটলে এবং আইয়ুব-মোনায়েমের বিদায়ে অনেকেই ভেবেছিলেন, সরকার হয়তো জগন্নাথ কলেজকে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন। কিন্তু এর কোনই সুরাহা হয় নি।

মোনায়েমের পরিবর্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন গভর্নর ড: এম এন হুদার সাথে তার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ছাত্ররা দেখা করলে তিনি ৭ দিনের মধ্যে এর একটা বিহিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কলেজকে প্রাদেশিকীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানের পর মাত্র কয়েকদিন ঝিমিয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরই ছাত্ররা সামরিক আইনের মধ্যেই আবার এ বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। ২৩ এপ্রিল (১৯৬৯) ৭ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জগন্নাথ কলেজকে সরকারীকরণের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন। তাঁরা একই সাথে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কলা ও বাণিজ্য এবং নৈশ্য শাখা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও নিন্দা করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ড: কুদরাত-ই-খুদা, সুফিয়া কামাল, ড: এনামুল হক প্রমুখ।

১৫ জানুয়ারী (১৯৭০) বৃহস্পতিবার জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা তাদের দাবীর সমর্থনে উচ্চ মাধ্যমিক নির্বাচনী পরীক্ষা বর্জন করে মিছিল বের করে ডি পি আই অফিসে গিয়ে মহাপরিচালকের সাথে দেখা করে। ছাত্রদের এ সময় নেতৃত্ব দেন কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এম এ রেজা।

২০ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় কলেজ প্রাঙ্গনে দিবা ও নৈশ বিভাগের ছাত্ররা এক মৌন প্রতিবাদ সভা করে। কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এম এ রেজা এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় ছাত্ররা ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে জগন্নাথ কলেজকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার আহবান জানান। অন্যথায় ছাত্ররা পয়লা ফেব্রুয়ারী গভর্নর হাউজের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ছাত্ররা এরপর একটি মশাল মিছিল নিয়ে গভর্নর হাউজের সামনে ধর্ণা দেয়। গভর্ণর এস এম আহসান খবর পেয়ে ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ দেন।তিনি ধৈর্য ধরে ছাত্রদের কথা শোনেন এবং ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

কিন্তু গর্ভণরের আশ্বাসের কোন বাস্তবায়ন না দেখে ছাত্ররা ২৮ জানুয়ারী থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সভাপতি জনাব শামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম ৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) বুধবার এক বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজের প্রাদেশিকীকরণ বাতিল করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানান। বিবৃতিতে তারা জগন্নাথ কলেজের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে এ আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

১৯ ফেব্রুয়ারী জগন্নাথ কলেজের ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এম. এ রেজা ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁরা এ সম্পর্কে ১২ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকার জগন্নাথ কলেজের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখাই সমীচিন মনে করছেন। ফলে ধর্মঘট অব্যাহত রাখা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জগন্নাথ কলেজ ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংসদ কলেজের সকল ছাত্র সংগঠন নিয়ে আন্দোলনকে সর্বদলীয় রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। সংগাম পষিদের সদস্য নির্বাচিত হন ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এম. এ রেজা ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দীন, ছাত্রলীগ কলেজ শাখার নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন ও মাইদুল ইসলাম। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র জি. এম ইয়াকুব ও শাহাদৎ হোসেন, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর কল্লোল সেন ও মোশারফ হোসেন।

২৭মার্চ (১৯৭০) জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এম এ রেজা এক বিবৃতিতে স্টেট ব্যাংক ভবন হস্তান্তর করার আহ্বান জানান। তিনি দাবী সমূহ মেনে নেওয়ার জন্য এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময় বেধে দেন। তিনি বলেন, তা নাহলে ছাত্ররা আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করবে।

২৭ এপ্রিল (১৯৭০) সোমবার সকাল ১০টায় ছাত্ররা কলেজ চত্বরে এক সভা করে মিছিল নিয়ে ডি পি আই অফিস ঘেরাও করে। পরে তারা ডি পি আই এর সাথে দেখা করে তাদের সমস্যা অবহিত করে।

২৮ এপ্রিল ছাত্ররা কলেজের সকল ভবনে তালা লাগিয়ে দেয় এবং কলেজের পুরো ভবন তারা দখল করে রাখে।

৬ মে জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে গভর্নর হাউজ, শিক্ষা সচিব ও ডি পি আই অফিসের সামনে ধর্ণা দেয়। ধর্ণা শেষে ছাত্ররা ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃহস্পতিবার ছাত্রধর্মঘট আহ্বান করে।

পরদিন ৭মে বৃহস্পতিবার ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এরপর নগরীতে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একটি প্রতিবাদ সভায়ও ছাত্ররা মিলিত হয়। বক্তারা অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানায়। তারা এ কলেজের নৈশ বিভাগ, এম এ ও এম কম ক্লাস চালুরও দাবী জানায়।

১০ মে (১৯৭০) জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সংবাদপত্রে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিচালকের নির্দেশক্রমে ১১মে সোমবার থেকে কলেজের সকল ক্লাস শুরু হবে।[৩০৯]

নটরডেম কলেজের ছাত্রদের ক্ষোভ

নটরডেম কলেজের ছাত্ররা দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রশাসনিক নিবর্তন ও কর্তৃপক্ষের অযথা হয়রানীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নটরডেম কলেজ, একটু ব্যতিক্রম। কখনো তাকে আলাদা দ্বীপের মতো মনে হয়।

সারাদেশের ছাত্ররা যখন বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় তখনো প্রশাসনিক কড়াকড়ির কারণে ছাত্ররা তার থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে যায়।

কিন্তু ১৯৭০ সালের ১২ই জানুয়ারী থেকে ছাত্ররা অসীম সাহসিকতায় দীর্ঘদিনের অচলায়তনকে ভেঙে ১১ দফার ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু করে। ১৬ জানুয়ারী ধর্মঘটের চতুর্থ দিবসে ছাত্ররা একটি সাধারণ সভা করে।

ছাত্ররা অভিযোগ করে

১ কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কোনো সংগঠন করার অনুমতি দেন না

২ প্রতি বছর পাবলিক বেট ২০ টাকা এবং সুযোগ-সুবিধা ফী ৫০ টাকা করে

---

৩০৯ সাক্ষাৎকার, জি. এম ইয়াকুব (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, জগন্নাথ কলেজ শাখা, ১৯৬৯-৭০) এবং দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ এপ্রিল, ৬৯, ১৮, ২৮, জানুয়ারী, ৬, ১৯, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২৭ মার্চ, ২৮, ২৯ এপ্রিল, ৬, ৮ মে ১৯৭০

ছাত্রদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। অথচ এ টাকা দিয়ে কি হয় তা ছাত্ররা জানে না

৩ কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কথায় কথায় বহিস্কার করেন

৪ ছাত্রদের নানা প্রকার হয়রানী করা হয় বলে ছাত্ররা অভিযোগ তোলে

৫ ছাত্ররা অবিলম্বে মুসলিম ও হিন্দু হোস্টেল নির্মাণ

৬ এবং ছাত্র সংসদের নির্বাচনও দাবী করে।[৩১০]

মাদ্রাসা ছাত্রদের বিভক্ত সংগ্রাম

মাদ্রাসা ছাত্রদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের প্রয়াস নিয়ে প্রথমেই বিভক্তি এসে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রধান ছাত্র সংগঠন ছিল জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া। কিন্তু মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী ছাত্র সংঘেরও কিছু কিছু কাজ ছিল। মাদ্রাসার বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে যখন ছাত্ররা আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয় তখন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলাম ও তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ, 'কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সংস্থা গঠন করে ৮ দফা দাবীনামা প্রণয়ন করে।

কিন্তু এতে মাদ্রাসা ছাত্রদের মূল সংগঠন জামায়াত তালাবায়ে আরাবিয়াকে রাখা হয় না। ফলে ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণের চেয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষই প্রধান রূপ পায়। একপক্ষ ধর্মঘট ডাকলে অন্যপক্ষ তার বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলন জাতীয় রূপ নিতে অক্ষম হয়। অথচ সারদেশে মাদ্রাসার শাখা থাকার কারণে এ আন্দোলনের জাতীয় রূপ পাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা ছিল।

এসময় মার্চ, ১১(১৯৭০) তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জামিয়তুল মোদারেসীন (মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন) তাদের ৯ দফা দাবীর সমর্থনে ঢাকায় গভর্নর হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মাদ্রাসার শিক্ষকরা ডি. পি. আই অফিসেও যায় এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান নেয়।

ছাত্রসংঘ সমর্থিত কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৩মে থেকে ৯ মে পর্যন্ত সারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ৮ দফা দাবীর সমর্থনে মাদ্রাসায় ধর্মঘটের ডাক দেয়। তাদের ৮ দফার মূল দাবী ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে পূর্ব পাকিস্তানে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

---

৩১০ দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জানুয়ারী ১৯৭০

কিন্তু জামিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া এ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেয়। ৩ মে মাদ্রাসায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে বলে মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে ইসলামী ছাত্রসংঘ বিবৃতি দিলে তালাবায়ে আরাবিয়ার নেতৃবৃন্দ তা মিথ্যা বলে পাল্টা বিবৃতি দেয়। তালাবায়ে আরাবিয়া ৪ মে এক বিবৃতিতে ছাত্রসংঘের এ ধর্মঘটের ডাক সম্পর্কে বলে যে এটা হল জামাতে ইসলামীর ধর্মের নামে ধর্মবিরোধী কার্য-কলাপের উস্কানী। তারা বলেন, প্রদেশের কোনো মাদ্রাসাতেই ধর্মঘট হয় নি।

ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলে, আলিয়া মাদ্রাসায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে এবং সেখানে একটি প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তালাবায়ে আরাবিয়ার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা ক্লাশ করতে গেলে জামাতে ইসলামীর লোকেরা ছাত্রদের বাধা দেয় এবং জীবন নাশের হুমকি দেয়। কিন্তু এরপরেও ছাত্ররা ক্লাশে অংশ নেয়।

৮ মে কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বলে, শোভাযাত্রা, ছাত্র জমায়েত, পরীক্ষা বর্জন ইত্যাদি কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ৬ মে বুধবার প্রদেশে মাদ্রাসা ছাত্রদের ধর্মঘটের চতুর্থ দিবস অতিবাহিত হয়েছে। তারা ৮ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেয়। পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়ের উদ্দিন এক বিবৃতিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী সমর্থন করে সরকারের কাছে অবিলম্বে দাবীসমূহ মেনে নেওয়ার আহবান জানান।

৮ মে মাদ্রাসার ধর্মঘটী ছাত্ররা জুম্মা নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল নিয়ে ঢাকা শহরের রাজপথ পরিক্রমণ করে। তারা ডি পি আই অফিস, সচিবালয় ও গভর্নর হাউসের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৩১১]

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন

১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনকে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ও দুর্ঘটনা ঘটে তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সমাবর্তন উৎসব হতে পারে নি। কারণ নিয়ম অনুযায়ী সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্য (চ্যান্সেলর)। কিন্তু গভর্নর যেহেতু আচার্য, সুতরাং মোনায়েম খান গভর্নর থাকাকালীন আর সমাবর্তন উৎসব আয়োজন করা যায় নি।

---

৩১১ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ মার্চ, ৪, ৫, ৮, ৯ মে ১৯৭০

দীর্ঘ ছয় বছর পর ৮ মার্চ (১৯৭০) রোববার সকাল নয় টায় অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এস. এম. আহসান ১৯৬৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রদান করেন। ৬১৫ জন স্নাতকোত্তর গ্রাজুয়েট সমাবর্তনে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রী নেন। আচার্য ৩ জনকে আনুষ্ঠানিক পি এইচ ডি ডিগ্রীও প্রদান করেন। ডিগ্রী প্রাপ্তরা পূর্বদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সুসজ্জিত মঞ্চে তাদের নির্ধারিত সমাবর্তন পোশাক (গাউন) পরে মহড়া (রিহার্সেল) দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সমাবর্তন উৎসবে এবারই প্রথম বাংলায় অভিভাষণ প্রদান করা হয়। আচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে বিরাজিত বর্তমান অস্থিরতা ও তাদের ক্ষোভের কারণগুলো গুরুত্বের সাথে এবং অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রদের উত্তেজনা প্রশমনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সমাবর্তনকে বাদ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কল্পনা সহজ নয়। এবারের সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের সত্তাকে ফিরে পেয়েছে। উপাচার্য আশ্বাস দেন, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কেউ বাধার সম্মুখীন হবে না। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে কোনো সরকারী হস্তক্ষেপ হবে না বলে আচার্য জানিয়েছেন।

দেশজোড়া বিগত গণবিক্ষোভে ছাত্রদের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনাকালে উপাচার্য বলেন, বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে নিদারুণ অর্থ অপচয়, বাক স্বাধীনতা লোপ, স্বাধীনতা হরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, বিনাবিচারে ছাত্রদের কারাগারে নিক্ষেপ ইত্যাদির কারণে বিগত সরকারের পতন হয়েছে। তিনি বলেন, এ সবের পুনরাবৃত্তি না হলে রোগের মূল উৎপাটিত হবে।

উপাচার্য আরো বলেন, দেশজোড়া বিক্ষোভ আন্দোলনের প্রচণ্ডতা সবচেয়ে বেশী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষ বর্জন করে রাজপথে নেমে আসে। তাদের ত্যাগ, সাহস ও দেশাত্মবোধের কাছে ক্ষমতালিপ্সু সরকারকে বিদায় নিতে হয়েছে। তরুণদের সাধনা সফল হয়েছে এবং দেশ. গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলছে।

জ্ঞানার্জনে ব্রতী তরুণকে শান্ত, সংহত ও সংযত হওয়া এবং গবেষণা ভবন, শ্রেণীকক্ষ ও গ্রন্থাগারে তাদের আনাগোনায় ভরে তোলার জন্য তিনি আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড: মাহমুদ হোসেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা দানের প্রণালী ও পরিবেশন পন্থার আমূল সংস্কার করে একটি ত্রিমাত্রিক পথের আলোকে গড়ে তুলতে হবে।এগুলো হলো,

১ তরুণের চিত্ত এবং ব্যক্তিত্ব পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করে তোলা
২ নতুন জ্ঞানের সঞ্চার করা এবং
৩ সমাজের কল্যাণে সেই জ্ঞানের পথ নির্দেশ করা।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূল দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করে ড. মাহমুদ হোসেন বলেন, এই শিক্ষা আমাদের দেশ ও মানুষের মর্মগত আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্মগ্রহণ করে নি। ৬ এপ্রিল (১৯৭০) লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন উৎসব মাঝপথে এসে ভণ্ডুল হয়ে যায়। সমাবর্তন মঞ্চে ছাত্র ও নতুন গ্রাজুয়েটদের বিক্ষোভের দরুণ তার করুণ পরিণতি ঘটে।

ছাত্ররা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে শ্লোগান দিতে থাকে, আমরা চাকুরী চাই, ডিগ্রী চাই না'।

বিক্ষোভের মুখে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্য ও গভর্নর লে: জেনারেল আতিকুর রহমান অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

একদল ছাত্র এ সময় প্যাণ্ডেলে ফুলের টব ভেঙে ফেলে। এক দলকে তাদের ডিগ্রী সনদপত্রে আগুন ধরাতে দেখা যায়।[৩১২]

---

৩১২ দৈনিক পাকিস্তান, ৮, ৯ মার্চ, ৭ এপ্রিল ১৯৭০

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এভাবে ছাত্রদের স্থানীয় ও আশু দাবী সংবলিত লাগাতার আন্দোলনের ফলে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরগরম হয়ে উঠতে থাকে।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে আন্ত:দ্বন্দ, ভাঙন ও মতাদর্শগত বিরোধ চলতে থাকায় ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া চলতে থাকলেও, সাধারণ ছাত্রদের আশু এবং স্থানীয় সমস্যা ও বৈষয়িক দাবীর আন্দোলন ছাত্র রাজনীতিকে সমানভাবে চাঙ্গা রাখতে সমর্থ হয়।

৬২ সালের পর বিভিন্ন বিষয় ও শ্রেণীর ছাত্রদের বৈষয়িক দাবীকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন এমনভাবে আর কখনো দানা বেঁধে উঠেনি। বরং ৬৯ পরবর্তী এই আশু দাবী সংবলিত ছাত্রদের আঞ্চলিক ও স্থানীয় আন্দোলন ছিল আরো বেশী বৈচিত্র্যময় এবং জঙ্গীপূর্ণ।

আর এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল, এই সময় একমাত্র নূর খান শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও পাকিস্তান: দেশও কৃস্টি বই বাতিলের আন্দোলন ছাড়া বাকী প্রায় সবগুলো স্থানীয় ছাত্র আন্দোলন ছিল সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা স্বত:স্ফূর্তভাবে গড়া।

তবে এক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় দিক হল, এসব স্থানীয় ও আশু দাবীর ছাত্র আন্দোলনগুলিতে অংশ গহণকারী সাধারণ ছাত্ররা ছিল ৬৯-এর গণঅভ্যূত্থানের চেতনায় উজ্জীবিত। এই মন্তব্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় মেলে বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলনের দাবীনামার পরিচয়ে। পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যের রাজনৈতিক চেতনার আলোকে গড়া ছিল তাদের দাবীনামা।

'পাকিস্তান দেশ ও কৃস্টি' গ্রন্থটি বাতিলের আন্দোলন সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ ছিল প্রাথমিকভাবে পাঠ্যসূচীর (সিলেবাসের) বোঝার বাড়াবাড়ি। পরে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলি এতে রাজনৈতিক চেতনা ছড়াতে সক্ষম হয়। ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগেও গ্রন্থটি চিহ্নিত হয়। পাকিস্তানের সামরিক নেতারা

ক্ষমতায় এসেই (৬৯ সালের প্রথমার্ধে) ছাত্রদের সাথে যে সখ্যতার ভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করে এইসব ছাত্র আন্দোলন তা নস্যাত করে দেয়।

যে পরিস্থিতি পাকিস্তানের সমগ্র রাজনীতিকে ঢিমে তালে নিয়ে গিয়েছিল, ৬৯ পরবর্তী সাধারণ ছাত্র আন্দোলনই তার থেকে রাজনীতিকে বের করে নিয়ে আসে। কারণ ইয়াহিয়া খান কোন প্রকার 'রাজনৈতিক অভিলাষ' নেই বলে এদেশের রাজনীতিতে পদচারণা শুরু করে নির্বাচনের যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আর এই নির্বাচন থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা-ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুভ সূচনার ইঙ্গিতকে প্রতিষ্ঠিত করে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া খানের আগমণ থেকে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সময়টা মুক্তিযুদ্ধের প্রাক প্রস্তুতির বিষয়গত অবস্থার শর্তকে সম্পন্ন করে। এই সময়েই বিভিন্ন সংগঠনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি, ইশতেহার রচনা, প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে এ নিয়ে মতদ্বৈধতা শুরু হয় এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ধর-পাকড়, বিচার, গ্রেফতার, পরোয়ানা জারী ও শাস্তি-দান চলতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী এই সময়টায় ছাত্র-জনতা এর বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলেনি একথা সত্যই, কারণ সেই সময়টাতে (১৯৭১) সমগ্র পাকিস্তান ছিল নির্বাচনের সংগ্রামে সরগরম। ফলে ছাত্রদের স্বভাব-রীতি মোতাবেক প্রতিরোধ সংগ্রাম সেভাবে গড়ে না উঠলেও কোন প্রকার উসিলায় সামরিক সরকার নির্বাচন বাতিল করে দিতে পারে এই আশংকাও ছাত্রদের মধ্যে ছিল, এবং পাকিস্তানের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে তা অসম্ভব কল্পনাও ছিল না। জনতা এর প্রতিশোধ নেয় নির্বাচনে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে। নির্বাচনের রায় পাকিস্তানের রাজনীতিকে নতুন গতি দেয় এবং সামরিক সরকার ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা তা মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন, বাংলার ছাত্র-জনতার কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

পরিশিষ্ট

শিক্ষানীতির নামে প্রতিক্রিয়াশীলদের মিথ্যা অপপ্রচার সম্পর্কে ছাত্র সমাজের আবেদন

দ্বিতীয় সামরিক সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ সমর্থন করিতে পারে নাই। সামরিক সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমর্থক ইসলামী ছাত্রসংঘ নামক একটি তথাকথিত ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের মুরব্বী জামাতে ইসলাম নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং অযথা ''ইসলাম বিপন্ন'' প্রভৃতি শ্লোগান তুলিয়া আইয়ুব-মোনায়েম আমলের মতই পুরাতন কায়দায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে বল্গাহীন অপপ্রচার চালাইতে শুরু করিয়াছেন। এই সকল গোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবে উস্কানিমূলক নগ্ন প্রচারণাও চালাইতেছেন এবং জনগণের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টাও করিতেছেন। শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেশে বর্তমানে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে নস্যাৎ করিবার অপচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং ইহার অর্থ হইতেছে নির্বাচন এবং ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে গণতান্ত্রিক মহল ও দেশবাসীর দাবীসমূহ নস্যাৎ করিবার সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করা। প্রকৃতপক্ষে বিগত গণঅভ্যুত্থানের সময় হইতেই জামাতে ইসলাম, ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম ও ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তদের ন্যায্য দাবীসমূহ তথা ১১-দফার বিরোধীতা করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই সকল গোষ্ঠী বর্তমানে সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে মতামত প্রদানকারী তথা গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মহলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাইতেছে। তাহাদের এই সকল প্রচারণার জন্য দেশের মসজিদসমূহকে তাহারা ব্যবহার করিতেছে। পবিত্র মসজিদকে ইহারা নিজেদের গণবিরোধী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাহাদের রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করিয়াছে।

সকলেই একথা জানেন যে, সরকার প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে খোলাখুলি মতামত প্রদানের আহবান জানান। এই অভিমত লিখিতভাবে সরকারের নিকট পেশ করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (DUCSU) উদ্যোগে বিগত ১২ আগস্ট শিক্ষানীতির উপর একটি আলোচনা সভা (সেমিনার) আহবান করা হয়। এই আলোচনা সভায় যখন 'ভাষা' বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, সে সময় ইসলামী ছাত্রসংঘের কতিপয় সদস্য আকস্মিকভাবে গোলযোগ

শুরু করে এবং বক্তা ও শ্রোতাদের আক্রমণ করে। ফলে সাধারণ ছাত্রসহ উদ্যোক্তাদের কেহ কেহ আহত হয়। সকলে আলোচনা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও ইসলামী ছাত্রসংঘের আক্রমণ বন্ধ হয় না। ফলে অনিবার্যভাবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষের দুঃখজনক পরিণতি হিসাবে আব্দুল মালেকের জীবনাবসান ঘটে। আমরা মালেকের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছি এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনা সভায় গুণ্ডাবাজীর পশ্চাতে যে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে ইহাও উন্মোচন করা প্রয়োজন মনে করি।

ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রচার করিয়াছে যে সেমিনারে ইসলাম বিরোধী ভাষণ দেওয়া হইতে-ছিল এবং তাহাদের বক্তৃতাদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাদের এই প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব সামসুদ্দোহা যখন খসড়া শিক্ষানীতির বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া ভাষা বিষয় বক্তৃতা করিতেছিলেন সে সময়ই তাহারা আক্রমণ করিয়া বসে। সেমিনারে বক্তৃতা করিবার জন্য সেমিনারের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমেদের অনুমতি চাহিয়া তাহারা নিরাশ হইয়াছে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রসমূহে এমনকি প্রেস ট্রাষ্টের পত্রিকাসমূহেও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণকারীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন ও বালির বাধের পশ্চাতে আত্মরক্ষার জন্যই ইসলাম বিপন্ন ও সেমিনারে বক্তৃতা দানের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যদের বক্তৃতার সময় লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। সেমিনারের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে খসড়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিবার ফলেই ইসলামী ছাত্রসংঘ ও তাহাদের রাজনৈতিক মুরব্বীগণ গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজের উপর ক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

ইহা বর্তমানে সকলেরই জানা আছে যে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ কেন খসড়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতেছে। আমরা মনে করি যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি আমাদের আশা আকাংখার অনুরূপ হয় নাই। এই শিক্ষানীতি কার্যকরী করা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমাদের অভিমত পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তানের সংহতির' বিরোধিতা করার জন্যই আমরা শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতেছি ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার বরং আমাদেরই দাবী

হইল দেশের সংহতি রক্ষা ও সেজন্য সকল ভাষাভাষী জাতীসমূহের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্বীকারের মাধ্যমে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ণ বন্ধ করা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির অর্থ ইসলাম বিরোধিতা নয় বরং সকল ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা ও প্রয়োজনমত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও চালু রাখা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই সকল বক্তব্যকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ইসলাম বিরোধী হিসাবে মিথ্যা প্রচার করিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে আমরা দেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, অভিভাবক মণ্ডলি, গণতান্ত্রিক-মহল ও সর্বোপরি শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারণা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে আগাইয়া আসুন। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীদের গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতীতের অভিজ্ঞতাই ইহার প্রমাণ। কিন্তু বর্তমানে সকলকে সতর্ক ও হুসিয়ার থাকিবার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

সামসুদ্দোহা সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	তোফায়েল আহমদ সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	মোস্তফা জামাল হায়দার সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
নূরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক	আ:স:ম: আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক	মাহবুব উল্লাহ সাধারণ সম্পাদক

তারিখ: আগস্ট, ১৯৬৯

১১ দফার সংগ্রাম চলবেই
ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্র সমাজের অভিমত

জনগণের সংগ্রাম, শহীদের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-রাজনৈতিক কর্মীদের নির্যাতন ভোগ ও দেশপ্রেমিকের কঠোর সাধনা বৃথা যায় নাই। বৃথা যায় নাই বিগত গণ-অভ্যুত্থান ও এগারো দফার ঐতিহাসিক সংগ্রাম। গণ অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক শাসন বলবৎ করা হইলেও গণদাবীর নিকট পরাভূত হইতে হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে। দেশে পুনরায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শাসন প্রবর্তনের জন্য 'এক লোক, এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন ও নির্বাচনের সুনির্দ্দষ্ট তারিখ ঘোষণা করিতে হইয়াছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে। ইহাতে গণ-সংগ্রামের এক বিরাট বিজয় সূচিত হইয়াছে। ''এক লোক, এক ভোট'' নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভিত্তি ঘোষিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক সংখ্যা সাম্য নীতিরও অবসান ঘটিল এবং জনসংখ্যার ভিত্তিই সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘোষণাও সারা দেশের গণতন্ত্রকামী ও স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের আর একটি বিরাট বিজয়। প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠির ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করার যে আব্দার করিতেছিল, জনমতের চাপে তাহাদের ঐ আব্দারও ভাসিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে রাষ্ট্রীয় নীতির প্রণয়নের ক্ষেত্রে বারবার বর্ধিত হইয়াছে উহাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পুনরায় স্বীকৃতি দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রাণের দাবীর ন্যায্যতার ভিত্তি স্বীকৃত হইলেও মূলত: যে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হইয়াছিল এবং ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক ১১-দফার দাবীতে পৃথিবী বিখ্যাত যে গণ-অভুত্থান হইল সেই স্বায়ত্তশাসন পূর্ব বাংলার মানুষ এখনও পায় নাই। তথাপি ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর নায্যতার ভিত্তি স্বীকৃত

হইয়াছে। দেশে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করিতে দেওয়ার জন্য যে দাবী উঠিয়াছিল উহার পরিপ্রেক্ষিতে ১লা জানুয়ারী হইতে জনসভা, মিছিল, ধর্মঘটের অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার কথাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের মাধ্যমে যে সকল ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে উহাতে এই সকল প্রশ্নে গণসংগ্রাম ও গণতন্ত্রকামী, স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের বিজয় সূচিত হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অবিলম্বে মার্শাল ল' প্রত্যাহার কর :

কিন্তু জনগণের দাবী হইল এই যে, দেশ হইতে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হউক এবং পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হউক। একই সঙ্গে বিনা বিচারে আটক দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ জননেতা মনি সিং সহ সকল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কারণে সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক এবং রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা-সামরিক আইনের মামলা, ঘোষিত সাজা, গ্রেফতারী পরেয়ানা প্রভৃতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক। এইভাবে পরিপূর্ণ মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়া পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে- ইহাই জনগণ ও ছাত্র সমাজ আশা করিয়াছিল। কেননা, বিশ্ববাসী যেন একথা ভাবিবার অবকাশ না পায় যে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মার্শাল ল' রাখিতে হয়। তাই আমাদের দেশের ও জনগণের মর্যাদা রক্ষার জন্যও ইহা প্রয়োজন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার কেন এই দাবী পূরণ করিলেন না, উহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তাই মার্শাল ল' প্রত্যাহার, ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েম, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা, সামরিক মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীর আমরা অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছি।

নির্বাচনের সংগে শাসনক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে দাও ঃ

ছাত্রসমাজ ও জনগণ ইহাও আশা করিয়াছিল যে, দেশে ৫ই অক্টোবরের পূর্বে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ও নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনভার এবং শাসনতন্ত্র রচনার সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচিত পরিষদ তথা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আস্থার সহিত অর্পণ করা হইবে। কিন্তু এই আশাও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নাই। যে ভাবে সবকিছু ঘোষণা করা হইয়াছে, অনুরূপভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকিয়া যাইবে

এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সৃষ্টি করিয়া জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হইলে সামরিক শাসনের মেয়াদ আরও অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি পাইবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কিন্তু সামরিক শাসন দেশে বলবৎ থাকিলেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যর্থ হইতে বসিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সামরিক আইনের মেয়াদ যেন আর বৃদ্ধি না পায় এই লক্ষ্য হইতে তাড়াহুড়া করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়াই গোঁজামিলের পথে চলিয়া যাইতে পারেন। ইহার ফল ভবিষ্যতের জন্য খুবই মারাত্মক। কাজেই আমরা মনে করি যে নির্বাচনের সাথে সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই দেশের শাসনভার অর্পণ করা দরকার।

ব্যাখ্যা প্রয়োজন ঃ

পূর্ব পাকিস্তান তথা বিভিন্ন প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাহার ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারাধীন কি কি বিষয় থাকিবে তাহা সুস্পষ্টভাবে কিছু না বলায় আমরা ইহাই মনে করিতেছি যে, নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে সহজ সংখ্যাধিক্যের ভোটে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিয়াছেন এবং দেশবাসীও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই স্বায়ত্তশাসনসহ সকল শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করিবেন— ইহাই আশা করেন। 'এক লোক' 'এক ভোট', যেমন আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি, নতুন ভাবে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়ে সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উহা গ্রহণ করাও তেমনই আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাহার ভাষণে এই সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন উহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমতঃ তিনি শাসনতন্ত্রকে একটি বিশেষ পবিত্র দলিল হিসেবে বর্ণনা করিয়া জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র গ্রহণের জন্য বিশেষ ভোট পদ্ধতি কি হইবে উহার স্থির করার দায়িত্ব জাতীয় পরিষদের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করার অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় পরিষদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর উহা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবার কথাও বলা হইয়াছে। এই অনুমোদন দানে বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরদানের ব্যাপার মাত্র কিনা উহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

তৃতীয়তঃ স্বায়ত্তশাসন বিশেষত পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বলিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অর্থ (Finance) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বন্টনের কথা বলিয়াছেন ও এই ভাবে রাষ্ট্রীয় সংহতির গুরুত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ছাত্র সমাজের বক্তব্য ঐতিহাসিক ২২ দফা দাবীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে যাহা যাহা বলিয়াছেন জাতীয় পরিষদের সামনে উহা একটি শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে থাকিবে কিনা তাহাও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত ও দাবী হইল এই যে ঃ

তিনটি দাবী ঃ

(ক) জাতীয় পরিষদের সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্র গ্রহণের গণতান্ত্রিক ভিত্তি পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় পরিষদে যে বিতর্কের সূচনা হইবে উহাতে অযথা সময় নষ্ট হইবে, ফলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কর্তৃক ষড়যন্ত্র সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং এইভাবে ১২০ দিনের সময়-সীমার মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

(খ) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার পর প্রেসিডেন্টের অনুমোদন দানের বিষয়টিকে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে হিসাবে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হইবে।

(গ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ সকল বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে ও এই সম্পর্কেও পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হইবে। তবে এক ইউনিট বাতিল ও 'এক লোক' 'এক ভোট' নীতি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রভৃতি সর্বজন স্বীকৃত নীতিসমূহ শাসনতন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত করিবার ব্যবস্থা রাখা দরকার। অবশ্য জনমতই এইজন্য সর্তক পাহারা হিসাবে কাজ করিবে। আমরা মনে করি যে ৩১ শে মার্চের পূর্বেই নির্বাচনের সাময়িক আইনগত কাঠামো সম্পর্কে সরকার কর্তৃক যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, এই আইনগত ভিত্তির মধ্যে উল্লেখিত তিনটি বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আইনগত কাঠামো দ্রুত ঘোষণা কর ঃ

এই সকল কারণে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো দ্রুত ঘোষণার জন্যও আমরা দাবী জানাইতেছি।

পশ্চিমে কয়টি প্রদেশ হইবে ঃ

ইহা শুভলক্ষণ যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলিষ্ঠতার সহিত এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এক ইউনিট বাতিল করিয়া সাবেক প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কিরূপ হইবে উহার সিদ্ধান্ত লইবেন বলিয়া আশা করেন। কিন্তু এক ইউনিট উঠিয়া গেলে চারটি সাবেক প্রদেশ পুনর্জীবিত করা হইবে, নাকি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস বৃদ্ধি করা হইবে, সে বিষয়ে পরিস্কারভাবে কিছু বলা হয় নাই। এই বিষয়ে অবিলম্বে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা হইলে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং ইহার ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশংকা আছে যে, পরিশেষে নির্বাচন নস্যাৎ করার পুরাতন ষড়যন্ত্র আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে।

সামরিক আইনে দেশ শাসন কর ঃ

পহেলা জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দানের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করি যে, জানুয়ারী হইতে সামরিক আইন তুলিয়া নেওয়া উচিত। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থায় শূন্যতা সৃষ্টি অবকাশ থাকে। কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক ও বেসামরিক এই দুইভাবেই দেশ বর্তমানে শাসিত হইতেছে। কাজেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া ১লা জানুয়ারী হইতে বেসামরিক আইনের বর্তমান ভিত্তিতে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য আমরা দাবী জানাইতেছি।

আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নাই ঃ

পরিশেষে আমরা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিকামী, স্বায়ত্তশাসনকামী ছাত্রসমাজ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা জনগণের নিকট ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আবেদন জানাইয়া বলিতে চাই যে, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে গণদাবীর কতকগুলি বিজয় সূচিত হইলেও আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই।

ইহা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশে গণতন্ত্র বিকাশে ও বাঙ্গলাসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জাতীয় অধিকার লাভের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গত ২২ বৎসর ব্যাপী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে এবং দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে দেয়

নাই। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব বাংলাসহ সকল ভাষাভাষী জাতির পূর্ণ ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য আজ আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকিতে হইবে ও আন্দোলনে তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্যথায় বর্তমান বিজয়সমূহও পুনরায় নস্যাৎ হইবার আশংকা আছে। তদুপরি দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও উগ্র-হঠকারী বামপন্থীগণ কর্তৃক পুনরায় নির্বাচন বানচালের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার বিপদ এখনও আছে। এক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করিতে চাই যে, শুধু নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র অর্জন করিলেই জনগণের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এই কথা আমরা মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুজির উচ্ছেদ, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, বাঙ্গালী সহ সকল জাতির পূর্ণ জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়াই দেশ মুক্তির পথে যাইতে পারে। এই জন্য নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার অর্জিত হয় উহা ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার একটি পথ মাত্র।

১১ দফা ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকুনঃ

কাজেই আমরা জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আহবান জানাইতেছি যে, দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী চক্রান্ত ও উগ্র-দক্ষিণ এবং উগ্র বামের বিপদের বিরুদ্ধে ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হউন এবং গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বর্তমানে অগ্রসর করিবার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ শাসন উচ্ছেদ করুন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ঃ

১। শামসুদ্দোহা, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
২। নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, (ঐ)
৩। তোফায়েল আহামেদ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
৪। আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক, (ঐ)
৫। ইব্রাহিম খলীল, সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন
৬। ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক (ঐ)

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩১/১, হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহামেদ কর্তৃক প্রচারিত। বর্ণশ্রী মুদ্রায়ণ, ৩৪, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

অমর ১৭ই সেপ্টেবর শিক্ষা দিবস পালন করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বছরান্তে ১৭ই সেপ্টেম্বরের রক্ত স্মৃতি বিজড়িত মহান শিক্ষা দিবস ঘুরিয়া আসিতেছে। এই দিনে ১৯৬২ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে ছোট ভাই বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা শহীদ হইয়াছিলেন। তাই প্রতি বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ পূর্ণ মর্যাদার সহিত ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করিয়া আসিতেছে। শহীদের রক্ত স্মৃতি বিজড়িত এই দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ শহীদানের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে এবং সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণমুখী ও সুলভ শিক্ষানীতি কায়েমের জন্য শপথ গ্রহণ করিবে। এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালনের জন্য আমরা সারা পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসাবে সকল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দিন ঘোষণার দাবী প্রথম হইতেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের উদ্যোক্তা একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকার শক্তির বলে ছাত্রদের এই দাবী অমান্য করিয়া অসিয়াছে এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলেও অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরই ছাত্র সমাজ বাধ্য হইয়াই ১৭ই সেপ্টেম্বর ধর্মঘট করিয়া আসিতেছে এবং এইভাবে ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৭ সেপ্টেম্বর পালন করিয়াছে। কারণ ইহা খুবই পরিস্কার কথা যে শিক্ষার দাবীতে সে দিনটিতে আমোদের তিনজন ভাই পুলিশ, ই,পি, আর বাহিনীর গুলিতে শহীদ হইয়াছিল, সেই দিবসে ছাত্র সমাজের পক্ষে ক্লাসে অংশ গ্রহণ করিয়া শহীদানের স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিতে পারে না।

বর্তমানে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকার ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আইয়ুব সরকারের জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট শিক্ষা জীবনে যে কিরূপ সংকট সৃষ্টি করিয়াছে এবং শিক্ষা সংস্কারের নামে আইয়ুবের শিক্ষা নীতি যে একটি শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ছিল বর্তমান সরকার উহার নীতিগত স্বীকৃতি দিয়াছেন। এবং আইয়ুবের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টও কার্য্যতঃ বাতিল হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সরকার একটি নতুন শিক্ষানীতি

প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। অথচ এই কারণেই ১৯৬২সালে আমাদের ভাইদের পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষকে আমরা আহ্বান জানাইতেছি যে ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করুন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করুন।

ছাত্র সমাজের প্রতি আমরা আবেদন জানাইতেছি, যে, অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসের সকল কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

ঢাকা শহরের কর্মসূচী

০ ১৫ ই সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৪টায় মধুর ক্যান্টিনে সর্বদলীয় ছাত্র সভা ও কালো ব্যাজ বিতরণ।

০ ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সভা এবং সন্ধ্যায় হলে ও হোস্টেলে সভা ও শপথ গ্রহণ।

০ ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার ভোরে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শিক্ষা দিবস পালন, বেলা ১১-৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়া কলা ভবনে সাধারণ ছাত্র সভা।

শামসুদ্দোহা সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	তোফায়েল আহমেদ সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	মোস্তফা জামাল হায়দার সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	ইব্রাহীম খলিল সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন
নূরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	আ.স.ম আবদুর রব সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	মাহবুবউল্লাহ সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	ফখরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।

তারিখঃ ১৯৭০

ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরিপেক্ষিতে ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার

'দাবী দিবস'

১৯৬৯ সনের ৬ দফা সম্বলিত ঐতিহাসিক ১১ দফার ভিত্তিতে শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে গড়িয়া উঠা গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারী করা হইয়াছিল। সমারিক আইন জারীর পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন সময়ে তাহার বক্তব্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইয়াহিয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবীসহ সমাজের বিভিন্ন মূল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট-এর উপর ন্যস্ত হইবে।

দীর্ঘ বার বছরের আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সরকারের মূল উচ্ছেদ করিয়া সারাদেশে যে মুহূর্তে শর্তবিহীন নিরংকুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল গত ২৮শে মার্চের ইয়াহিয়ার ভাষণ ও ৩০শে মার্চ তাং ইয়াহিয়ার ঘোষিত শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় জনজীবনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে যে—''তাহা হইলে বাংলার ও বাংগালীদের কি দশা হইবে।''

ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামোতে একটি দিক লক্ষণীয় যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সংহতি ও অখণ্ডতাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আইনগত কাঠামো ২৫ নং বিধিতে গণপরিষদের উপর সন্দেহ প্রকাশ ও ২৭ নং বিধিতে ইয়াহিয়ার একনায়কত্বমূলক যে মনেভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলের মূলনীতি বিরোধী। দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা স্পষ্ট জানাইয়া দিতে চাই যে ইয়াহিয়া স্বনীতি এই নীতিমালা কোন ভাবেই এদেশের সংগ্রামী মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলার সাতকোটি মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার উপায় হিসাবেই ৬ দফা ও ১১ দফা দাবী সংগ্রামের মধ্য দিয়া এ দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া ৬দফা ও ১১ দফা দাবীকে আমরা কোনভাবেই নস্যাৎ হইতে দিব না। আমরা মনে করি একমাত্র ৬ দফা ও

১১ দফার বাস্তবায়নই পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে বজায় রাখিতে পারে এবং স্বায়ত্বশাসন ও ভাবী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে বাংলার জাগ্রত মানুষ ৬ দফা ও ১১ দফার সামান্যতম বিচ্যুতি ও স্বীকার করিবে না বরং প্রয়োজনবোধে আরও দুর্বার আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার ছাত্র-শ্রমিক কৃষক ও মেহনতি মানুষ বাংলার বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র রুখিয়া দাঁড়াইব।

বর্তমান অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিক্ষানীতিকে প্রদেশের ছাত্রসমাজ পূর্বেই বর্জন করিয়াছে। পুনর্বার সরকার সেই একই শিক্ষানীতিকে পিছনের দরজা দিয়া চান্দ করিবার চেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। আমরা পুনরায় এই শিক্ষানীতির প্রতি আমাদের অনাস্থা প্রকাশ করিতেছি।

সারাদেশে বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সামরিক সরকার ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সামরিক আইনে গ্রেফতার পূর্বক বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। আমাদের ছাত্র নেতা খসরু, মন্টু ও সেলিমের উপর ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ রহিয়াছে। আমরা অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের মানুষকে এক ও অবিভাজ্য হিসাবে সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা এক সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলি। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আগামী ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার মিছিল, সভা বিক্ষোভের মাধ্যমে 'দাবী দিবস' পালন করি এবং বজ্রকন্ঠে আওয়াজ তুলি।

- ইয়াহিয়ার ঘোষিত আইনগত কাঠামো বাতিল করত: ৬ দফা ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ও ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সার্বভৌম গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে।
- বর্তমান সামরিক সরকার প্রণীত অগণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বাতিল করিতে হইবে।
- ছাত্রনেতা খসরু, মন্টু ও সেলিমের ১৪ বছর সশ্রম করাদণ্ডাদেশ বাতিল ও বিভিন্ন সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীসহ সকল ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দিতে হইবে।

দাবী-দিবসের কর্মসূচীঃ

বেলা ১১ টায় বটতলায় ছাত্রসভা সভাশেষে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ৪২ বলাকা ভবন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে
''১১ দফা সপ্তাহ পালন করুন''

শত শহীদের রক্ত-ভেজা, সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক রক্তাক্ত জানুয়ারী আমাদের মাঝে উপস্থিত। নিপীড়িত ছাত্র শ্রমিক কৃষকের মুক্তির দাবীতে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের উৎখাত ও জনতার রাজ কায়েমের জন্য বাংলার স্বায়ত্বশাসন ৬ দফা দাবী সম্বলিত ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে এ দেশের বুকে যে নিরস্ত্র গণবিপ্লব ঘটে গিয়েছে, তাকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য প্রস্তুতি চলছে প্রতিটি ছাত্র শ্রমিক কৃষক তথা বাংগালীর ঘরে ঘরে। গত বছর ১৭ই জানুয়ারী হতে ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত যে রক্তক্ষয় ঘটেছে এবং যে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে তা আমাদের জাতীয় জীবনের সংগ্রামের প্রতীক। শহীদ আসাদ, মতিউর, রুস্তম, লতিফ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সামসুজ্জোহা সহ শত শত ছাত্র কৃষক শ্রমিকের যে আত্মাহুতি তার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি ''আগরতলা মামলা প্রত্যাহার'', শেখ মুজিব সহ সকল ছাত্র শ্রমিক ও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, দৈনিক ইত্তেফাক সহ অন্যান্য পত্রিকার পুন:প্রকাশের অনুমতি, জন-সংখ্যানুপাতে ''এক ব্যক্তি, এক ভোট'' নীতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণ পরিষদ গঠন ও জনতার রাজ কায়েমের অঙ্গীকার, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল প্রভৃতি কিন্তু ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবীর মূল যে কথা অর্থাৎ বাংলার স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে ''মুক্তি সনদ'' ৬ দফা আজও আদায় হয়নি। শ্রমিক শোষণ বন্ধ, শ্রমিকের ন্যায্য মুজুরী এবং কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের অঙ্গীকার আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া রয়েছে গণমানুষের জীবনের হাজারো সমস্যা। তাই বাংলার ৭ কোটি মানুষের দাবী আদায়ের যে কাফেলা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তাই আজ সে সংগ্রামী দিনগুলিকে আরও সংগ্রাম মুখর করে তোলার জন্য সমগ্র প্রদেশে ''১১ দফা সপ্তাহ'' পালনের মাধ্যমে সকল কর্মসূচীকে সফল করার জন্য প্রদেশের ছাত্র সমাজের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

ঢাকার কর্মসূচী-

১৭ই জানুয়ারী (শনিবার)	সকাল ৭টায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন। কালো ব্যাজ ধারন। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসভা। বেলা ১১ টায় বটতলায় ছাত্র জমায়েত। শোভাযাত্রা সহকারে শহীদ মিনারে গমন ও শপথ গ্রহণ।

১৮ই জানুয়ারী (রবিবার)	স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১ দফা স্মরণে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ। বেলা ৩-টায় আলোচনা সভা।
১৯শে জানুয়ারী (সোমবার)	বেলা ২টায় মধুর কেন্টিনে কর্মী জমায়েত। শহীদদের স্মরণে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী স্মৃতি প্রতিফলক স্থাপন। বিকেল ৫-টায় খণ্ড মিছিল ও পথসভা।
২০শে জানুয়ারী (মঙ্গলবার)	বেলা ৩-টায় সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল প্রাঙ্গণে কর্মীসভা। শহীদানদের কবর জিয়ারত। বিকেল ৫-টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন শিল্পী জয়নুল আবেদীন।
২১শে জানুয়ারী (বুধবার)	ভোর ৫-টায় প্রভাত ফেরী ও শহর প্রদক্ষিণ। (জিন্নাহ্ হল প্রাঙ্গণ হতে)।
২২শে জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার)	বেলা ১১টায় শোক মিছিল। কার্জন হল প্রাঙ্গন হতে।
২৩শে জানুয়ারী (শুক্রবার)	দুপুরে সকল মসজিদ ও মন্দিরে শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত কামনা।
২৪শে জানুয়ারী (শনিবার)	গণঅভ্যুত্থান দিবস। কর্মসূচী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট। বেলা ১১-টায় বটতলায় সাধারণ ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল। বেলা ৩-টায় ঢাকা শহরস্থ বিভিন্ন শাখার কর্মীদের পল্টনে জমায়েত। সন্ধ্যা ৬-টায় মশাল শোভাযাত্রা। পল্টন ময়দান হইতে।
২৫শে জানুয়ারী (রবিবার)	ছাত্রসমাজের উদ্যোগে বেলা ৩-টায় পল্টনে জনসভা। সন্ধ্যায় গণসঙ্গীতের আসর।

প্রদেশের বিভিন্ন শাখা উপরোক্ত কর্মসূচীর সাথে মিল রেখে তাদের স্ব স্ব এলাকার কর্মসূচী প্রণয়ণ করবে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক: স্বপন কুমার চৌধুরী ৪২, বলাকা ভবন, ঢাকা-২ হইতে প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস, ১৬।১, জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা -১ হইতে মুদ্রিত।

তারিখ: ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
কেন্দ্রীয় সংসদের ২২ এবং ২৩ (১৯৭০) জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত
জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী

শোক প্রস্তাব :

আফ্রো-এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষাগুরু, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা, আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জনক 'বাংকার্নো', বৃহৎশক্তি জোট বহির্ভূত তৃতীয় জোটের জনক, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শিকার ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: আহমদ সুকার্নোর মহাপ্রয়াণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের অদ্যকার এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাব:

এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করিতেছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রাককালে দেশবাসী যখন গভীর আগ্রহের সহিত নির্বাচনে সহায়ক সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার আশা করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার কর্তৃক ছাত্র, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীদের উপর সরকারী নির্যাতন ও নিষ্পেষণের খড়গ নামিয়া আসিয়াছে। ব্যাপকহারে সামরিক আইনের অপপ্রয়োগ ঘটাইয়া ছাত্র-শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীবৃন্দকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইতেছে। অধিকার এবং রুটি-রুজির দাবী তুলিয়া শ্রমিক পাইতেছে কারাদণ্ড-বেত্রদণ্ড, গুলি, বেয়নেট; খাদ্য ও কর মওকুফের দাবী তুলিয়া কৃষক পাইতেছে চরম নির্যাতন, মেহনতী জনতা বাঁচার ন্যূনতম অধিকার চাহিয়া নিষ্পেষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক-কালে ঢাকায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি, সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার ষ্টেশনের শ্রমিকদের শাস্তিদান সম্পর্কিত পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা এবং জননেতা এম, এ, আজীজের গ্রেফতারজনিত পরিস্থিতি দেশের জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। এই সভা মনে করে যে দেশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতা এবং রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীবৃন্দের উপর এই নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নীরব দর্শক হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দেশের আপামর জনগণের উপর যে কোন মহলের চক্রান্তকে নস্যাৎ করিয়া দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধমূল। এবং যেহেতু সরকারী নির্যাতন এই গণতান্ত্রিক সরকার গঠন তথা নির্বাচনের সহায়ক গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

উপরোক্ত কারণে এই সভা সরকারের নিকট আগামী ৩১শে জুলাই, ১৯৭০ তারিখের মধ্যে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক পথ প্রত্যাহার করিয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণের জোর দাবী জানাইতেছে :

(১) জনাব এম, এ, আজীজ, মন্টু, সেলিম, হোসেন, বিমলসহ সকল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

(২) সকল ছাঁটাইকৃত বা সাসপেণ্ডকৃত শ্রমিক বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে কাজে পুনর্বহাল করিতে হইবে ও তাহাদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(৩) সকল প্রকার অরাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ সম্পর্কিত গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, খসরুর দণ্ডাদেশসহ সকল দণ্ডাদেশ, মামলা বা নির্যাতনমূলক হয়রানি বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসমূহ, নটরডেম কলেজ, নবাবপুর স্কুলসহ প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অবিলম্বে খুলিতে হইবে।

অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নিজেদের পথ বাছিয়া লইবে এবং দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।

সাংগঠনিক প্রস্তাব:

(১) অদ্যকার এই সভা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, যেহেতু টাঙ্গাইল মহকুমা শাখা জেলায় রূপান্তরিত হইয়াছে সেহেতু বর্তমান মহকুমা শাখাকে স্বীকৃতি না দিয়া জেলা শাখাকে সরাসরি থানা শাখার সাথে যোগাযোগ করিয়া সাংগঠনিক কার্য পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(২) এই সভা বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে স্ব স্ব জেলা ও মহকুমার যে সমস্ত ছাত্রলীগ কর্মী সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হইয়াছে তাহাদের পূর্ণ নাম, সাজার বিবরণসহ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্ররণের নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(৩) এই সভা যে সমস্ত জেলা এখনো কেন্দ্রীয় সংসদের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করে নাই সে সমস্ত জেলাকে অবিলম্বে নাম প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(৪) এই সভা সকল জেলা ও মহকুমা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবিলম্বে ঠিকানা প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

শাজাহান সিরাজ
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

.... শাখার জ্ঞাতার্থে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব এম, এ, রশীদ এবং রেজাউল হক মোস্তাক দফতর এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক, ছাত্রলীগ।

আজকের বটতলার ছাত্রসভার প্রস্তাবাবলী
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
(১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

বিশেষ প্রস্তাব

ঘুমের দেশের মানুষের ঘুম ভাংগাইতে যাইতে সোনার বাংলার যে সকল সোনার ছেলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের লেলুয়া পুলিশ বাহিনীর গুলিতে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর চিকালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আজকের এই মহতী সভা মোস্তাফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ সেই সকল বীর শহীদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ মনে করে যে, সেদিন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতিকে প্রতিহত করিতে গিয়া যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহারা দেশ ও জাতির কল্যাণ, গণমুখী, গণতান্ত্রিক, সহজলভ্য, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি কায়েম এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মঙ্গল কামনাই আত্মাহুতি দিয়াছেন। এই মহতী সভা পুনরায় তাহাদের মহান স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, যতদিন শহীদের আরদ্ধ কার্য সম্পাদিত না হইবে, ততদিন যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ছাত্রলীগ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

রাজনৈতিক প্রস্তাব

এই মহতী সভা গভীর উদ্বেগের সহিত দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছে। আগামী ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইলেও নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য চরম প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থী গোষ্ঠী, অতিবিপ্লবী হটকারী বামপন্থী গোষ্ঠী, এক শ্রেণীর সরকারী আমলারা এবং গণবিরোধী অশুভ শক্তি যেমন পাঞ্জাবী পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু, জোতদার, জমিদার যুগপৎ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। নির্বাচনে নিশ্চিত ভরাডুবি লক্ষ্য করিয়া উস্কানিমূলক আচরণ শুরু করিয়াছে, সামরিক আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ ঘটাইয়া শত শত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী, ছাত্রলীগ সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্রকর্মী, শ্রমিককে আজ গ্রেফতার করা হইতেছে, হুলিয়া জারি করিয়া হয়রানী করা হইতেছে। বস্তুত: পক্ষে আগামী নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ আজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত। আমরা মনে করি, আগামী নির্বাচন কোন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, বরং ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন, ১১-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণভোট স্বরূপ। আগামী নির্বাচনে ৬-দফা ও ১১-দফা সত্যিকারের সমর্থকদের পক্ষে রায় ঘোষণার জন্য এই সভা দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছে। সংগে সংগে নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের

অভাব দেশবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সফল করার জন্য এই মহতী সভা দেশবাসীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে:

(ক) অবিলম্বে পাইকারী হারে ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে গ্রেফতার বন্ধ করা হউক, ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, তোহা গাজী, সরদার রশীদ, বিমল দাস, মন্টু, সেলিমসহ সকল রাজনন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক, দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করা হউক ও খসরুসহ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের দণ্ডাদেশ মওকুফ করা হউক এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা হউক, লক আউট, লে-অফ প্রত্যাহার করা হউক, ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবীদাওয়া মানিয়া লওয়া হউক।

(খ) নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য সরকারী প্রচারযন্ত্র, প্রশাসনযন্ত্র এবং গণবিরোধী অতি উৎসাহী আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকারী ভূমিকা সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ করা হউক।

(গ) সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে ফিরাইয়া আনা হউক।

(ঘ) সর্বোপরি গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী আইনগত কাঠামো আদেশের ২০, ২৫ ও ২৭ নং ধারা সংযোজিত থাকায় জনগণের সার্বভৌম অধিকার হরণকারী আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ প্রত্যাহার করা হউক।

শিক্ষা সমস্যা :

প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং কারিগরি শিক্ষায়তনসমূহে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার প্রায় চারগুণ ছাত্র-ছাত্রী দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। সিলেবাসের বোঝা ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক একখানি পুস্তক স্কুল ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দিয়া শুধু সিলেবাসের কলেবরই বৃদ্ধি করা হয় নাই, বাংলা ও বাংগালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যেরও অবমাননা করা হইয়াছে। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষামূলক বৃত্তিবৃদ্ধিতে গড়িমসি এবং জগন্নাথ কলেজসহ

প্রদেশের সচ্ছল কলেজগুলির প্রাদেশীকরণ অদ্যাবধি প্রত্যাহার করা হয় নাই। অদ্যকার এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট এই সংকট অবলোকন করিয়া অবিলম্বে দেশব্যাপী শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল সংকট অবসানের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে:

(ক) সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক, সহজলভ্য, গণমুখী, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির প্রণয়ন করা হউক।

(খ) 'পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি' পুস্তকটি বাতিল করা হউক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ২৫ নম্বর চালু করা হউক।

(গ) জগন্নাথ কলেজসহ সচ্ছল কলেজগুলির প্রাদেশিকীকরণ বাতিল করিয়া নতুন সরকারী কলেজ স্থাপন করা হউক।

(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা প্রতি বিভাগে বৃদ্ধি করা হোক, নৈশ বিভাগ চালু করা হোক, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হোক এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুবন্দোবস্ত করা হউক, আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য আরও অধিক হল, হোস্টেল নির্মাণ করা হউক।

(ঙ) জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হোক এবং চলতি বছর হইতেই ঢাকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি শুরু করা হউক।

অর্থনৈতিক অবস্থা :

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বন্যার রুদ্র তাণ্ডবে বাঙালী আজ গৃহহারা। বন্যা নিয়াছে ক্ষেত্রের ফসল, গোয়ালের গরু। বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে মুনাফাখোরী, মজুতদারী গোষ্ঠীর চক্রান্তের ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেশবাসীকে বিপর্যস্ত করিয়াছে এবং ঐ সকল অঞ্চলে রিলিফ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, মহামারী প্রতিরোধ, মেডিকেল ব্যবস্থার অভাব সারা বাংলার পরিস্থিতিকে

বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত:পক্ষে সারা বাংলাদেশে আজ চরম দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রম অবনতি লক্ষ্য করিয়া উহার আশু নিরসনের জন্য সরকারের নিকট নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণের জোর দাবী জানাইতেছে :

(ক) অবিলম্বে দেশীয় ও বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয়ে তহবিল গঠন করিয়া ক্রুগ মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হউক।

(খ) বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে মেডিকেল স্কোয়াড ও পর্যাপ্ত রিলিফ প্রদান করা হউক এবং মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও রিলিফ দ্রব্যের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

(গ) সারা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা ঘোষণা করিয়া পূর্ণ রেশনিং চালু করা হোক, গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা হউক, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হউক এবং কৃষকদের খাজনা, ট্যাক্স এবং সার্টিফিকেট জারি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হউক।

(ঘ) দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করিয়া সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার উন্নতি বিধান করা হউক।

(ঙ) শ্রমিকদের ৫-দফা মানিয়া লইয়া সাধারণ শ্রমিকদেরকে বাঁচার অধিকার প্রদান করা হউক।

সংগ্রামের ডাক :

অদ্যকার মহান শিক্ষা দিবসে এই মহতী সভা দলমত নির্বিশেষে দেশের বর্তমান শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনতার সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বশ্রেণীর জনতার প্রতি আহবান জানাইতেছে। এই মহতী সভা মনে করে যে, নির্বাচন আন্দোলনের অন্যতম পন্থা এবং এই কারণেই নির্বাচনে জনগণের রায়ে কোন মত ও পথ জনগণ সমর্থন করে তাহাও সুস্পষ্ট হইবে। অতএব কোন চক্রান্তের ফলে যদি আগামী সাধারণ নির্বাচনের রায়কে অগ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দুর্বার গণ-অন্দোলনের মাধ্যমে আগামীতে বাংলার জনগণের সঠিক মুক্তির

দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর নিকট এই সভা আকুল আবেদন জানাইতেছে এবং যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এদেশের সংগ্রামী জনতার প্রতি এই সভা আবেদন জানাইতেছে।

প্রেরক

এম,এ, রশীদ
দপ্তর সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

তারিখ : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একাদশ সম্মেলনের ডাক

ছাত্র-ছাত্রী ভাই ও বোনেরা,

পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী গণ-ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একাদশ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করা হয়েছে।

এ কথা সকলেই জানেন যে শাসক গোষ্ঠির শিক্ষানীতির ফলে আজ দেশের শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হতে বসেছে। শিক্ষা সংস্কারের অজুহাতে শাসক গোষ্ঠি এমনই এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রসর হয়েছে যা পরিণতিতে এ দেশের শিক্ষা জীবনকেই ধ্বংস করে দেবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার মূল কারণগুলো দূর না করে এবং বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই সরকার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া আইন করে বন্ধকরণের বাবস্থা নিচ্ছে। স্বচ্ছল বেসরকারী বৃহৎ কলেজ সমূহকে সরকারী দখলে নিয়ে ছাত্র আসন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারিগরী, চিকিৎসা ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজন অনুপাতে প্রসার ঘটছে না। সমস্ত শিক্ষায়তনে চলছে নানারকম দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। উচ্চ শিক্ষার দরজা সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। গণ শিক্ষার কোন প্রসার গটছে না। শিক্ষাক্ষেত্রেও চলছে বৈষম্য নীতি। সুলভে ও সহজে শিক্ষা লাভের ও দেশবাসীকে সুশিক্ষিত করে তুলবার যে মহৎ স্বপ্ন আমাদের পূর্বসূরীরা স্বাধীনতার উষালগ্নে দেখেছিল, সে স্বপ্ন আজ শাসক গোষ্ঠির নির্মম আঘাতে দলিত মথিত ধূলায় বিলীন। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের স্বার্থে শাসক গোষ্ঠি পাঠ্য বিষয়ে আমদানী করছে কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদ। বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের রচনাবলীর উপর চাপান হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অবসান আজও ঘটেনি। নতুন বর্ণমালা ও নতুন ভাষা তৈরীর অপচেষ্টা আজও চলছে। বাংলা ভাষাভাষী জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা জীবনের উপর চলছে বিরামহীন হামলা, নেমে এসেছে চূড়ান্ত আক্রমণ। প্রতিক্রিয়াশীলদের লক্ষ্য হল বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে শতাব্দী-শতাব্দীর ঐতিহ্য মণ্ডিত ভাষা-শিক্ষা সংস্কৃতি বিবর্জিত করে একটি পঙ্গু অসহায় জাতিতে পরিণত করা এবং তাদের উপর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখা। পশ্চিম পাকিস্তানেও বেলুচ-পাঠান-সিন্ধুবাসী জনতার উপর একই রকম নিপীড়ন চলছে। শাসকগোষ্ঠি তাদের এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি দেশের

উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির প্রামাণ্য দলিল হল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামদুর রহমান কমিটির রিপোর্ট।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ কোনদিনই এই সব চক্রান্ত ও শিক্ষা বিরোধী নীতি মেনে নেয় নি, আজও নেবে না। ছাত্র সমাজের উপর আজও চলছে নির্যাতন। কারাগারগুলি অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে পূর্ণ হয়ে আছে ছাত্রবন্দীদের দ্বারা। সংগঠনের প্রাক্তন সভানেত্রী মতিয়া চোধুরীকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘকালিন কারাদণ্ড। অন্য দিকে, সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে গুণ্ডাবাহিনী। স্থায়ীভাবে কায়েম করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ছদ্মাবরণে সামরিক শাসন কার্যত: আজও রয়েছে অব্যাহত।

সামরিক শসনের পর এই দশ বছর ব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে তীব্র সংকট। জনগণের প্রকার রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক-মানবিক অধিকার কেড়ে নিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে শাসক গোষ্ঠি। পূর্ব পাকিস্তান জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে দমননীতির মাধ্যমে দাবিয়ে রাখতে চাচ্ছে শাসক গোষ্ঠির। পশ্চিম পাকিস্তানেরও এক ইউনিয়ন বিলোপের দাবীকে একই ভাবে দমন করা হচ্ছে। দেশকে আজও সাম্রাজ্যবাদের ডলারের শৃঙখলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে সারা দেশের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদের মালিক বনেছে মাত্র ২০টি পরিবার। অন্যদিকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড গিয়েছে ভেঙ্গে। বন্যা, মহামারী, অত্যাচার-অবিচারে কোটি কোটি ভূখা-নাঙ্গা নর-নারীর আর্ত রবে দেশের আকাশ বাতাস উঠেছে ভরে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠির হৃদয় বিগলিত হয়নি, হবেও না। তারা শাসক-শোষক শ্রেণী! তাদের আমোদ-সফরে ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। আর দেশবাসীর ঘরে ঘরে উঠে ক্ষুধার জ্বালায় হাহাকার। ছাত্রজনতার ন্যায্য দাবীর জবাব দেয় তারা দমননীতির মাধ্যমে।

ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা,
শিক্ষা-সংস্কৃতি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। কিন্তু কোন পথে আসবে প্রকৃত মুক্তি? কোন পথে পরাজিত করা সম্ভব শাসক গোষ্ঠিকে? শিক্ষার অধিকার কি ভাবে সম্ভব প্রতিষ্ঠা করা?

এ সব প্রশ্নের জবাব নির্দ্ধারণ করতে হবে আমাদেরই। আমরা তরুণ ছাত্র সমাজ, দেশের ভবিষ্যত আমরাই। শ্রমিক কৃষক শহরে গরীব জনতার সাথে ঐক্যবদ্ধ ও

সংঘবদ্ধভাবে গড়ে তুলতে হবে সংগ্রাম। সংগ্রামের পথই--মুক্তির পথ। তাই আমরা আহবান জানাই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে--সংঘবদ্ধ হউন, ঐক্যবদ্ধ হউন। অগ্রসর হয়ে আসুন সংগ্রামের পথে। সংগঠনকে তুলুন দৃঢ় ভিত্তির উপর। সংগঠনই হল আমাদের সংগ্রামের হাতিয়ার আর ঐক্যই হল আমাদের শক্তি।

এই আহবান নিয়েই আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একাদশ সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেছি। তাই, এই সম্মেলনকে সফল করে তুলবার জন্য সকলে এগিয়ে আসুন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জিন্দাবাদ

সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক	ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ	সামসুদ্দোহা
সভাপতি	কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষে	সাধারণ সম্পাদক

'পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিল ও শিক্ষা সমস্যা সমাধানের দাবীতে

৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায়

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র জমায়েত

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ শিক্ষাজীবনের সংকট দূর করে একটি সার্বজনীন, সুলভ, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে সংগ্রাম করছে। কিন্তু স্বাধীনতার ২৩ বৎসর পরও আমাদের সময়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্য ছাত্রসমাজ ছাত্রদের উপর থেকে সিলেবাসের বোঝা কমিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সিলেবাস প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই আমাদের কথায় কান দেয় নাই, বরং সিলেবাসের বোঝা দিন দিন অবৈজ্ঞানিক ভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সম্প্রতি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপর ''পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি'' বইটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলেবাসের এই নতুন বোঝার দ্বারা সুকৌশলে শিক্ষার বিস্তারকে রোধ করার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। অন্য দিকে এই বই-এ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মুখে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীতা স্বীকার করলেও ''পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি'' চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার সময় ও সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে। সরকারের এই তোগলোক নীতির ফলে সমস্ত দেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের এক চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের সতস্ফূর্ত: বিক্ষোভের ফলে সরকার এই বই-এর দ্বিতীয় অংশ বাতিল করলেও আজও ছাত্রদের মাথায় বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে রেখেছে এই বই-এর প্রথম অংশটি।

এ ছাড়াও ভর্তি সমস্যা, পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজের অভাব, জগন্নাথকলেজ সহ প্রদেশের বিভিন্ন কলেজ প্রাদেশিকীকরণজনিত সমস্যা, হল-হোষ্টেলের অভাব, ডাইনিং হল সমস্যা, অতিরিক্ত ফুডচার্জ প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা ছাত্রদের শিক্ষাজীবনে সংকট সৃষ্টি করে চলেছে।

শিক্ষাজীবনের এই সংকট দূর করার জন্য এবং গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসতে হবে। ঐক্যবদ্ধ

সংগ্রাম ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আসুন, শিক্ষার সংকট মোচনের জন্য, গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং ''পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি'' বই বাতিল করার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হই।

বন্ধুগণ,

তাই আসুন আগামী ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলি।

স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত ও
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত

তারিখ: ১৯৭০

সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবীতে এবং ইয়াহিয়ার নির্বাচনী আইনগত কাঠামো শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণার প্রতিবাদে-

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে (মতিয়া গ্রুপ)
১৩ই এপ্রিল, সোমবার, 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বিগত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। সারা দেশের মানুষ গভীরভাবে আশা করিয়াছিল যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে ঐ পরিষদে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এবং এইভাবে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট ও সমস্যার প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাধান হইবে। সামরিক প্রধান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসিয়া একটি সার্বভৌম জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক বব্যস্থাকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে আইনগত কাঠামোর আদেশ ঘোষণা করিয়া দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে এক রূঢ় আঘাত হানিয়াছেন।

ঘোষিত নির্বাচনী আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা নির্বাচনী জাতীয় পরিষদকে কার্যত: পুরোপুরিভাবে 'কর্তার ইচ্ছায়' কর্ম করণের তথাকথিত পরিষদে পরিণত করা হইয়াছে। এবং ''কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' করিলে এই পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলেও উহাকে বাতিল করিবার নিরংকুশ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই রাখিবার পাকাপাকি আইনও প্রণয়ন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব বলিতে কিছুই নাই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার তথা ১১দফা ও ৬দফা দাবীগুলীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে অবাধ গণতন্ত্র, পর্ব বাংলাসহ সকল ভাষা-ভাষী মানুষের স্বায়ত্তশাসন, মৌলিক অধিকার প্রভৃতির স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন শাসনই জনগণের দ্বারা রচনা করা সম্ভব হইবে না। ফলে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান কর সম্ভাব হইবে না। শুধু তাহাই নহে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রশ্নই শাসনতন্ত্রের প্রায় সকল মৌলিক প্রশ্নই প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে যে পাচঁটি ধারা আইন হিসাবে বাধ্যতামুলকভাবে পালনের নির্দেশ ঘোষিত হইয়াছে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের মধ্যে বিষয় বন্টনের যে নীতি নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ৬-দফা ও ১১-দফ কার্যকরী করা সম্ভব নহে। উপরন্ত ধর্মভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করার পুরাতন সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। এই ভাবে প্রত্যক্ষ ভোটে অধিকার স্বীকার করা হইলেও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে পুরাতন আইয়ুবী ব্যবস্থাই চালু করা হইয়াছে। এইভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে আরেকটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া উহা গণতন্ত্রের নামে চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা এবং উহাতে প্রকৃতপক্ষে জনগণ কর্তৃক বাতিলকৃত ১৯৫৬ সালের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলি চাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এইভাবে সরকার এককভাবে দেশবাসীর উপর শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিয়াছিল। আর বর্তমান সরকার শাসনতন্ত্রের কাঠামো নির্ধারণ করিয়া তার ভিত্তিতেই কেবল উহার বিস্তরিতভাবে লেখার দ্বায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দিতেছেন। এই দিক হইতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি পূর্বের মত বহাল থাকিতেছে।

অন্যদিকে ছাত্রসমাজ কর্তৃক প্রত্যাখাত শিক্ষানীতিকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। তাই স্বাধীনতার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বজনীন ও সহজলভ্য শিক্ষা হইতে ছাত্রসমাজ বঞ্চিত হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানিজ্য বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, আই, ই, আর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ল, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, সমাজকল্যাণ কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, কৃষি কলেজ, এন, ডি, টি, আই, গ্রাফিক আর্ট ইন্সটিটিউট, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিইউ, প্যারা মেডিকেল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী আজও মানিয়া লওয়া হইতেছে না। হলে এবং হোস্টেলে খাদ্যের নিম্নমান ও সিট সমস্যা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। ছাত্রনেতা হায়দার আলী, মাহবুবউল্লাহ, বিধান, নির্মল, হিমাংশু বণিক, শুকদেব ঘোষ ও জননেতা মণি সিং, অজয় রায়, হাবিবুর রহমান, দেবেন সিকদার, শহীদুল্লাহ অসংখ্য দেশপ্রেমিক ছাত্র-কৃষক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ, মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচণ্ড দমননীতির শিকারে পরিণত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক সরকার শাসন কায়েম হইবার পর হইতেই আমরা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানাইয়াছিলাম। বিশেষত: গত ১লা জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সীমিত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার পর গণতান্ত্রিক শক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যজোট কায়েমের অতীব

গুরুত্ব আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম কিন্তু সকলেই জানেন, আমাদের এই আবেদনে কেহ কেহ সাড়া না দিয়া বরং গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলগুলির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেন। খুবই দু:খজনক যে ১১-দফা উত্থাপনকারী ছাত্র সমাজের মধ্যেও বিভেদ তীব্র হইয়া উঠে। অপরদিকে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যেন জাতীয় পরিষদ সার্বভৌম হইতে না পারে। উপরন্তু ইহা জানা আছে যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নীতিগতভাবেই গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও শ্রমিক কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এই পটভূমিতেই প্রেসিডেন্ট যে নির্বাচনী আইনগত কাঠামো ঘোষণা করিয়াছেন উহা দেশের ব্যাপক জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়াছে। এক বৎসর আগেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের জোরে যতগুলি দাবী আদায় করা সম্ভব হইয়াছিল এবং সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের যে প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন আজ গণতান্ত্রিক শক্তির বিভেদের ফলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিতে পারিতেছেন। গোষ্ঠী আজ কৌশলে বীর শহীদদের রক্ত ও জীবনের মূল্য অর্থহীন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলা তথা সারা পাকিস্তানের সংগ্রামী, ছাত্র-সমাজ ও জনগণ শাসকগোষ্ঠীর এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছে।

দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি ও নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র সমাজসহ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমাদের আবেদন যে সময় থাকিতে ঐক্যবদ্ধ হউন ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য লইয়া সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ কায়েমের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া আসুন। দাবী তুলুন- 'প্রতিক্রিয়াশীল আইনগত কাঠামো সংশোধন কর'।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং ইতিহাস হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু বিভেদ আনবে সর্বনাশ। সরকারের কাছে দাবী: দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা এ ভাবে সমাধান করার জন্য নির্বাচনী আইনগত কাঠামো সংশোধন করে সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ কায়েমের পথ প্রশস্ত করুন। অন্যথায় দেশের রাজনৈতিক স্থিতি সুদূর পরাহত হইবে।

বন্ধুগণ

দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষণাসমূহের প্রতিবাদ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি। সাথে সাথে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনকামী শক্তিকে বিশেষত: সহযোগী গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে দলীয় সংকীর্ণতা ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি।

আসুন, আগামী ১৩ই এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত করার মাধ্যমে আওয়াজ তুলি :

- সার্বভৌম পার্লামেন্ট দিতে হইবে।
- নির্বাচনী কাঠামো সংশোধন কর।
- শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি বাতিল কর।
- সামরিক আইন বাতিল কর।
- সামরিক সরকারের শিক্ষানীতি মানি না।
- ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
- দমননীতি বন্ধ কর।
- ১১দফা সংগ্রাম চলবেই।

ঢাকা শহরের কর্মসূচী :

- ১৩ই এপ্রিল, সোমবার, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন।
- বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সাধারণ ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল।

শামসুদ্দোহা
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

ছাত্র

নুরুলইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

তারিখ : ১২ এপ্রিল ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনী ইস্তেহার

ভোটের অধিকার বিফলে যাইতে দিবেন না
নির্বাচন বর্জনের আওয়াজে বিভ্রান্ত হইবেন না

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচন বর্জনের জন্য আমাদের ছাত্র সমাজের একটি অংশ হইতে আবেদন হইয়াছে। একদা মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন নামে পরিচিত বর্তমানে ৩/৪ টি উপদলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপগুলি হইতে বিশ্ববিদ্যায়ের নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানানো হইয়াছে। ফলে এই সকল উপদল সকলেই নতুন ঘোষণাপত্র, নাম পতাকা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে এবং নতুন সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন বয়কটের সপক্ষে ইহাদের প্রধান যুক্তি হইল যে ''এই নির্বাচন ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করিবার জন্য শোষক শ্রেণীর এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।'' তাহাদের আরও যুক্তি হইল যে ছাত্রদের কতকগুলি দাবী আজও পূরণ হয় নাই এবং ''বর্তমানের শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে নির্বাচন করা এক মারাত্মক বিশ্বসাঘাতকতা'' ইহাদের কেউ কেউ এখনও বলিতেছে যে নির্রাচন ইত্যাদি বুর্জোয়া সংস্কারে আচ্ছন্ন না হইয়া 'কৃষি বিপ্লবের' আগুন জ্বালাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছাত্রদের ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। এইরূপ তাহারা বলিতেছেন যে বর্তমানে বিপ্লব করিতে হইবে কাজেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা নয়।

আমরা মনে করি যে নির্বাচন বয়কট করবার জন্য এই সকল যুক্তি হইল অবাস্তব, ক্ষতিকর কুযুক্তি মাত্র। সকলেই জানেন যে, অতীতে বরাবরই ছাত্র সমাজ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন দুর্বল কিংবা বিপথে পরিচালিত হয় নাই। বরং আন্দোলন ও সংগঠন জোরদার

হইয়াছে। অতীতের নির্বাচনগুলিতে ছাত্র সংগঠনগুলি অংশ গ্রহণ না করিলে DUCSU সহ সকল ইউনিয়নের ক্ষমতা যাইত প্রতিক্রিয়াশীল ভারাটেদের হাতে। ফলে স্বৈরাচারের লাভ হইত এবং ছাত্রদের সংগ্রাম বিপথে পরিচালিত হইত। সকলেই জানেন যে ছাত্রসমাজের যে সকল গণতান্ত্রিক দাবী হয় নাই। ঐ গুলিকে আদাযের জন্য বিভিন্ন ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের কেবলমাত্র অংশগ্রহণ নয়-বিজয় অর্জনের প্রয়োজনীয়তাও রহিয়াছে। সকলেই জানেন আইয়ুব-মোনেমের DUCSU নির্বাচন যখন প্রত্যক্ষ ছিলনা তখন কেহই নির্বাচন বর্জনের আওয়াজ তুলে নাই। আজ যখন DUCSU নির্বাচন প্রত্যক্ষ হইতে যাইতেছে তখন 'অগণতান্ত্রিক নির্বাচন' প্রভৃতি আনিয়া বয়কটের আহ্বান জানানোর অর্থ কি? ইহা সত্য যে দেশে আজও পূর্ণ গণতন্ত্র অর্জিত হয় নাই। কাজেই পূর্ণ গণতন্ত্র অর্জনের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অবশ্যই চালাইতে হইবে। সংগে শাসক গোষ্ঠী আজ গণসংগ্রামের চাপে পড়িয়া যে সকল নির্বাচন দিতে বাধ্য হইয়াছে ঐ গুলিতে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের গণসংগ্রামকেই আগাইয়া লওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যক্ষ প্রয়াস চালাইতে হইবে। ইহাই হইল সংগ্রামের সঠিক বিপ্লবী রণকৌশল। কিন্তু আমাদের কিছু সংখ্যক বন্ধু মুখে বিপ্লবের কথা বলিলেও আসলে বিপ্লবী রণকৌশলকে এড়াইয়া যাইতেছেন। কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি, 'বুর্জোয়া সংস্কার' প্রভৃতি যুক্তি দেখাইয়া নিবাচন বর্জনের যে আওয়াজ দেওয়া হইয়াছে উহা আসলে বিপ্লবী রণকৌশলের লাইনের বিচ্যুতিমাত্র। এবং যে কোন বিচ্যুতির অর্থই হইল শোষকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া। তাহারা দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতির প্রসংগ উত্থাপন করিয়া নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাইয়াছেন। সকলেই জানেন বিগত গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠান। জনগণ যখন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী নির্বাচন চায় উহাকে ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পরিস্থিতির অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা চলে? যুক্তি হিসাবে আমরা যদি ধরিয়াও লই যে দেশে ''বিপ্লবী পরিস্থিত'' বিরাজমান রহিয়াছে তাহা হইলেও বিশ্বিবিদ্যালয় প্রভৃতি নির্বাচন বয়কটের প্রশ্ন আসে না কারণ বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বিপ্লবী পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিতে হয় জাতীয় নির্বাচন বয়কট করিয়া। আর ঠিক ঐ সময় সামাজিক নির্বাচন গুলিতে অংশ গ্রহণ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাভূত করিয়া ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতে হয়। ইহাই হইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির মত সামাজিক ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন সম্পর্কে সঠিক বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আমাদের ঐ বন্ধুরা ''বিপ্লবী'' সাজিলেও আসলে ''বিপ্লবের'' কিছুই বুঝেন না মনে হয়। তাহারা যে বয়কটের আহ্বান জানাইয়াছেন উহা দ্বারা তাহাদের এই তাত্ত্বিক দেউলিয়াপনাই জাহির করিয়াছেন-আর কিছু নয়। গণসংযোগ ও গণভিত্তির দুর্বলতা হইতেই তাদের এই দেউলিয়াপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা

নির্বাচন বয়কটের আহবানে সাড়া দিবেন না। কারণ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নির্বাচন বয়কট করিলে প্রতিক্রিয়াশীল জামাতে ইসলামী, পি, ডি, পি প্রভৃতিদের লেজুর প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষমতায় যাইবে আর বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা যদি নির্বাচনে ভোট না দিতে আসেন উহার অর্থ হইবে বাঙালী বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষাকারী দোদুল্যমান আপোষকামীদের ক্ষমতায় যাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া। নির্বাচন বয়কটের আসল অর্থ হইল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির সাথে ক্ষতিকর বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও প্রতিক্রিয়ার সুযোগ করিয়া দেওয়া। তাই আমাদের আবেদন এই যে-বয়কটের আওয়াজ বিভ্রান্ত হইবেন না। আসন্ন নির্বাচনে আমাদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।

সামসুদ্দোহা
সভাপতি
পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

ছাত্র ও জনসাধারনের প্রতি আবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখার জন্য আগাইয়া আসুন

আগামী ১৬ ই মে ১৯৭০- তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (DUCSU) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। ঐতিহাসিক ১১দফা ভিত্তিতে বিগত রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের অবসান ঘটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরী ভোটে অনুষ্ঠানের দাবী কর্তৃপক্ষ মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পিঠস্থান ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও আজ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গণতান্ত্রিক বিজয় অর্জিত হইয়াছে। দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই গণতান্ত্রিক বিজয় রক্ষা এবং উহাকে সার্থকভাবে কার্যকরী করা আজ সকলের কর্তব্য। পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ছাত্র সমাজ, বিশেষত: ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রগামীর ভুমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে এবং দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র অর্জনের সংগ্রাম আজও শেষ হয় নাই। তাই এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রধান শক্তি ছাত্রসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচনকে উপলক্ষ করিয়া আত্মঘাতি সংঘর্ষে যেন লিপ্ত না হয় উহা লক্ষ্য রাখা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণ সকলেরই কর্তব্য।

আত্মঘাতি সংঘর্ষের আশংকা সৃষ্টি হইতেছে

কিন্তু ইতিমধ্যেই আত্মঘাতি দন্দ্ব ও সংঘর্ষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচন যেন শান্তি পূর্ণভাবে না হইতে পারে সে জন্য মহল বিশেষ হইতে উস্কানি ও উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেস্টা শুরু হইয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রই জানেন যে ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার যতগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুস্ঠান হইয়াছে প্রায় সর্বত্রই আইয়ুব মোনায়েমী কায়দায় গুণ্ডাবাজী আমদানী করা হইয়াছে। খুবই আশ্চর্যজনক যে এই সকল গুণ্ডাবাজীর শিকার হইয়াছে আমাদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও সভ্যবৃন্দ এবং আরও আশ্চর্যজনক যে এই সকল গুণ্ডাবাজী পরিচালিত হইয়াছে স্বায়ত্বশাসন

ও গণতন্ত্রের দাবীদার একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়য়ের কোন কোন হলে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেজগাঁয়ে পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে গুণ্ডাবাজী ও আত্মঘাতী সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছে। বর্তমানে নির্বাচন যতই নিকট হইতেছে উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি করা হইতেছে। কাজেই আমরা ইহা আশংকা করিতেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নিবার্চনকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে রক্তক্ষয়ী গুণ্ডাবাজী সংঘটিত হইতে পারে।

এই গুণ্ডাবাজীর উদ্দেশ্য কি?

সকলেই জানেন আমাদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জন্মাবধি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল গণমুখী পরিবর্তন, সারা দেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা, দেশের পূর্ণ গণতন্ত্র, বাঙালীসহ সকল ভাষাভাষী জাতির পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও জাতীয় অধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবিরোধীতা, একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদ প্রভৃতি দাবীতে আপোষহীন মনোভাব লইয়া যে কোন ত্যাগের মূল্যে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমাদের সংগঠন প্রথম হইতেই শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত প্রভৃতিদের ন্যায্য সংগ্রামগুলিকে সমর্থন করিয়াছে এবং সাধ্যমত সহযোগীতাও করিয়াছে। আমরা সর্বদাই ছাত্র সমাজ, দেশবাসী ও সমগ্র স্বার্থে জনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে ''ঐক্যবদ্ধ'' সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সংগঠনের কর্মসূচীর ভিত্তিতেই ঐতিহাসিক ১১দফা সনদ রচিত হয় এবং ঐক্যজোট 'সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে বিগত গণ অভ্যুত্থানে জনতার শত্রু আইয়ুব সরকাররে পতন ঘটে। কিন্তু ১১ দফা দাবী আজও পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নাই। তদুপরি, আজ গণতান্ত্রিক শক্তি বিভেদের সুযোগে ইয়াহিয়া সরকার জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করিয়া শাসকগোষ্ঠীর পছন্দমত একটি শাসনতন্ত্র দেশবাসীর উপর চাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্র সমাজের অনৈক্যের সুযোগে ইয়াহিয়া সরকার একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি দেশের উপর চাপাইয়া দিতেছেন। জামাতে ইসলাম প্রভৃতি চরম দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি আজ গণতান্ত্রিক শক্তির অনৈক্য ও বিভেদের সুযোগে মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার সাহস পাইতেছে। দেশে সামরিক শাসন বজায় আছে, গণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার কায়েম হয় নাই। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসন (১১ দফা ভিত্তিক) অর্জনের পথে এখনো অনেক বাঁধা রহিয়া গিয়াছে।

এমতাবস্থায় আমরা আজ আওয়াজ তুলিয়াছি : ১১ দফা কায়েমের জন্য ঐক্য জোট গঠন কর, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাও। সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কর! গণমুখী শিক্ষানীতি কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোল! আমরা আওয়াজ তুলিয়াছি ভিয়েৎনাম, কম্বিডিয়া হইতে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার কর। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ কর। আমরা এই সব দাবীতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়া যাইতেছি এবং সকল গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং দুই ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল প্রভৃতি এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের ঐক্য ব্যতীত গণ দাবী আদায় করা যায় না।

কিন্তু আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি ঐক্যের পথে না আসিয়া আজ বিভিন্ন ইউনিয়ন নির্বাচন উপলক্ষে গুণ্ডাবাজীর আশ্রয় লইতেছেন। অথচ তাহারাও গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসনের দাবীদার। যে সকল দাবী জানাইতে গিয়া একদা আইয়ুব-মোনায়েমের পোষ্য গুণ্ডাবাহিনীর হামলার শিকার আমরা হইয়াছিলাম, আজ আবার সেই একই দাবী জানাইতে গিয়া আমরা এমন এক দলের হামলার শিকার হইতেছি যাহারা আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

কিন্তু কেন এই গুণ্ডাবাজী এবং এই গুণ্ডাবাজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আমরা সকলের সামনেই এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিতে চাই। আমরা গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজ আজ আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে কেবল যে 'বাংলাদেশের'' মুখে কলঙ্কের কালিমাই লেপন করা হইবে তাহা নহে, বরং প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতকেই শক্তিশালী করা হইবে। একথা না বুঝিবার কোন কারণ নাই। অথচ বাস্তব সত্য হইল এই যে গুণ্ডাবাজী চলিয়াছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গুণ্ডাবাজীর অশংকা দেখা দিয়াছে।

গুণ্ডাবাজী রুখিয়া দাঁড়ান

সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের নিকট আমাদের আবেদন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের ঐতিহ্য ও সুনাম রক্ষার জন্য এবং দেশের বর্তমান জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রক্তের অক্ষরে লিখা ১১ দফা কায়েমের জন্য আত্মঘাতি সংঘর্ষ পরিহার করুন, আসন্ন নির্বাচনে গুণ্ডাবাজীর গতি পরিহার করুন ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখুন। যে কেহ গুণ্ডাবাজী করিতে আসুক উহাকে রুখিয়া দাঁড়ান।

গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনকামী রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গের নিকট আমাদের আবেদন যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হইতে পারে সেজন্য আপনাদের প্রভাব বিস্তার করুন। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার স্বার্থে ইহা আপনাদের পবিত্র কর্তব্য।

সর্বশ্রেণীর জনগণের নিকট আবেদন এই যে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসন এবং ১১ দফার সংগ্রামের প্রধান শক্তি ছাত্র সমাজ যেন আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া সর্বনাশের পথে না যাইতে পারে সেজন্য আগাইয়া আসুন। যাহারা গুণ্ডাবাজীর নীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের ঐ কাজ হইতে নিবৃত্ত করুন। গুণ্ডাবাজীর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নির্বাচন যেন শান্তিপুর্ণভাবে হইতে পারে সেজন্য গুণ্ডাবাজীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন।

সামসুদ্দোহা, সভাপতি
নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি, পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

ঢাকা
৭-৫-৭০

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের

শহীদ দিবস পালন করুন

অমর শহীদ ভাইদের রক্ত স্নাত মহান একুশে ফেব্রুয়ারী সমাগত। বায়ান্নোর একুশ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক চেতনার সূচনা ও বিকাশ ঘটিয়েছে। শত শহীদের রক্ত সেদিন কেবলমাত্র ভাষার অধিকার আদায়ের চেতনায় সীমাবদ্ধ ছিলনা, সে চেতনা ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের জাতীয় অধিকার আদায়ের দাবীতে সোচ্চার। একুশের চেতনার এই ধারা আরও বহু সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আজ এক নবতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাই এবছর একুশ আমাদের কাছে নতুন আহবান নিয়ে এসেছে। দেশের পরিবর্তিত পটভূমিতে আজ তাই এই দিনটির গুরুত্ব ভিন্নতর। বায়ান্নোর গণচেতনার ক্রমউন্নত বিকাশের ফলশ্রুতিতেই দেশে সংগঠিত হয়েছে উনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থান-ছাত্র জনতার অপ্রতিরোধ্য গতিবেগের ফলে পতন ঘটেছে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের, শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় ও জনগণের স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ছাত্র জনতার দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলে সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, দেশে আজ গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আজও চলছে। পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠি চিরাচরিত কায়দায় গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটানোর নতুন ষড়যন্ত্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই দেশের রাজনৈতিক জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে পুর্ববাংলার জাতীয় আশা আকাংখার প্রতীক দিবস এই মহান একুশে ফেব্রুয়ারীতে গণসংগ্রামের কাফেলাকে অগ্রসর করে নেয়ার শপথ গ্রহণ করতে হবে।

কাজেই বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধানতম কর্তব্য সংকীর্ণ দলাদলির উর্ধ্বে সকল গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠনের ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ করা। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই গত ১লা ফেব্রুয়ারী পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী পালনের আহবান জানানো হয়েছিল। কিন্তু দু:খজনক যে ছাত্রলীগ আমাদের এই ঐক্যের আহবানে সাড়া না দিয়ে অতীত বৎসরগুলির ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগের এই ঐক্য বিরোধীনীতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে ক্ষতিকর এবং শহীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের পথও নহে।

এই পটভূমিতে এ বছর অমর একুশে উদযাপিত হতে যাচ্ছে। আমরা ছাত্র ও জনগণের কাছে আহবান জনাচ্ছি ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীতে বীর শহীদ ভাইদের মহান স্মৃতি স্মরণের সাথে সংগ্রামের নতুন শপথ গ্রহণ করুন।

একুশের সংগ্রাম জিন্দাবাদ।

আওয়াজ তুলুন ঃ

* রাজবন্দীদের মুক্তি চাই
* পাক-ভারত সম্পর্কে স্বাভাবিক কর
* গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বন্ধ কর
* ইন্দোচীন হইতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হাত গুটাও
* সকল জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা কর
* ১১ দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ঐক্য কায়েম কর
* আইনগত কাঠামো আদেশ বাতিল কর
* পশ্চিম পাকিস্তানে সকল জাতির মাতৃভাষাকে সরকারী মর্যাদা প্রদান কর
* সর্বস্তরে বাঙালা ভাষা চালু কর
* শিক্ষার দাবী পূরণ কর-বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল কর

ঢাকার কর্মসূচী

২০শে ফেব্রুয়ারী

* সন্ধ্যে ৬টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন হতে মশাল শোভাযাত্রা

২১শে ফেব্রুয়ারী

* সকাল পাঁচটায় প্রভাত ফেরী। কালো ব্যাজ ও কালো পতাকা উত্তোলন।
* সকাল ৮ টায় আজিমপুর কবরস্থান হতে শোভাযাত্রা, শহর প্রদক্ষিণ এবং শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ।
* বিকাল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা

২২শে ফেব্রুয়ারী

* সন্ধ্যে ৬-৩০ মি: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণজমায়েত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

ক, ম, জাহাঙ্গীর, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক ৩১/১ হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১৭-২-৭১ ইং

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা

কর্মসূচী

দুটিকথা

পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৮৫ জন কৃষক যেহেতু তারা সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত— সেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ প্রধান। যদিও এই কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচারিত হচ্ছে তবুও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয় — এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন হতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ নিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক গরীব ও মাঝারী কৃষককে সংগঠিত করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী, ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করে শ্রেণী সংঘর্ষের রূপান্তরিত করে দীর্ঘ সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা গঠন এবং শ্রেণী শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব-বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ছাত্র সমাজ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কয়েমের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম — যদি ছাত্র সমাজ নিজেদের আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং কৃষকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে — নিজেরা শ্রেণীচ্যুত হয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণের শ্রেণী শত্রুকে খতম করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে।

প্রকাশক -

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী

১। সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির (যাহার চরিত্র আমলা মুৎসুদ্দি) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া পূর্ব বাঙলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার দেশরক্ষা, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি তথা সর্বময় কর্তৃত্ব পূর্ব বাঙলার জনগণের হাতে থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎপুঁজির জাতীয় নিপীড়ন ও শ্রেণী শোষণের কবলমুক্ত এই ব্যবস্থায় জনগণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে ও জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। (ক) আঠারো ও তদঊর্ধ্ব বয়স্ক-বয়স্কা নর-নারীর ভোট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে জনগণ পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কোন নির্বাচনী এলাকার জন-গণ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় তাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(খ) জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির দালাল ও সমর্থক যে কোন শ্রেণী ও ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

৩। (ক) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, বাঙালী-অবাঙালী জাতি-উপজাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে।

(খ) নারী জাতির সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) জনগণের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতাদর্শের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে।

(ঘ) জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের সম্পর্ক হইবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। ধর্মের নাম ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার শোষণ উচ্ছেদ করা হইবে।

৪। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলার সার্বভৌমত্ব রক্ষা কল্পে একটি গণবাহিনী থাকিবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার সমবায়ে এই গণবাহিনী গঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও সমগ্র জাতি বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতাকে সামরিক বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে এবং তাহাদের লইয়া গণমিলিশিয়া গঠন করা হইবে।

৫. জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগকে আমূল পরিবর্তন করা হইবে। জনগণের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হইবে। বিচার বিভাগের মূল ভিত্তি হইবে গণ-আদালত।

৬. পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে পিণ্ডি, ওয়াশিংটন, মস্কো, নয়াদিল্লীর সরকারের বিরোধীতা করা হইবে। যে কোন বন্ধুদেশের বশ্যতা স্বীকার করা হইবেনা। সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশ সমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইবে পারস্পরিক লাভ ও মুনাফার ভিত্তিতে। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হইবে।

৭. (ক) জোতদার, মহাজনী, ইজারাদারী তথা সকল প্রকার সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো হইবে। ''কৃষকের হাতে জমি'' এই নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জোতদার, মহাজনদের উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত জমি বন্টনকরা হইবে।

(খ) টাকা ও পণ্যে আদায়কৃত খাজনা প্রথার অবসান করা হইবে। কৃষকের অর্থকরী ফসল ধান, পাট, ইক্ষু ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য প্রদান করা হইবে। এই সকল ফসলের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে চাউলের সঙ্গে বিণিময়ের ভিত্তিতে।

(খ) কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষককুলকে বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হইবে। কৃষককে বকেয়া খাজনা ও ঋণের বোঝা হইতে মুক্ত করিয়া উন্নত চাষাবাদ করিবার জন্য সকল প্রকার উৎসাহ ও সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হইবে।

৯. (ক) বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সমস্ত শিল্প ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হইবে।

(খ) বৃহৎ পুঁজির শোষণ হইতে জনগণকে মুক্ত করিবার জন্য বৃহৎ বাইশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(গ) ব্যাঙ্ক, বীমা, পাট শিল্প, পাট ব্যবসা ও অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্য... সমূহ জাতীয়করণ করা হইবে।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হইবে।

(ঙ) সকল প্রকার পরোক্ষ কর প্রথা বাতিল করা হইবে। আয়ের হারের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হইবে।

(চ) জনগণ বিরোধী অসৎ ব্যক্তি ও আমলাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(ছ) পুঁজি নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশ প্রেমিক জাতীয় ধনীকদের শিল্প ব্যবসায়ে আনুকুল্য প্রদান করা হইবে।

১০। (ক) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং সার্বিক সুবিধাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা হইবে। শ্রমিকদের সন্তান সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) দেশে ব্যাপক শিল্পায়ণের মাধ্যমে সকল প্রকার বেকার লোকের কর্মসংস্থান করা হইবে।

১১। (ক) সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া গণমুখী, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে।

(খ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণসংস্কৃতিকে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণার কবল হইতে জনগণকে মুক্ত করা হইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পল্টন ময়দানের জনসভায় পঠিত ও গৃহিত
প্রকাশকাল : ৭ই মার্চ ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে মাহবুবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

।।মেহনতী জনতার সাথে একাত্ম হও।।

২রা অক্টোবরের গণ সমাবেশে উপস্থিত কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতার প্রতি

পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বান

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

কৃষক সমিতির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে আপনারা গ্রাম বাংলার অগণিত ভূখা-নাঙ্গা কৃষক, শহরের বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ ও সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত নিগৃহীত জনতা আজ রাজধানী ঢাকা শহরের এই সমাবেশে ও গণমিছিলে যোগ দিয়াছেন। আপনাদের জীবনে আজ যে সর্বগ্রাসী সংকট অনাহার, ক্ষুধা, মৃত্যু ও জরার যে নির্মম অভিশাপ, ট্যাক্স, খাজনা, ঋণ ও সুদের যে দুর্বিসহ বোঝা, জোতদার, মহাজন-মালিকশ্রেণীর যে নিষ্ঠুর শোষণ, সাম্বৎসরিক বন্যায় যে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা, সর্বোপরি পূর্ব বাংলার মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন, তাহা আজ আপনাদের করিয়া তুলিয়াছে বিদ্রোহী ও মুক্তিপাগল। আর তাই যখন যেখানেই কোন সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি আপনারা শুনতে পান, সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও মুক্তির দুর্বার আকাংখা লইয়া সেখানেই আপনারা যোগদান করেন। আজও আপনারা ঢাকা মহানগরীর এই সমাবেশে হাজির হইয়াছেন আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শোষণ মুক্তির বুকভরা আশা লইয়া। আপনাদের সংগ্রামী চেতনার প্রতি পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ হইতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আপনারা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুণ।

আপনাদের জীবনের এই যে সংকট, ইহার মূল কারণ কি? সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এককেন্দ্রীক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীই আজ সারা দেশের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, অভাব-অনটন, বুভুক্ষা ও মৃত্যুর জন্য দায়ী। পাকিস্তানের জন্মের প্রথম দিনটি হইতে এই শাসকগোষ্ঠী দেশের মোট জনসমষ্টির শতকরা ৮০ জন কৃষকের উপর চালাইয়া যাইতেছে নির্মম শোষণ আর নির্যাতন। সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার দরুন কৃষক তার সর্বস্ব খোয়াইয়া দিনের পর দিন পথের ভিখারীতে পরিণত হইতেছে। বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে তার বহু কষ্টে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য হইতে সে বঞ্চিত। পানির দামে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনিয়া লইয়া ইহারা গড়িয়া তুলিয়াছে মুনাফার পাহাড়। অপরদিকে এই দুই দেশীয় শোষকের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অসম বাণিজ্যিক চুক্তি ও কঠোর শর্তযুক্ত ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের বেড়াজালে সারাদেশকে আবদ্ধ করিয়া সারাদেশের

অর্থনৈতিক চাবি-কাঠি নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে লইয়া গিয়াছে। ইহাদেরই স্বার্থে আজ পূর্ব বাংলার কৃষকের জীবনের সাচাইতে বড় অভিশাপ বন্যা সমস্যার কোন সমাধান হইতেছেনা। ফলে আমাদের দেশ আজ চিরন্তন খাদ্য ঘাটতির আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পরিণত হইয়াছে তাহাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য রপ্তানীর বাজারে। অন্যদিকে তাহাদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী যুদ্ধনীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া একটির পর একটি ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতেছে। তাদের এই ষড়যন্ত্রের নতুন সহযোগী হইয়াছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল ও তাহার সহযোগী এদেশের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বুকের উপর যে আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জোয়াল চাপাইয়া রাখিয়াছে তাহাই জন্ম দিয়াছে আজকের জীবনের এই মহাসংকট।

সমাজ জীবনের এই মহাসংকটই পূর্ব বাংলাকে আজ অগ্নিগর্ভ করিয়া তুলিয়াছ—যাহার সার্থক বহি:প্রকাশ ঘটিয়াছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানে। আর এই গণ-অভ্যূত্থান সমগ্র আন্দোলনকে উন্নীত করিয়াছে এক নতুন বিপ্লবী স্তরে। যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণ পথের সকল মোহকে ত্যাগ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে বিপ্লবী শক্তি প্রয়োগের পতাকাকে। জনতার সামাগ্রিক শাসনের জগদ্দল পাথর। কিন্তু গণ-আন্দোলনের তীব্রতা ব্যাহত হইলেও, বিপ্লবী অবস্থা আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। জনতার বিপ্লবী মেজাজ আজও বিদ্যমান। আজও এই দেশের, বীর জনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে শাসকগোষ্ঠীকে প্রতি মুহূর্তে নাস্তানাবুদ বানাইয়া ছাড়িয়াছে। এই সেদিনই খুলনা জিলার বালি ও সিলেট জিলার হাওড় করাইয়ার বিপ্লবী কৃষক-জনতা জোতদার মাহজনের বিরুদ্ধে যে মহান লড়াইয়ের নজির স্থাপন করিয়াছে, খুলনায় ও ঢাকায় শ্যামপুর পোস্তগোলায় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীর শ্রমিকশ্রেণী যে দূর্ধর্ষ আক্রমণ চালাইয়াছে, নিজের রক্ত তাহার যেভাবে অবগাহন করিয়াছে, তাহাতে জনতার বিপ্লবী চেতনা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দিকে দিকে আজ তাহারা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে প্রতিরোধ আর প্রতিআক্রমণের বহ্নিশিখা। শুরু করিয়াছে শ্রেণী সংঘর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রক্রিয়া, জনযুদ্ধের মহান পথে শোষক শ্রেণীর বলপূর্বক উচ্ছেদে যাহার মহান পরিসমাপ্তি।

ভীত সন্ত্রস্ত শাসকগোষ্ঠীও আজ তাই কেবল পাশবিক নির্যাতন নিপীড়ন যথেষ্ঠ নয় বুঝিয়া, পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়াছে ঝুটা নির্বাচনের টোপ। ভোট ও মন্ত্রীত্বের লড়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করিয়া দেওয়া ও আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করিয়া শোষণের ইমারতকে রক্ষা

করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। আর শাসকশ্রেণীর এই নির্বাচনী ষড়যন্ত্রে শামিল হইয়াছে জনতার মধ্যে লুকিয়া থাকা শোষকশ্রেণীর রঙ-বেরঙের দালালরা-তথাকথিত 'জনদরদী' রাজনৈতিক দলসমূহ, ও তাহাদের নেতৃবৃন্দ। বাঙ্গালী জাতীয়তা, শ্রমিক কৃষকের মুক্তি, এমনকি বিপ্লবী বুলির আড়ালে জনতাকে তাহারা ক্ষমতা ভাগাভাগির বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিতেছে।

বন্ধুগণ, আজ এমনি একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে আপনারা উপস্থিত হইয়াছেন আপনাদের দাবী আদায়ের এবং শোষণ হইতে মুক্তি পাইবার অনেক আশা বুকে লইয়া। কিন্তু আজ বুঝিতে হইবে সত্যিকার মুক্তির পথ কোনটি, দাবী পূরণ হইবে কোন পথে। ভোটের মাধ্যমে? জনসভার মাধ্যমে? শহরে আসিয়া এমনি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও গণমিছিল করিয়া? স্মারকলিপি প্রদান বা শাসকগোষ্ঠীর কাছে দেনদরবার করিয়া তাহাদের করুণা দৃষ্টি আর্কষণ করিয়া? না। এই পথ ধ্বসে পড়া শোষণের ইমারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে না, তাহার উপর সংস্কারের প্রলেপ লাগাইয়া নতুন মোহই সৃষ্টি করে কেবল। আজ একটি মাত্র পথই খোলাআছে। সেই পথ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার বিপ্লবী লড়াইয়ের পথ। আর এই লড়াই শুরু হইবে গ্রামে কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রাম এলাকায় কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামকে বিপ্লবী জন-যুদ্ধে পরিণত করিয়া, সেখানে কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সশস্ত্র ঘাঁটি এলাকা তৈরী করিয়া শহরসমূহ অবরোধ এবং সর্বশেষে সারা পূর্ব বাংলার বুক হইতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করিয়া জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমেই আসিবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতার মুক্তি। আর কৃষি বিপ্লবের এই প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করিবার জন্য তাহারই পাশাপাশি শহরে গড়িয়া তুলিতে হইবে শ্রমিক ছাত্র-মেহনতী জনতার বিপ্লবী গণ অভ্যুত্থান আঘাতের পর আঘাতের মাধ্যমে যাহা শত্রু শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত রাখিবে ও বিপর্য্যস্ত করিবে।

সমবেত কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতা, পূর্ববাংলার বুক হইতে শোষণের অবসানের এই বিপ্লবী পথে আগাইয়া আসিবার জন্য আপনাদের আমরা আহ্বান জানাই। শান্তিপূর্ণ পথ, নিয়মতান্ত্রিকতার নির্জীব পথকে পরিহার করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন। শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া গ্রাম বাংলায় গড়িয়া তুলুন তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম, সৃষ্টি করুন সশস্ত্র শত শত অগ্নিকণা, যাহা অতি দ্রুত রূপান্তরিত হইবে দেশজোড়া এক প্রচণ্ড দাবানলে। সমূলে উৎপাটিত করিবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও

বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থা পূর্ব বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবে শোষণহীন এক নতুন রাষ্ট্র-জনতার রাষ্ট্র-জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ এই মহান সংগ্রামে আপনাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আমরা এই বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করিতেছি যে পূর্ব বাংলার অত্যাসন্ন বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিয়া আমরা সেই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। সমাজ পরিবর্তনের এই মহান সংগ্রামে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র মেহনতী জনতার এই মিলিত অভিযান জয়যুক্ত হইবেই।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন।

তারিখ ঃ ২ অক্টোবর ১৯৭০

শিক্ষা . * সত্য * ন্যায় * সেবা

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী ইতিহাসের দুটিকথা

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা,

সর্ব প্রথমে জানাই আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন। আমরা (বিভিন্ন সময়ে) জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করিতেছি। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনকে আন্দোলন বিমুখ বলিয়া বিচিত' করিয়া থাকেন। কিন্তু বিগত কিছুকালের মধ্যে দেশে তিনটি বৃহৎ আন্দোলনের জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা পর্যালাচনা করিলেই এই অভিযোগের অসারতা প্রমাণিত হইবে।

১৯৬২ সালে তদনীন্তন সামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনেই প্রদেশের ছাত্র সংস্থা সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আহবান জানাইয়াছিল। ১৯৬০ সালে দেশ হইতে সামরিক শাসন প্রত্যাহার হইলে পর জাতীয় ছাত্র ফেডারেশেনেই একক ভাবে 'নাজাত দিবস' পালনের আহবান জানাইয়াছিল।

১৯৬২ সালে কুখ্যাত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া উঠে তাহাতে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা ছিল অগ্রণীর। আমাদের শত শত কর্মী বিভিন্ন স্থানে কারাবরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। একমাত্র জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনেরই ৮৬ জন কর্মীকে শিক্ষা আন্দোলনে গ্রেফতার করা হয়। তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার আনসারী খান নিজেই সেই সময়ে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন সভাপতি জনাব আবুল হাসনাত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত কর্মী পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হইয়া ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী ভূমিকা সংগঠনের ঐতিহ্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভাবে সহায় হইয়াছিল।

১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে মেডিকেল ছাত্র ছাত্রীদের দাবী দাওয়ার সমর্থনে সমগ্র প্রদেশ ব্যাপী সাধারণ ছাত্র সমাজ যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন, তাহাতেও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে। তৎকালীন এন, এস, এফ নেতৃবর্গের মধ্যে জনাব আনোয়ার আনছারী খান এবং জনাব মাহাবুবউল হক দোলনকে সর্বদলীয় পরিষদের জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল।

১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় আমাদের সংগঠনের কর্মীবৃন্দ যুদ্ধ তৎপরতায় যে ভাবে সর্ব্বাত্মক সহযোগীতা করিয়া ছিলেন, তাহা তাহাদের দেশপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন এই সময় পাড়ায় পাড়ায় শান্তি বাহিনী স্থাপন করে এবং প্রতিরক্ষা কাজে সহায়তা করে।

ইহা ছাড়াও স্থানে স্থানে জনসভা শোভাযাত্রা, প্রচারপত্র বিলি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহাদের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধিতেও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রায় প্রতি শহরেই জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের বেসামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিল। এমনকি আজ বলিতে দ্বিধা নাই যে, কিছু কিছু ছাত্র সংস্থার উদাসীনতা সত্বেও সে দিন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে একক ভূমিকা পালন করিয়াছিল। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বেতার টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে যুদ্ধ কালে তরুণ সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে সজাক করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

তারপর সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক এগারো দফা আন্দোলনে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা সংগঠনের ঐতিহ্যকে গৌরব দীপ্ত করিয়াছে। যথেষ্ট বাধা বিপত্তি এবং প্রতিকূলতা সত্বেও আমাদের সংগঠনের কর্মীরা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তাহাদেরই গণতান্ত্রিক চেতন বোধেরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রদেশের প্রতিটি স্থানে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ঢাকাতেও কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংগঠনের সাথে সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব-উল হক দোলন এবং সংগঠনের বর্তমান সভাপতি জনাব ইব্রাহিম খলিল এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব ফখরুল ইসলাম অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সংগঠনের নেতৃত্ব দান করেন। ইহা ছাড়াও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের বিশিষ্ট নেতা এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী পদাধীকার বলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য

নির্বাচিত হন।. সারা প্রদেশ ব্যাপী দলমত নির্বিশেষে ছাত্র সমাজ তাহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। পরে জনাব মাহাবুব-উল হক দোলনকে কুখ্যাত পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। স্বৈরাচারী সরকারের এই হামলা এবং হুমকী সংগঠনের কর্মীদের চেতনাকে দমাইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক এগারো দফা আন্দোলন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের মধ্যে জনাব মাহাবুব-উল হক দোলন একমাত্র নিরাপত্তা বন্দি। ইহাতেও সংগঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন মনোভাব গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আন্দোলনে যোগদানের অজুহাতে প্রদেশের সর্বত্র জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের অসংখ্য নেতৃস্থানীয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ভূমিকার চিত্রটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সুতরাং এই সব ঘটনাই অপবাদ রচনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টতম জবাব।

আজ দেশে সর্বশ্রেণীর এবং সর্বমতের ছাত্র সমাজের মধ্য ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ঐক্য রক্ষা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। বিগত আন্দোলনের এই ঐক্যের বিরাট ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ছাত্র নির্বিশেষে জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিনিধি বলিয়া আমরা মনে করি। সুতরাং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে সর্ব অবস্থায় ঐক্য এবং সম্প্রতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। তাই জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের মূলমন্ত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তাহা নিম্নে বর্ণিত করা হইল।

শিক্ষা ঃ— শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড। মনে রাখবেন শিক্ষাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ। আমাদের সকল সদস্য ভাই বোনরা উচ্চ শিক্ষিত হইয়া দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিবেই ইহাই আমাদের কামনা।

সত্য ঃ— প্রতিটি ব্যক্তি বা ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের সত্য কথা বলা একান্ত কর্তব্য। কারণ সত্য কথার মাধ্যমে মানুষ মানুষের উপরে বিশ্বাসী হইতে পারেন।

ন্যায় ঃ— ন্যায়ের মাধ্যমেই আমাদের জীবনকে প্রতিফলিত করা উচিৎ। আমাদের জীবনাদর্শ যদি ন্যায়ের ভিত্তিক হয় তবে আমরা একদিন সফল হইবই।

সেবা ঃ—সেবা আমাদের সংগঠনের অন্যতম আদর্শ। সমাজ সেবামূলক কাজে আগাইয়া আসিবার জন্য সংগঠনের কর্মী হিসাবে আমরা আপনাদিগকে আহবান জানাই।

এতএব জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের কার্য্যকলাপে যাহারা বিশ্বাসী তাহারা আমাদের জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ভাইদের সহিত যোগাযোগ করুন।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ!   জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ !!

প্রকাশে: প্রাক্তন সভাপতি ডোমার নিলফামারী জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (N. S. F.)
এ, কে, এস, সমসের তিব্রিজ (মন্টু) ও আনজারুল হক।

প্রচারে ঃ— নিলফামারী ডোমার, সৈয়দপুর, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও ডিমলাসহ সমস্ত মহকুমা।

রক্তাক্ত জানুয়ারী আস্-সালাম!

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

রক্তস্নাত মহান জানুয়ারী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। শহীদের তাজা লহুতে রংগীন এই জানুয়ারী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বিপ্লবের মহান সাক্ষ্য রাখিয়া বিশ্বের সমকালীন ইতিহাসে আপন গৌরবে দীপ্তমান। এই ঐতিহাসিক জানুয়ারী বর্ষ পঞ্জিকায়, জানুয়ারী আমাদের জাগ্রত হৃদয়ে, শুধু একটি নাম মাত্র নয়, এ একটি ইতিহাস, একটি বিপ্লব, একটি প্রেরণা। আজ এই শূন্য মুহূর্তে দাঁড়াইয়া তাই আমাদের সংগ্রামী শপথকে আরও ব্যঞ্জনাময় আরও দৃপ্ত করিয়া তুলিব। এদেশে জানুয়ারী বারবার আসিবে কালের ইতিহাসে 'মানুষে মানুষে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দীপ্ত বাণী লইয়া পিশাচ নরঘাতকদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের চিরকালীন সংগ্রামে অনুপ্রেরণা লইয়া সর্বোপরি জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ স্বার্থত্যাগের মহান আহবান লইয়া। আজ তাই বলি, 'জানুয়ারী আস্-সালাম জানয়ারী আস্-সালাম'।

এগারো দফা কর্মসূচীতে রহিয়াছে জীবনের দুঃখ বেদনার অবসানের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ। তাই আজ সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, সর্বোপরি স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এগারো দফাই সর্বোপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। ডঃ সামসুজ্জোহা, সার্জেন্ট জহরুল হক, আসাদ, রুস্তম, মতিউর, নূরুল ইসলাম প্রমুখ দেশ মাতৃকার বীর সন্তানরা বুলেটের সহিত আলিংগন করিয়া এই মহাসত্যকে শাশ্বত সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের স্মৃতিকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা শপথ করিতেছি। এই সত্য আমরা ভুলিব না, রক্তাক্ত সূর্যের আভায় আভায় আজ নবজীবনের যে ঈংগিত, সে ইংগিতকে আমরা সফল করিয়া তুলিবই। বাংলার দামাল সন্তানেরা মায়ের চোখের অশ্রুতে ভেজা এগারো দফাকে বাস্তবায়িত করিবেই। ভুখা নাংগা সর্বহারা মানুষের আর্তবেদনায় প্রকম্পিত পৃথিবীর মাঝে হাসি আনন্দের কলতান যেদিন মুখর হইয়া উঠিবে সেইদিনই হইবে আমাদের সংগ্রামের শেষ।

আজ এগারো দফা সপ্তাহের প্রাক্কালে তাই যখন দেখি মহান সংগ্রামকে আজ অনেকে খাটো করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তখন আমাদের শপথ আরও দৃপ্ত হইয়া উঠে। বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক মোনায়েম খানের এলপীবাহকরা আজও গুটি গুটি পা ফেলিয়া আমাদের আশেপাশে ঠাঁই করিয়া নিবার

ষড়যন্ত্র ফাঁদিয়াছে। শিক্ষার অঙ্গনেও ইহাদের চেনা-মুখে আবার কঠিন হাসির আভাস আমরা দেখিতে পাইতেছি। এগারো দফা সংগ্রামকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দুনিয়ার জালেম রাজের পদলেহনের উদগ্র বাসনায় মানুষের বুকফাটা চিৎকারের মুখেও তাহাদের দিকে বুলেটের সঙ্গীন উচাইয়া ধরিয়া ইহারা একদিন ইতিহাসকে হার মানাইয়া দিয়াছিল। আজ তাই, সংগ্রামী চেতনার সাক্ষী এই মহান এগারোদফা সপ্তাহে আমাদের এইসব গণদুশমনদেরকে সমূলে বিনাশ করিবার নতুন শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

আজ তাই সংগ্রামের পথে আমাদের শপথকে জোরদার করিয়া তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে এগারো দফা সপ্তাহ পালন করিতে হইবে:

১৭ই জানুয়ারী: সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন। কালো ব্যাজ পরিধান। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলে জমায়েত ও মশাল শোভাযাত্রা সহকারে প্রদক্ষিণের পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ। প্রচারপত্র বিতরণ।

১৮ই জানুয়ারী: বিকাল চারটায় মধুর কেন্টিনে কর্মীসভা।

১৯শে জানুয়ারী: প্রচারপত্র বিতরণ।

২০শে জানুয়ারী :আসাদ দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীক ধর্মঘট ও কালো পতাকা উত্তোলন। সন্ধ্যায় পথসভা।

২১শে জানুয়ারী : শহীদ মতিউর ও অন্যান্য শহীদদের মাজার জেয়ারত। সন্ধ্যা ছয়টায় বাংলা একাডেমীতে গণজাগণের উপর আলোচনা সভা।

২২শে জানুয়ারী : সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ফজলুল হক হলে ছাত্রসভা।

২৩শে জানুয়ারী : জুমার নামাজের পর মসজিদে মসজিদে শহীদের রুহের মাগফেরাত ও ১১ দফার সাফল্য কামনা করিয়া মুনাজাত। বিকেলে মধুর কেন্টিনে সর্বদলীয় কর্মীসভা ও মশাল শোভাযাত্রা।

২৪শে জানুয়ারী : প্রদেশব্যাপী বেলা দুইটা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল। বিকাল ৩টায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র জনসভা ও সন্ধ্যায় গণসঙ্গীতের আসর।

ইব্রাহীম খলিল
সভাপতি
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

ফখরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

তারিখ ঃ ১৯৭০

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের

ঢাকা শহর শাখা সম্মেলনকে সফল করে তুলুন

স্থান : শায়েস্তা খান হল, লালবাগ
তারিখ : ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৯

সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা,
গোটা দেশ আজ এক চরম সংকটের মুখামুখি। দৈনন্দিন জীবনে হাজারো সমস্যার বেড়াজালে অসহায় মানুষগুলোর জীবন দুর্বিসহ যন্ত্রণায় মুক হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকেও পাকিস্তানবাসী আজ বঞ্চিত। অন্যদিকে একনায়কত্বের জুলুমবাজী দশক শেষে জাতি এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধার পাহাড় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে দেশ ও জনগণের দুশমন অগণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী মহল।

ঢাকার গোটা শিক্ষা জীবনেও নানান সমস্যা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে, আবাসিক হলগুলোতে সিটের সমস্যা, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সমূহে আসন সংখ্যার স্বল্পতা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অহেতুক বিলম্ব, হল হোষ্টেলে নিম্ন মানের খাবার পরিবেশন, ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের অবহেলা, মেডিকেল কলেজে অটোমোশন প্রথা ইত্যাকার হাজারো সমস্যার কালোছায়া শিক্ষার্থীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। এ ছাড়াও কৃষি কলেজ ও পলিটেকনিক ছাত্রদের ন্যায্য দাবী সম্পূর্ণ এখনো মেনে না নেওয়ায় সেখানেও এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

এই সংকট সন্ধিক্ষণে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী পাকিস্তানী ছাত্রদের একক সংগঠন, সুখী সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক একমাত্র ছাত্র আন্দোলন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সম্মেলন ও ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। সমস্যা সংকুল জাতীয় জীবনের পটভূমিতে, ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের মহান শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের পবিত্র রক্তস্নাত উনিশ শো উনসত্তর সালের প্রান্তসীমায় অনুষ্ঠিতব্য এ সম্মেলন অদ্বিতীয় বৈশিষ্টে ভাস্বর। আসুন, ছাত্র জনতা নির্বিশেষে এ সম্মেলনে যোগদান করে আদর্শের সংগ্রামে নতুন প্রেরনা সৃষ্টি করি।

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ ঢাকা শহর শাখা ১৫, পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। বুক প্রমোশন প্রেস, ঢাকা থেকে

১২ থেকে ১৮ই আগষ্ট
শহীদ আব্দুল মালেক সপ্তাহ পালন করুন

সংগ্রামী ছাত্র জনতা,

রক্তঝরা ১২ই আগষ্ট জাতির সামনে সমুপস্থিত। উনসত্তরের এই দিনেই এ দেশের ১২ কোটি মানুষের প্রাণের দাবী বৈজ্ঞানিক, সার্বজনীন ও সহজলভ্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আওয়াজ তোলার অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্রনেতাকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। শহীদ আব্দুল মালেক এ দেশের মাটির মানুষ ছিলেন, এ দেশের জলরায়ু আলো বাতাসেই তিনি বড় হয়েছিলেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রাণের কথা বলতে গিয়েই তাঁকে কায়েমী স্বার্থবাদী ও ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিভূ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে। গত বছরের ১৫ই আগষ্ট আব্দুল মালেক শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পাকিস্তানের ১২ কোটি তওহিদী জনতাই তাঁর শাহাদাতের সাক্ষী। ২৩ বছরের অনেক সংগ্রাম সাধনার পরও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়নি, ইসলামী শাসনতন্ত্র রচিত হয়নি। অতীতের প্রতিটি সরকারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের এই দুইটি প্রাণের দাবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুখে ইসলামের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ আমলা, ধোকাবাজ রাজনীতিবীদ এবং পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহকদের হাত ছিল।

এই পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই আগামী ১২ থেকে ১৮ই আগষ্ট সারাদেশব্যাপী 'শহীদ আব্দুল মালেক সপ্তাহ' পালিত হতে যাচ্ছে। সারা দেশের মানুষকে এই সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে শহীদী আত্মার প্রতি তাদের অকুন্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে আর গণ-মানুষের অধিকার ও দাবী আদায়ের পথে আব্দুল মালেকের আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকার কথা স্মরণ করে নতুনভাবে আত্মত্যাগের শপথ নিতে আমরা আহবান জানাচ্ছি। আমাদের জাতীয় জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে শহীদ আব্দুল মালেকের আদর্শই জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

শহীদ আব্দুল মালেক একাডেমী, শহীদ আব্দুল মালেক পাঠাগার এবং শহীদ আব্দুল মালেকের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য 'শহীদ আব্দুল মালেক ফাণ্ড'

গঠন করা হয়েছে। এই ফাণ্ডে মুক্ত হস্তে দান করার সাথে সাথে শহীদ আব্দুল মালেক সপ্তাহের অন্যান্য কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশের আপামর ছাত্র-জনতার কাছে আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মুস্তফা শওকত ইমরান
সাধারণ সম্পাদক

সাইয়েদ শাহ্জামাল চৌধুরী
সভাপতি

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ ঢাকা শহর

শহীদ আব্দুল মালেক সপ্তাহের

কর্মসূচী

১২ই আগস্ট :	•	কর্মীদের ব্যাজ ধারন
	•	সকাল দশটায় শহীদ মালেক ময়দানে (রেসকোর্স) জমায়েত এবং কালেমাখচিত পতাকা উত্তোলন ও মোনাজাত
		সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রসভা ও মিছিল
১৩ই আগস্ট :	•	ব্যাজ বিতরণ
	•	সকাল দশটায় দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য প্রদর্শনী উদ্বোধন- স্থান : মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট (নওয়াবপুর রেল ক্রসিং এর নিকট)
	•	'শহীদ মালেক রচনাবলী', 'কিশলয়', 'প্রোজ্জল এক শিখা' প্রভৃতি বিক্রয়
	•	শহীদ মালেক ফাণ্ড সংগ্রহ
১৪ই আগস্ট :	•	সকাল ছয়টায় সংঘ অফিসে জাতীয় পাতাকা ও ছাত্র সংঘ পাতাকা উত্তোলন
	•	জুমার নামাজের পর মসজিদে মসজিদে শহীদ মালেকের ও পাকিস্তানের জন্য দোয়া ও আলোচনা
	•	প্রদর্শনী (২য় দিন) (সকাল দশটা থেকে রাত নয়টা)
	•	শহীদ মালেক ফাণ্ড সংগ্রহ
১৫ই আগস্ট :	•	ফজরের নামাজের পর কর্মীদের ব্যক্তিগত শপথ গ্রহণ
	•	সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে কোরআনখানী ও সামষ্টিক মোনাজাত (শহীদ আব্দুল মালেক স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত)
১৬ই আগস্ট :	•	শহীদ আব্দুল মালেক স্মৃতি কমিটির প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ
১৭ই আগস্ট :	•	স্কুল ও মাদ্রাসা (আলেম ক্লাস পর্যন্ত) ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
বক্তৃতা বিষয়	:	'শহীদ আব্দুল মালেক'
কবিতা	:	'শহীদ মালেকের উপর লিখিত যে কোন কবিতা'
স্থান	:	ইসলামিক একাডেমী
সময়	:	বিকেল ৪-৩০ মি:
		[উভয় ক্ষেত্রে তিনটি করে পুরস্কার থাকবে]
১৮ই আগস্ট :	•	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা (সংঘকর্মী সমর্থকদের জন্য) বিকেল ৫-৩০ মি:

এছাড়া ব্যাপক পোস্টারিং এবং বিভিন্ন উপশাখায় দেয়াল-পত্রিকা ও নিউজ ডিসপ্লে প্রকাশও সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তারিখ : ১৯৭০

এসো সংগ্রামের পথে এসো আন্দোলন

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

পর পর দু'বছর বাঙলার ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কালো দশকে শাসকচক্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে নেমে এসেছিল নিকষ কালো অন্ধকার। শিক্ষার পবিত্র পরিবেশ হয়েছিল কলুষিত। ছয় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন হয়েছিল সর্বতোভাবেই বিপর্যস্ত। একদিকে সারাদেশের বুকে স্বৈরাচারী শাসনের নির্মম চাবুকের কষাঘাত, আরেকদিকে বাঙালার শিক্ষা জীবনেরই কেন্দ্র বিন্দুতেই শোচনীয় অক্ষয়। বাঙলা এবং বাঙালীর জন্য সেটা ছিল চরম দুর্দিন। গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী সরকারের উৎখাত হয়েছে। ১১-দফা আন্দোলনের দুর্বার স্রোতে আয়ুব মোনেম চক্রের অনুগত ভৃত্য ওসমান গনিকেও ভেসে যেতে হয়েছে। সেই সঙ্গে বিদুরিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বাসরুদ্ধকর পুলিশী পরিবেশ। শিক্ষক নামের ছদ্মবেশ, ছাত্র নামের আড়ালে সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে যারা বাঙলার শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ইতিহাসকে কলংকিত করেছিল, কালের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যারা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আবার এসেছে জীনের জোয়ার, প্রাণ খুলে কথা বলার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। কিন্তু, সমস্যা কি শেষ হয়ে গেছে? কখনোই নয়। প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়েছে। এবার আন্দোলন শুরু করার পালা।

ভাই-বোনেরা,

আজ আমাদের সম্মুখে সমস্যার পাহাড় জমে রয়েছে। একদিকে জাতীয় সমস্যা, আরেকদিকে বিশ্ববিদ্যালয় জীনের তথা শিক্ষাজীবনের বহুমুখী সমস্যা। বাঙলা ছাত্রলীগ এই উভয়বিধ সমস্যাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। বৃহত্তর পটভূমিতে আমাদের সংগ্রাম কুশাসনের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। বাঙলার মানুষের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক জাতীয়তার স্বীকৃতির ভিত্তিতে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। শোষকশ্রেণীর কবল থেকে দেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমরা চাই গোটা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস। আমাদের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা। গণমানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা

বিধানকল্পে আমরা চাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো। এক ব্যক্তির শাসন কিংবা সামরিক শক্তি নির্ভর একদলীয় শাসন চাইনা। ধর্মকে আমরা মানব জীবনের অপরিহার্য অংগ মনে করি। আমরা ধর্মহীন নৈরাজ্য চাইনা। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও আমরা ঘোর বিরোধী। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তোলাই আমাদের স্বপ্ন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে আমরা বৃহৎ শক্তির লেজুর বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর। আমরা যুদ্ধজোট চাই না। বিশ্বময় সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার উৎখাত চাই। এই মূলনীতি সামনে রেখেই আমরা বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে শরীক রয়েছি। কিন্তু, পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শতসহস্র সমস্যাকেও আমরা ছোট করে দেখতে পারি না। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সংসদ ও বিভিন্ন হল সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সমস্যাগুলোকে চরমভাবে উপেক্ষা করেছেন। সাধারণ ছাত্রদের সুখ-দু:খ, সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ, নেওয়া হয় নি। অবহেলায়, উপেক্ষায় আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রজীবন নিরস কঠোর যান্ত্রিকতায় ভরে উঠেছে। বাঙলা ছাত্রলীগ এই প্রবণতার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের দৈনন্দিন হাসি-কান্নায় অংশীদার হতে চায়। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, আবাসিক সমস্যার সমাধান, কম মূল্যে বা সাবসিডাইজড খাবার সরবরাহ, পাঠ্যসূচী বহির্ভূত এবং সহায়ক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা, বিশ্ববিদ্যালয়কে কলুষমুক্ত করা, সর্বোপরি শিক্ষাজীবনের সমাপ্তির পর কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে বাঙলা ছাত্রলীগ আপোষহীন সংগ্রাম গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমাদের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনেরা তাঁহাদের ন্যায্য দাবী নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাণিজ্য বিভাগের ভাইবোনেরাও তাঁদের ন্যায়সংগত দাবীদাওয়া পেশ করেছেন। বাঙলা ছাত্রলীগ সর্বদাই তাঁদের পাশে থাকবে। দেশের প্রতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এই দ্বিমুখী দায়িত্বভার সম্পর্কে সচেতন থেকেই বাঙলা ছাত্রলীগ এবারকার নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে।

সংগ্রামী ভাইবোনদের সংগ্রামের আহ্বান পৌঁছে দিলাম। বিচারের ভারও আপনাদেরই হাতে ন্যাস্ত করলাম।

আল-মুজাহিদী
সভাপতি-

মোশারফ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক-

বাঙলা ছাত্রলীগ

কেন্দ্রীয় সংসদ

৭ই জানুয়ারী, বুধবার

বাংলা দিবস পালন করুন

ভাইসব!

ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা একথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যে বাঙ্গালীও একটি প্রাচীন জাতি। সুতরাং আপন সত্তায় বেঁচে থাকার অধিকার এই জাতির আদি ও প্রাচীন সর্বোপরি সার্বজনীন। বহু সাম্রাজ্য-লিপ্সু জাতি এবং অর্থলোভী দস্যুরা বাঙ্গালীর এই জাতীয় সত্তা, জীবনবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চালিয়েছে পাশবিক হামলা। শত শত দুর্যোগের মধ্যে মৃত্যুহীনভাবে বাঙ্গালী অক্ষুন্ন রেখেছে তার সেই জাতীয় সত্তা ও জীবন বোধ। আজকেও তেমনি বাঙ্গালীর সামনে এক দুর্যোগ মুহূর্ত।

স্বাধীনতার পর হতে এই জাতির বিকাশের বিরুদ্ধে চলছে এক জঘণ্য ষড়যন্ত্র আর বিভিন্ন পথে আসছে নানা ধরণের হামলা। আর এই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হিসাবে বাঙ্গালীকে করা হয়েছে আর্থিকভাবে পঙ্গু, রাজনৈতিকভাবে অধিকারচ্যুত, সামাজিক মর্যাদায় বঞ্চিত এবং সাংস্কৃতিক বিকাশনায় বন্ধ্যা। হামলা চালানো হলো ভাষার উপর, মুছে দেওয়া হল এর বাংলা নাম ও পরিচয়। হামলা করা হচ্ছে এর কৃষ্টি ও সভ্যতার উপর। বাঙ্গালীকে পরনির্ভরশীল অস্তিত্বহীন একটি মানব গোষ্ঠী হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে ঘৃণ্য উপায়ে।

আজ এই ঘনায়মান দূর্যোগে মৃত্যুহীন বাঙ্গালী জাতিকে তার মার গৌরবোজ্জ্বল 'বাংলা' নাম ও পরিচয়কে পুন:প্রতিষ্ঠা সহ রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের জন্য গড়ে তুলতে হবে এক দুর্ভেদ্য গণআন্দোলন। জাতীয় পরিষদের প্রয়োজন ব্যতিরেকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলি যদি তাদের পূর্বতন জাতীয় নাম ধারণ করতে পারে বাঙ্গালীর তার পূর্বতন নাম ধারনের অধিকার হতে বঞ্চিত কেন? এই সার্বজনীন দাবীকে জাতীয় পরিষদে বিতর্কের বিষয়-বস্তুতে পরিণত করার সুপারিশ কারীদের ন্যাক্কারজনক প্রচেষ্টাকে আমরা বাঙ্গালী জাতীর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বলে মনে করি। আমরা আমাদের পূর্বতন নাম ও পরিচয় নিয়ে বৃহত্তর পাকিস্তানের পরিবারে থাকতে চাই। তাই আসুন, আমরা দলমত নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৭ই জানুয়ারী ''বাংলা দিবস'' পালন করে নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করি।

কর্মসূচী: ৭ই জানুয়ারী

সকাল ৯ টায়: মধুর রেস্তরায় কর্মীবৃন্দের সমাবেশ।

বেলা ১০ টা 'বটতালা'য় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ।

১১ টা 'বটতলায়' ছাত্র সভা।

৮ই জানুয়ারী

বিকাল ৩ টা সেমিনার আলোচ্য বিষয় ''জাগ্রত বাঙলা''

স্থান- বাঙলা একাডেমী মিলনায়তন।

সন্ধ্যায়- জাগরনী সঙ্গীতের আসর।

সংগ্রাম পরিষদ
পূর্ব বাঙলা ছাত্র শক্তি

বি: দ্র:- প্রদেশের সকল জেলা ও মহকুমা শাখাকে 'বাঙলা দিবস' সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

পূর্ব বাঙলা ছাত্র শক্তির প্রচার দফতর থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

পড়া শেষে বই ফিরিয়ে দেয়া—সভ্যতা

পড়া শেষে বই ফিরিয়ে দেয়া-সভ্যতা

নামসূচী

আ

আইউব আলী ৫২
আইয়ুব খান, মুহম্মদ (ফিল্ড মার্শাল) ১৯, ২০, ২৬, ৩৬, ৩৯, ৪২ ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৭, ১১৬, ১২৫
আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান (৬ দফাপন্থী) ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৪৪, ৬৩, ৮৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১১৭, ১২৪, ১২৬
আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান (পি. ডি. এমপন্থী) ২৬,
আওয়াল, আবদুল ১৪৫
আকবর হোসেন, লে. কর্ণেল ১১৪
আকমল হোসেন ৪৯
আখতার বালুচ, মিস ১২২
আজাদ সুলতান ৯১
আজাহার আলী খান ১১০
আজিজুর রহমান (ছাত্র ইউনিয়ন নেতা) ৫১, ৫৪, ১১৯
আজিজুর রহমান (ছাত্রসংঘ নেতা) ৬০
আজিজুর রহমান মল্লিক ১৫৭
আতাউর রহমান খান ৯২, ৯৭, ১৩৬
আতাউস সামাদ ৮৪
আতিকুর রহমান, লে. জেনারেল (গভর্ণর) ১৮৪
আনিসুর রহমান ৫৮
আনিসুজ্জামান, এম (সাংবাদিক) ৩৫
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ৪৭
আনোয়ার জাহিদ ৪৪, ১২২
আনোয়ারুল হক কচি ৩৬
আফজাল, মোহাম্মদ ১২৪
আবদুল্লাহ জাবির ১১৭
আবদুল্লাহ হারুন তায়ফুর ৪৭, ৪৯
আবু আলী চৌধুরী ৪০
আবুল কাশেম ৫২
আবুল কাশেম (কাফু মিয়া) ৭০
আবুল কাসেম ফজলুল হক ৪১, ১৩০
আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, মাওলানা (শর্ষিনার পীর) ৮২
আবু জাফর শামসুদ্দীন ৯১
আবু বকর ১৩২
আবুল মনসুর আহমদ ৬১
আবু সাঈদ মাহমুদ ১২৯
আবু সাঈদ চৌধুরী ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৫০, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৩
আবেদ খান ৯৩
আমজাদ হোসেন ১২৪
আমানুল হক ১৭৩
আমিনুল ইসলাম ১৭৩
আমিনুল হক বাদশা ৯১
আয়শা খানম ৫২
আর্মষ্ট্রং, নীল ৭২, ৭৩
আল বদর ৫৯, ৬০
আলমগীর খান ৩৩
আলম, মোহাম্মদ ১২৭
আল মুজাহিদী ২৭, ৩১, ৬৭, ৬৯, ৯২, ১১২, ১২৮, ১৩২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০
আল মুতী শরফুদ্দীন, ড. ৮১
আলাউদ্দিন আহমদ ৪১, ৪৭
আলিম আল রাজী, ড. ৩৪, ১৬৬, ১৮৮

আলী আখতার, মীর ১৪৪
আলী আশরাফ ১১২
আলী আহসান মুজাহিদ ৬০
আলী হাফিজ সেলিম ২৮
আলী হায়দার কাজমী ৬১
আশরাফ আলী খান ৭৮
আশরাফ সিদ্দিকী, ড. ৯৩
আশরাফুজ্জামান খান ১৪১
আশিকুর রহমান ১৭৪
আশীষ কুমার ১২৪
আসগর খান ৭০
আসগর চৌধুরী ১২৫
আসফ উদ্দোলা ৩৬
আসাদুজ্জামান ৫০
আসাদুজ্জামান নূর ৫১
আহমদ জামিল ইব্রাহিম ২৮
আহমদ শরীফ, ড. ৯১, ৯৩, ১৩৬
আহমদ হোসেন কচি ১৪৪
আহসান, এস. এম (গভর্ণর) ৯৭. ১১৪, ১৪৮, ১৪৯. ১৫৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৮, ১৮৩
আহসানুল হক ১৭০

ই

ইউকসু ৬৭, ৮৪, ১১৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪
ইউসুফ, এ, আর ৩৬, ৩৭
ইউসুফ, মোহাম্মদ ১৭৫
ইকবাল সোবহান চৌধুরী ১৪১
ইকবাল হোসেন ৩৫
ইজাজ আহমদ চৌধুরী ৭৮
ইদরীস আলী ৮৫
ইন্নাস আলী ড. ১৫০
ইন্টার্স এসোসিয়েশন (ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ) ১৫
ইনসাফ পার্টি ৯৯
ইফাত আরা ৬২
ইব্রাহিম খলিল ৩৮, ৩৯, ৬৬, ৬৯, ৭১, ১০০, ১১৪, ১৫১
ইমরান ১৫৭
ইমাদুল হক ৫১
ইলিয়াস, খোন্দকার মোহাম্মদ ৩৪
ইসহাক, মো: ২৯
ইয়াকুব চৌধুরী ৬২
ইয়াকুব, জি. এম ১৭৯
ইয়াফেস ওসমান ১৩৭, ১৪২, ১৬৩, ১৬৪
ইয়ামী আলী ৬৭
ইয়াহিয়া, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ৫৬, ৫৭, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭৩, ৮৬, ৯০, ১১৭, ১১৮, ১২৫, ১৩৮, ১৬৯
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ৭৮, ৮০

এ

একরামুজ্জামান ৪৬
এনামুল হক, ড. ৭৮, ৯১, ৯৩, ১৭৩
এলড্রিন, এডউইন ৭২

ও

ওবায়দুল হক, মাওলানা (ফেনী) ৮২
ওমরাও খান ৩৬
ওয়াজেদুল ইসলাম খান, ডাঃ ১৫১, ১৫৩

ওয়াহিদুজ্জামান ৩৯
ওয়াহেদী, আবদুল মজিদ ১২৭
ওয়াহেদুল হক ১৩৬
ওসমান গণি ১১৪
ওসমান রমিজ, অধ্যাপক ১২৬

ক

কবীর চৌধুরী ৯৩
কমিউনিস্ট পার্টি (চীনপন্থী), পূর্ব পাকিস্তান ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ১০৪, ১১৮
কমিউনিস্ট পার্টি (রুশপন্থী), পূর্ব পাকিস্তানের ৫৮
কল্লোল সেন ১৭৯
কাইউম খান, খান্ আবদুল ৩৯, ৭১
কাইয়ুম খন্দকার, আবুল ৩৮
কাজী কাদের ৩৯
কাজী জাফর আহমদ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ১২১, ১২৩, ১২৫
কাদের সিদ্দিকী ৩৩
কামরুদ্দিন আহমদ ৩০, ৯১
কামালউদ্দিন ১৬৭
কামাল মোস্তফা ১৭০
কামাল, মোহাম্মদ ৮৭
কাশেম, আবুল ১৩৭, ১৪২, ১৫৪, ১৬৪
কায়সার আহমদ ১৪৭
কামরুন্নাহার লাইলী ৪৪
কামাল উদ্দীন আহমদ ৫১
কামাল, মোহাম্মদ, ৭৭, ৯৪
কোরেশী, ফেরদৌস আহমদ ২৬, ২৭
কুদরাত-ই-খুদা, ড. ৭৩, ১৪১, ১৭৮
কৃষক সমিতি ১১১

খ

খয়রাত হোসেন ১৪৬
খয়েরউদ্দিন, খাজা ৯৭, ১৮২
খসরু ১১৭
খালেক, আবদুল ৮৫, ১৪২, ১৭৩
খালেদ বখত, সৈয়দ ১৫৫, ১৬৭
খালেদ মোহাম্মদ আলী ২৫, ২৭ ২৮
খালেদ হাশিম, মুহম্মদ ২৮, ১৪১
খোরশেদুল ইসলাম ৫১

গ

গাজালা শবনম, মিস ৮৭
গোলাম আজম ৯৭, ৯৮, ১২৭, ১৩৭, ১৫৩
গোলাম কিবরিয়া, এ, এস, এম ৬১
গ্যাগারিন, ৭৩
চাকসু ১৩৩, ১৭০
চারু মজুমদার ৪১, ৪২
(খাকসার) ছাত্র আন্দোলন ৬১

ছ

ছাত্র ইউনিয়ন (অবিভক্ত), এপসু ৫৮
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), পূর্ব পাকিস্তান ২৫, ২৬, ৩৫, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৫১,

১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৯

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), পূর্ব পাকিস্তান ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৪, ৯৮, ১০২, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১২১, ১২২, ১২৭, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৫১, ১৫৯, ১৬৯, ১৭৯

ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব বাংলা ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৬, ৯২, ১৩৭, ১৭৩

ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ৪৮, ১০৩, ১৫৩,

ছাত্র কাউন্সিল, পূর্ব পাকিস্তান, ৬১

ছাত্র পরিষদ, পাকিস্তান ৬১, ৯৫

ছাত্রলীগ (তোফায়েল), পূর্ব পাকিস্তান ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৫৪, ৫৫ ৫৬, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩০,১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬

ছাত্রলীগ (আল মুজাহিদী) পূর্ব বাংলা ২৭, ২৯, ৩১, ৫৬, ৬৭, ৬৯, ৭৩, ১০৯, ১১০, ১১২, ১২৮, ১৩২, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০

ছাত্রলীগ, গ্রাম্য ৬২

ছাত্রলীগ, পাকিস্তান মুসলিম ৬১, ৭৮

ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় (এন, এস, এফ) ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৮২, ৮৭, ৯২, ৯৮,১০৯, ১১০, ১১২, ১১৫, ১৫১, ১৬৯, ১৭২

ছাত্র ফেডারেশন, (পাকিস্তান) ৬১

ছাত্র ফেডারেশন,(রশীদ গ্রুপ) ৬১

ছাত্র ফেডারেশন, (সিন্ধু) ৬১

ছাত্রশক্তি, পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) ৩৬, ৬১

ছাত্র শিবির, ইসলামী ৫৯

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (কেন্দ্রীয়) ৩৭, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ১০০, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১২৭, ১৫৫, ১৭৮

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (কারিগরী) ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (বাণিজ্য) ১৭৪

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (বাণিজ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ১৭৫

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৪৯, ১৫০

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (মাদ্রাসা) ১৮১, ১৮২

(স্কুল) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত) ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭

(স্কুল) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ সমর্থিত) ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮

(গণতান্ত্রিক স্কুল) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রসংঘ সমর্থিত) ১৩৭
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ডাক্তার) ১৫২, ১৫৩
ছাত্রসংঘ, ইসলামী ২৫, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৫৯, ১৬৯, ১৮১, ১৮২
ছাত্র সমিতি, কৃষি ১৬৫
ছাত্র সংসদ (ঢাকা শহর) ৬১
ছাত্র সংস্থা (বালুচ) ৬১
ছাত্রীসংঘ, মুসলিম ৬২
(তালাবা), ইসলামী জামাতে (মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন) ৭৭
(তালাবায়ে) আরাবিয়া, পাকিস্তান জমিয়তে, (মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন) ৭৮
ষ্টুডেন্ট ওউন লীগ, পাকিস্তান ৮৭
ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, লিবারেল ৮৭

জ

জমির আলী ৩৭, ৩৮
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ৯৮, ১২৮
জমিয়তে মোদারেসীন ১৮১
জয়নুল আবেদীন, শিল্পাচার্য ৯২
জসিমউদ্দীন (কবি) ৮৪, ৯১, ৯২, ১১১, ১২৪,১৩৬, ১৫৩
জহিরউদ্দিন তালুকদার ১৪২, ১৬৭
জহির রায়হান ৮৪, ৯২, ১৩৬, ১৩৮ জহির হোসেন , ড. ১৬৪
জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান ৫৩, ৫৯, ৬৫, ৮৭, ৮৯, ৯৮, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৭, ১৫৩, ১৮১, ১৮২
জামাল আহমদ ৬২
জামাল চৌধুরী ১৩৭
জামাল হায়দার, মোস্তফা ২৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৬৩, ৬৯, ৮৬, ১০০, ১১৪, ১২১, ১২৭, ১৪০, ১৫১,
জাহাঙ্গীর আ. ক. ম ৫২
জাহাঙ্গীর, কাজী ৩২
জাহেদুর রহিম ১৩৬
জিন্নাহ, ফাতেমা ৩৬
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী (কায়েদে আজম) ৩৬
জিলানী, বিগ্রেডিয়ার, পি, বি, ৮৫
জিয়াউদ্দিন খান ৬২
জিল্লুর মোর্শেদ মিঠু ৫১
জুনো, হায়দার আনোয়ার খান ৪২, ৪৮, ১৪০
জুম্মা খান, ডা: ৮৬
টিপু সুলতান, খান ১৪৬
ডাকসু ২৫, ৩৮, ৪৮, ৫৪, ৬৭, ৭২, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ১১৪, ১২৫, ১২৭, ১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৬৬

ত

তমদ্দুন মজলিশ (আজিমপুর গ্রুপ) ৯৯
তাজউদ্দিন আহমদ ৮৬, ৯৭, ১১৫
তাজুল ইসলাম হাসমী ৩৮
তাকসিম আহমদ ১৩৩
তরিক আলী ৪৪, ৪৫

তালাবা, ইসলামী জামাতে ('ছ'—তে দেখুন)
তালাবায়ে আরাবিয়া, পাকিস্তান জমিয়তে ('ছ'তে) দেখুন
তাহা, এ. টি. এম ৩৬
তোফায়েল আহমদ ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৪, ৮৬, ১০০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১২৭, ১৫৬, ১৬৫
তোয়াহা, মোহাম্মদ ৪১, ৪৭, ৯৬, ১১১, ১১৫
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ ৯১, ১১৮

দ

দিলীপ বড়ুয়া ৪৬, ৪৭, ৪৮, ১৪০
দীন মোহাম্মদ, কাজী ৯৩
দুদু মিঞা, পীর মোহসেনউদ্দিন ৯৮
দুলন, মাহবুব উল হক ২৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৭১, ৮২
দেবেন শিকদার ৪১, ৪৭, ১১০, ১৭৩
দৌলতনা, মিয়া মমতাজ ১১১

ন

নইমুদ্দিন আহমদ২৬
নগেন সরকার ৪৭
নাজমুল আহসান মন্টু ৫২
নাজিউদ্দিন মাহমুদ ২৮
নাজিম কামরান চৌধুরী ২৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৮২, ১৮১
নাসিম আলী ৫৮
নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু ৮৫
নিয়ামতউল্লাহ ১৪১
নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস ১১৯, ১২০
নূর খান, এয়ার মার্শাল ২৪, ৫৩, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৯০
নূরজাহান মোর্শেদ ১২৪
নূরজাহান বেগম ৬২
নূরুজ্জামান চৌধুরী ১৪৪, ১৭৩
নূরন্নবী খান ৬৭, ১৫৮
নূর মোহাম্মদ খান ৪৭, ৪৯
নূরু মিয়া ৩২
নূরুল আনোয়ার, এস. এম ৬১
নূরুল ইসলাম (ছাত্র ইউনিয়ন নেতা) ৩৮, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৬৬, ৬৯, ৭২, ৮৬, ৯২, ১০০, ১১২, ১১৬, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৮, ১৭৯
নূরুল ইসলাম (ছাত্রসংঘ নেতা) ৬০, ৭৯, ৮৮
নূরে আলম সিদ্দিকী ৩১, ৩২, ৩৩, ১২৩, ১৩১, ১৫১, ১৬৬, ১৬৮
নূহ উল আলম লেনিন ৫২
ন্যাপ (ভাসানী) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৪২, ৪৪, ৪৬, ৯৬, ৯৭, ১০৫, ১১১, ১১৫, ১২২, ১৩৪, ১৩৫
ন্যাপ (ওয়ালী) ৬৩, ৯৬, ৯৭, ১০৫, ১০৬, ১২২, ১২৪, ১২৬

প

পনাকী দাস ৪৬
পি ডি পি ৯৭, ৯৯

পি ডি এম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) ২৬
প্রগেসিভ লীগ, ন্যাশনাল ৯৭
প্রিলিমিনারী সংগ্রাম কমিটি ১৭০

ফ

ফখরুল ইসসলাম ২৫, ৩৮, ৩৯, ৬৯, ৭১, ১০০, ১৫১
ফজলুর রহমান ১১২, ১৯২
ফজলুল কবীর ১১০
ফজলুল কাদের চৌধুরী ৭১
ফজলুল হক, মোহাম্মদ ৬১
ফজলুল হক, শেরে বাংলা ৪১, ১৩০
ফয়জুর রহমান, শাহ ১৫০
ফয়জুল আকবর ৫১
ফরমানউল্লাহ খান ৩৬
ফরহাদ, মোহাম্মদ ২২, ২৩
ফরিদ আলী ৯৭
ফাতেমা বেগম ১৩৪
ফারুক, সৈয়দ ৩১
ফিরোজ অর রশীদ, কাজী ২৮, ২৯
ফিরাজ আনোয়ার ১৪০

ব

বজলুর রহমান ১৩৬
বদরুদ্দিন উমর ৮৪, ৯১
বদরুদ্দিন এম. ডি. এম ৯৯
বাকসু ৬৭, ১৪২, ১৬৭, ১৩৬
বাংলা একাডেমী ৬৭, ৭৩
বাতেন, আবদুল ৩৩
বাদশা হোসেন, ৬১
বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, ঢাকা শাখা ৮১
বিধান চন্দ্র বিশ্বাস ১১৯, ১২০
ভাসানী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ২১, ২২, ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৬৪, ৯১, ৯২, ৯৮, ৯৯, ১০৬, ১০৭, ১১৫, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১৪৭, ১৬৭
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৩৭, ৪২, ৬৪, ৯৪

ম

মঈনউদ্দীন চৌধুরী ১৪৬
মওদুদ আহমদ ৩৬
মওদুদী, মাওলানা আবু আলা ৮৭, ১১৯, ১২৫, ১২৬, ১২৮
মজিবর রহমান ১৭০
মজিবুল হক সিনহা ৪৬
মণি, শেখ ফজলুল হক ২৬, ৩৫, ১১৭
মণি সিংহ ৬৪, ১১৮, ১২২, ১২৩, ১৭৩
মতিউর রহমান ১৩৬
মতিউর রহমান নিজামী ৬০, ৮৫, ৮৮, ১২৮, ১২৯
মতিন, আবদুল ৪১, ৪৭
মঞ্জু ১১৭
মঞ্জুর মোর্শেদ ৪৬
মন্টু, মোস্তফা মহসিন ১২৫
মনিরুল হক ২৮
মনিরুল হক চৌধুরী ২৮
মনোরমা বসু (মাসিমা) ৯৩
মফিজ উদ্দীন আহমদ, ড. ১৭৩
মফিজুর রহমান ২৯, ৯১, ১৪১
মফিজুল্লাহ কবীর, ড. ১১২
মহিউদ্দীন আহমদ ২৮
মাও সে তুং ৪১, ৪৫, ১০৭

মাইদুল ইসলাম ১৭৯
মাখন, আবদুল কুদ্দুস ৩১, ৩২, ৩৪, ১৪০, ১৪১, ১৬৬
মানিক, শামসুজ্জোহা ৪৭
মানিক, সাইফউদ্দীন আহমদ ২৫, ৫০, ১১২, ১৫৪
মান্নান, এম, এ, মাওলানা ৮২
মান্নান খান, আবদুল ২৭, ৩৮, ৬৯, ৯২, ১২৮
মান্নান সৈয়দ, আবদুল ৯১
মালেক, আবদুল ৮৬, ৮৭, ৯৪
মাসুদ আলী ১৪১
মাসুম আরা হোসেন, মিস ১৪৩
মাহফুজউল্লাহ ৪৫, ৪৮
মাহবুবউল্লাহ ২৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৬৯, ৮৬, ১০০, ১১৪, ১২১, ১২২, ১২৭, ১৪০
মাহবুবুর রহমান খোকা ৪০
মাহাবুব মাওলা ৪৯
মাহাবুব মোর্শেদ ৩১
মাহবুবুল হক ৫২
মাহবুবুল হক, আ,ফ,ম ৩২
মাহবুবুল হুদা ভুইয়া ১৪০
মাহাবুব সিদ্দিকী ৪০, ১৪১, ১৪৯
মাহমুদ হোসেন, ড. ১৮৪
মিজানুর রহমান চৌধুরী ৯৬
মিলন রায় ১৪৩
মিলু হক ৪৯
মুকুল, আবদুল কাইউম ৫২
মুকুল চৌধুরী ৫১
মুজাহিদ, মোহাম্মদ ১২৮
মুজিবুর রহমান, শেখ (বঙ্গবন্ধু) ২১, ২৬, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৪, ৪৪, ৬৩, ৬৪, ৮৬, ৯০, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৪, ১১৭, ১৩৯, ১৪৬
মুজিবুল হক ১১১
মুনীর চৌধুরী ৮০
মেজবাহ কামাল ৩১
মেডিক্যাল সমিতি, পাকিস্তান ১৫২
মেনন, রাশেদ খান ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ১২১, ১২৩, ১২৫
মেসবাহুল করিম ১৫৫
মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ৩৬, ৩৭, ৭০, ৭১
মুসলিম লীগ কাউন্সিল ৯৭, ১২৮, ১৮২
মুসা হোসেন ৪০
মোকাদ্দেস ১২৭
মোজাফফরউদ্দিন, মেজর জেনারেল, ২৫, ৮২
মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক ৯৬, ৯৭, ১৪৭
মোজাম্মেল হক ২৮
মোতালেব, আবদুল ১৫৭
মোতাহার হোসেন, কাজী, ড. ৮১
মোয়াজ্জেম হোসেন ২৯, ৩২, ১৭৯
মোনায়েম খান ৩৬, ৩৭, ৭১, ১৭৭, ১৮২
মোশাররফ হোসেন ২৮, ১৩২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭৯
মোসলেহউদ্দীন, মৌলভী ১২৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২

মোস্তাক ইলাহী ২৮
মোস্তাক হোসেন ১৩২, ১৩৪
মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন ১৭৯
মোস্তফা শওকত ইমরান ১৩৭
মোস্তাফিজুর রহমান ২৮

র

রউফ, আবদুর
২৫, ২৭, ২৮, ২৯
রকিবুদ্দিন চৌধুরী ১২৩
রণো, হায়দার আকবর খান
৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫৮, ১২১
রব, আ. স. ম. আবদুর
২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৬৭, ৭২, ৮৬, ১০০, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১২৫, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৬
রণেশ দাসগুপ্ত ৯৩, ১১১, ১৩৬, ১৫৩
রফিকুল হাসান ১৪৬
রবিউল আলম ৪৬
রবিউল হোসেন ১৭৫
রহমান, আবদুর ৬৭
রাকসু ৬৭, ১৩৩
রানা চৌধুরী ৫১
রাফিয়া আক্তার ডলি ২৮, ৬৭
রেজাউল মোস্তফা ২৯
রেজা, এম. এ ২৯, ১৭৮, ১৭৯
রেজাকার বাহিনী ৫৯
রিয়াজ মেনন, মিস ১২৪
রিয়াজুল করিম ৪৯
রীণা, রাশেদা খানম ১৫৪
রুহুল কুদ্দুস ১২৮
রেহমান সোবহান ৩৪, ১১১

ল

লায়লা খালেদ ৪৯
লীলা সাহা ৪৬
লুৎফর রহমান ৪৬
লুৎফে হাসিনা ১৩২
লেকচারার সমিতি, পশ্চিম পাকিস্তান ৭৮
লেখক সংঘ

শ

শওকত আনোয়ার ৯৩
শওকত চৌধুরী ৫১, ১১৯
শফিউল হাসান ১৫৩
শফিউল্লা, সৈয়দ ৭৮,
শফিকুল ইসলাম ৪৯
শবনম ৯২
শহীদুল ইসলাম, শেখ ২৮, ৩২, ৩৪
শহীদুল্লাহ কায়সার ৮৪, ১১১, ১৩৬, ১৫৩
শহীদুল্লাহ ১১০
শান্তি কমিটি, পাকিস্তান ৯৯
শামসুর রাহমান ৮৪
শামসুল হক সিদ্দিকী ৯৭
শামসুল হুদা চৌধুরী ২৬
শামসুদ্দীন কাজেমী, মওলানা ১২৮
শামসুদ্দোহা ২৫, ৫১, ৬৬, ৬৯, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ১০০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৫১, ১৫৩, ১৭৯
শাহ আজিজুর রহমান ২৬, ৯৬
শাহজাহান খান ৫১
শাজাহান সিরাজ ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ১২৩, ১৩১, ১৫১, ১৬৬, ১৬৮
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ২৬, ১৭৯
শাহাদাৎ হোসেন ২৬,
শিক্ষক পরিষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৮০

শিক্ষক সমিতি, কলেজ ১৬৬
শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯, ১৭০
শিক্ষক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান, মাধ্যমিক ৮০
শিক্ষক সমিতি, ঢাকা জেলা স্কুল ৮০
শিক্ষক সমিতি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৮১
শেখর দত্ত ৫১, ১১৯
শুভ রহমান ৫৮
শ্রমিক ফেডারেশন ১১১, ১২৪

স

সফদার সিদ্দিকী, গোলাম ১৪৪
সবুর খান, এ ৩৭, ৬৭, ১২৮
সংস্কৃতি সংসদ ২৫
সত্যেন সেন ৯১, ১৫৩, ১৩৬
স্বপন কুমার চৌধুরী ২৮, ৩১, ৩২
সাইফুদ্দিন আহমেদ ২৮
সাইদুর রহমান ৩২
সাইদুল হাসান
সাইফুল ইসলাম ১৩৫
সাঈদ আতিকুল্লাহ ৯২
সাত্তার, আবদুস ১০৮
সাত্তার, এম, এ ১১৪
সাবের জামিল ১৫৭
সামাদ, আবদুস ১৪৪
সালাম খান, আবদুস ৩৪
সালাম, আবদুস ৬১
সালাম, আবদুস, শেখ ১৪৬
সালু, আতিকুর রহমান ৪৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ১৫১
সিকান্দার আবু জাফর ৯২, ৯৩
সিরাজুল আলম খান ২৬, ৩৫, ৯১
সিরাজুল ইসলাম, ড, ১২৯
সিরাজ সিকদার ৪১
সিরাজুল ইসলাম ২৮
সিরাজুল হোসেন খান ১২৪
সুখেন্দু দস্তিদার ৪১
সুফিয়া কামাল ৫০, ৫২, ৯১, ১৩৬, ১৫৩, ১৭৮
সেলিম (ছাত্রলীগ) ১২৫
সেলিম, মুজাহিদুল ইসলাম ৫১, ৫২, ১১৯, ১৪০, ১৬৮
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ১৩০
সোহায়েল আবদুল্লাহ, মোয়াজ্জেম ১৩৭

হ

হক, আবদুল ৪১, ৪২, ৪৭
হাই, আবদুল ২৮, ১৪৬
হান্নান, কাজী, এ ৬২
হান্নান, মাজহারুল, ৪০, ১৪১
হাননান, মোহাম্মদ ২০, ২৬
হাফিজুর রহমান, মোঃ ১৩৩
হাফিজ, ডাঃ ১৫৩
হাবিব, ডাঃ ১৫৩
হালিম, ডাঃ ১৬৬
হাবিবুল্লাহ, এ বি. এম. ৭৯, ৯৩, ১৭০
হামিদ, আবদুল ১৬৫
হামুদুর রহমান ৭৭
হাসনাত, আবুল (ছাত্রইউনিয়ন নেতা) ৫২
হাসনাত, আবুল (ছাত্রলীগ নেতা) ৩২
হাসান আদিল, অধ্যক্ষ ৭৮
হাসান ইমাম ৯২
হাসান জামান, ড. ৮১, ৯৩
হাসান মোহাম্মদ ১২৩
হাসান হাফিজুর রহমান ৮৪, ৯২
হীরা, শামসুজ্জামান ১৬৯
হুদা, ড. এম, এন (গভর্নর) ১৭৮
হুমায়ুন কবীর ১৪৬
হেনা, কাজী মমতা, ৫১
হোসেন ইমাম ১৭৪

 পড়াতো শেষ, বই ফিরিয়ে দিন

ইতিহাস পাঠকরা পড়লে অবাক হবেন, 'ইতিহাসের পেছনেও ইতিহাস থাকে' কথাটি আলোচ্য গ্রন্থে কতো বেশী সত্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনের খবরাখবর কাগজের পাতা থেকে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কম-বেশী আমরা সবাই জানি। কিন্তু এসব আন্দোলন ও ঘটনার পেছনে কি সব প্রয়াস কাজ করেছে (পর্দার আড়াল থেকে) আমরা তা অনেকেই জানিনা। আলোচ্য গ্রন্থে পাঠক সেই শ্বাসরুদ্ধকর কৌতূহলেরই জবাব পাবেন।

বিশেষ করে, ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ছাত্র সমাজের অবদান, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের একত্রীকরণ ও দ্বন্দ্বের অজানা কাহিনী, '৫৫ থেকে '৫৭-র দুঃখজনক কান্ডজ্ঞানহীনতা, '৫৮ সালে সামরিক আইন জারীর পেছনের রহস্য, দায়িত্বহীন রাজনীতিকরা ক্রমান্বয়ে যে ট্রাজেডীর জন্ম দিয়েছিলেন '৬১ সালে এসে তা থেকে উত্তরণের পথ বের করে নিল ছাত্ররাই, জন্ম দিল '৬২-র সামরিক ও শিক্ষা কমিশন বিরোধী দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের, '৬৩-তে ছাত্রলীগে আদর্শিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল, '৬৪-তে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে ছাত্ররা ঝাপিয়ে পড়লো, '৬৫-তে ছাত্র ইউনিয়ন যে ভেঙ্গে গেল তার নেপথ্যের অনেক কথা, '৬৬ সালে ছয় দফা রচনার রহস্য উদঘাটিত হল, '৬৭-তে এসে ছাত্ররা করলো তৃতীয় বিভাগ আন্দোলন, এর মধ্যে আবার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ভিন্ন ধারার জন্ম হলো, '৬৮ সালে এসে ১১ দফা কেমন করে ধাপে ধাপে রচিত হয়ে উনত্তরের গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিল, সেসবসহ আরো হাজার তথ্যে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ।
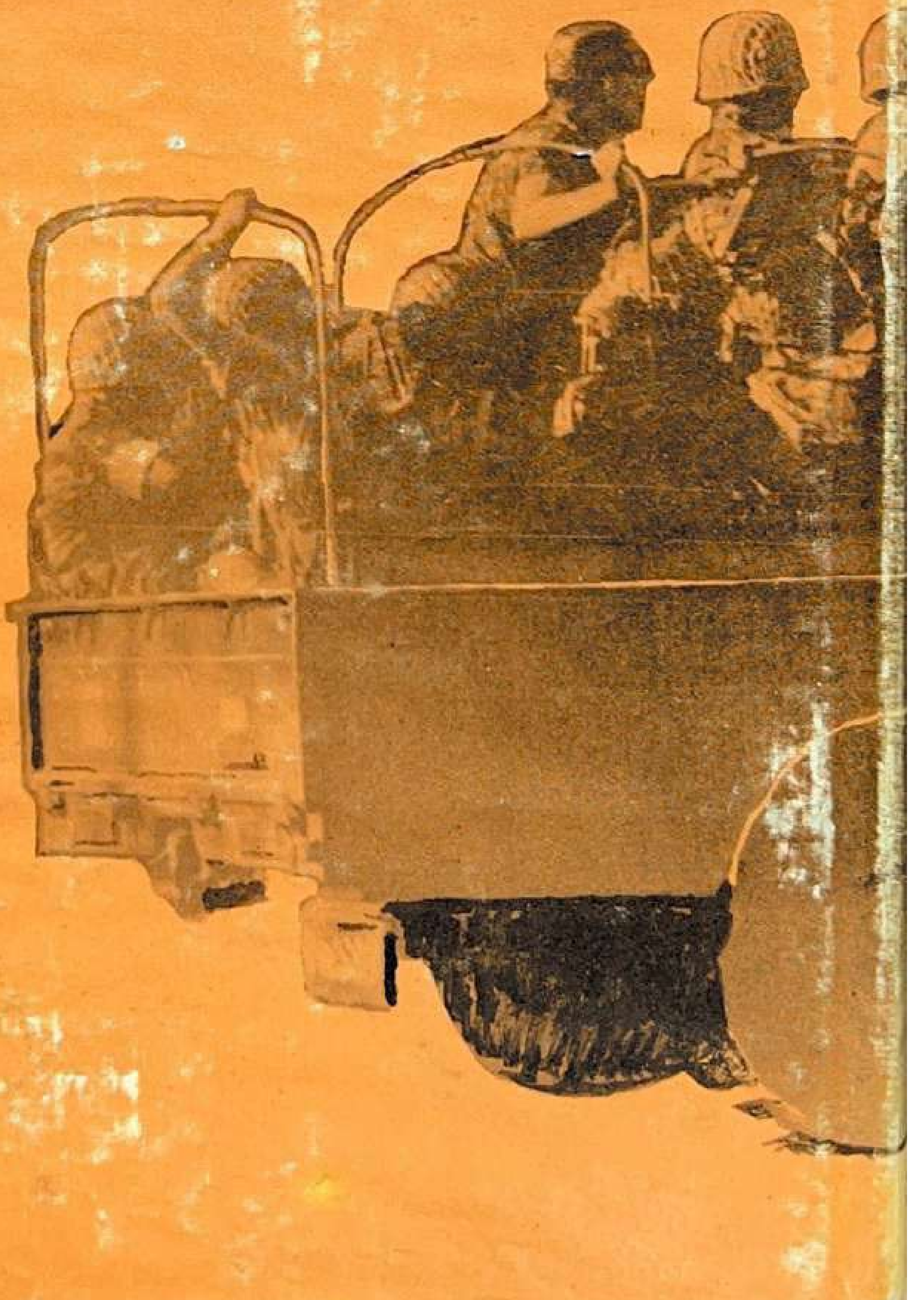
এই সঙ্গে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্র ১৮৮৬ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এবং ১৭০০ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির তথা শিক্ষার ইতিহাসের এক দুর্লভ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে এতে। সব মিলিয়ে এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর বই-প্রেমিককে নিয়ে যাবে এক তৃপ্তিদায়ক পরিপূর্ণতায়।